তিন সঙ্গী

বনফুল

তিনটি উপন্যাস :

তৃণখণ্ড ॥ কিছুক্ষণ ॥ বৈতরণী তীরে

৫-১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট,
কলিকাতা—৯

পাঁচ টাকা পঞ্চাশ ন. প.

প্রথম [illegible] ১৩৬৭

প্রকাশিকা : নন্দিতা বসু

গ্রন্থপ্রকাশ ॥ ৫-১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট ॥ কলিকাতা—৯

মুদ্রক : জিতেন্দ্রনাথ বসু

দি প্রিণ্ট ইণ্ডিয়া ॥ ৩-১, মোহন বাগান লেন ॥ কলিকাতা—৪

প্রচ্ছদ-চিত্রকর : কানাই পাল

গ্রন্থক : বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

তৃণখণ্ড

শ্রীযুক্ত বনবিহারী মুখোপাধ্যায়, এম. বি.,
শ্রীযুক্ত চারুব্রত রায়, এম. বি.,

যাহারা নিজেরা 'তৃণখণ্ড' হইয়াও এই 'তৃণখণ্ড'কে সংসার-সমুদ্রে ভাসমান করিয়াছেন, তাঁহাদের শ্রীচরণে এই পুস্তকখানি উৎসর্গ করিতেছি।

বলাই

কম্প দিয়া জ্বর আসিয়াছে। হাঁ, জ্বর বইকি। ক বসিয়া চিঠি লিখিতেছি। অন্যায়, তবু লিখিলাম। সে জানিয়াও আমার কাব্য-প্রেরণা কিছুমাত্র কমিতেছে না। প্রলাপ বকিতেছি।

মনের আকুতি বুঝাব কেমনে কথায় বলি,
কি ক'রে প্রকাশ করিব বল না—কিছু না জানি,
গভীর সাগরে বাড়ব-অনল মরিছে জ্বলি,
বুঝাব কি ক'রে সাগর-জলের জ্বালার বাণী?
ঘরের কোণেতে বসিয়া যখন হারায় দিশা,
দিবসে যখন ঘনাইয়া আসে আঁধার নিশা,
হিমানীর বুকে জাগে হায় যবে অনল-তৃষা,
ভাষাও তখন নীরব হয় যে অবাক মানি।

ভাষায় কখনো সে কথা জীবনে যাবে না বলা,
তবু কি বোঝ নি? বুঝিতে এখনও আছে কি বাকি?
গভীর রাতের গহন আঁধারে, হে চঞ্চলা,
আমার প্রাণের প্রবল পরশ পাইলে না কি?

তোমারি লাগিয়া একাকী জাগিয়া যে আকুলতা,
মদির মধুর নিবিড় নিথর যে নীরবতা,
গোপনে ও মনে কহে নি কি কোন নিগূঢ় কথা—
আঁখিতে তোমার দেয় নি কি কোন আবেশ আঁকি?

আমারে স্মরিয়া শিহরি কখনো ওঠে নি তনু ?
স্বপনে কভু কি লুকায়ে তোমারে দিই নি দেখা ?
তোমার মনের মেঘেতে আঁকে না ইন্দ্রধনু—
আমার মনের তপ্ত তপন-কিরণ-রেখা ?
তোমারে ঘিরিয়া যত ফুল ফোটে আমার মনে,
সুরভি তাহার পাও নাকি তুমি সঙ্গোপনে ?
তোমার লাগিয়া যে কবিতা জাগে ক্ষণে ক্ষণে,
ছন্দ কি তার আজিও তোমার হয় নি শেখা ?

মনে হয় যেন আমার লাগিয়া উতলা প্রিয়া,
গাহ্ মনে মনে, 'আমারি যে তুমি—নহ তো কারো' ;
বুকের বেদনা ঢেকেছ মুখের হাসিটি দিয়া,
আমারে ভুলিতে যত চাও তত ভুলিতে নারো।
আমারি মতন তোমারি মুখেতে ছলনাবাণী—
মনের ভিতর ঘনায়ে তুলেছে বেদনাখানি,
যতই আমারে সরাও দূরেতে আঘাত হানি,
মনের নিভৃতে ততই চাহিছ নিকটে আরো।

প্রেমেই পড়িয়াছি। অন্ধকার বন্ধ ঘরের জানালার ফুটা দিয়া কিরণ-রেখা প্রবেশ করিয়াছে। বন্ধ ঘরে আলোকস্বপ্ন। সেই আলোক-রেখায় শত শত ধূলিকণার উন্মাদ আবর্তন, বাসনার কলুষ। তবু তাহা আলো। শরাহত পশুর ন্যায় অন্ধকার মূর্ছিত হইয়া পড়িয়াছে। স্বপ্ন দেখিতেছি। মৃত্যুর।

ডাক্তারবাবু!

চমকাইয়া উঠিলাম—কে ? ভেতরে আসুন।

এক প্রৌঢ় ভদ্রলোক প্রবেশ করিলেন। হাসিয়া বলিলেন, একটু কষ্ট দিতে এলাম। দেখুন ডাক্তারবাবু, কয়েকদিন থেকে আমার স্ত্রীর কেমন মাথার গোলমাল হয়ে গেছে। পাশের বাড়িতে যাত্রা শুনতে গিয়ে এই ব্যাপার মশাই।

কি রকম ?

বেশ ভাল মানুষ—যাত্রা শুনতে গেল। রাত এগারোটা নাগাদ ফিরে এল—একটি বদ্ধ উন্মাদ। এসেই বললে, আমার নন্দত্বলালা ? কই, আমার নন্দত্বলালা ?—ব'লেই গান। সেই থেকে মশাই এক-নাগাড়ে চলছে। আর তো পেরে উঠছি না। একটা কিছু ব্যবস্থা করুন।

কোথায় আছেন তিনি ?

বাইরে গাড়িতে ব'সে আছেন। আনব ?

আনুন।

আসিলেন একটি যুবতী। আলুলায়িত কেশ, অবিন্যস্ত বেশবাস, চোখে উদাস দৃষ্টি। আসিয়াই আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমায় ডেকেছেন কেন ? আপনি ডাকছেন আমায় ?

বলিলাম, হ্যাঁ, বসুন ওইখানে।

নিকটস্থ চেয়ারটায় ধপ করিয়া বসিয়া পড়িলেন।

কেন ডেকেছেন আমায়—বলুন না ?

আপনার কি হয়েছে ? এমন করছেন কেন ?

খানিকক্ষণ ফ্যালফ্যাল করিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া তিনি বলিলেন, কই, কিছু হয় নি তো।

কিছুক্ষণ চুপচাপ।

আপনার স্বামী যে বলছেন, আপনি বাড়িতে মহা উৎপাত আরম্ভ করেছেন। নন্দত্বলাল কে ?

নন্দত্বলালের গান শুনবেন ? শোনেন নি আপনি ?—বলিয়াই—

কোথায় আমার নন্দদুলাল
কোথা রে তুই ননীচোরা ?—

হঠাৎ আবার গান বন্ধ হইয়া গেল।

আসবে খোকা আমার কাছে ? এস।

ফিরিয়া দেখিলাম, পাশের বাড়ির হরিশবাবুর ছোট খোকাটিকে কোলে করিয়া ঝি দাঁড়াইয়া আছে। খোকাটির তিন দিন হইতে জ্বর, আমাকে রোজ দেখাইতে লইয়া আসে।

এস না, কেমন পুতুল দেব তোমাকে। এস আমার কাছে। আসবি না—তবে রে দুষ্টু—

বলিয়া উন্মাদিনী হঠাৎ উঠিয়া ছোঁ মারিয়া খোকাকে কাড়িয়া লইয়া প্রাণপণে বুকে চাপিয়া ধরিল। খোকা তারস্বরে চীৎকার করিতেছে, ঝি হৈ-রৈ তুলিয়াছে। আমি তাড়াতাড়ি উঠিয়া খোকাকে উদ্ধার করিলাম। তরুণীর চোখ দিয়া টসটস করিয়া জল গড়াইয়া পড়িল। আমার দিকে ফিরিয়া বলিল, আমার কাছে কোন খোকাই আসে না। কেউ আসে না। কেন, বলুন না ?

রমণীটির পরীক্ষা-কার্য শেষ করিয়া তাঁহাকে গাড়িতে তুলিয়া দিলাম। তাহার পর স্বামীটিকে কয়েকটি প্রশ্ন করা প্রয়োজন বুঝিলাম।

কতদিন পূর্বে আপনার গনোরিয়া হয়েছিল।

লোকটা থতমত খাইল, কিন্তু সত্য কথাই বলিল, দশ বছর আগে ; তখন আমার বয়স উনত্রিশ-ত্রিশ হবে।

ছেলেপিলে হয় নি ?

একটি হয়ে নষ্ট হয়ে গেছে, আর হয় নি।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনার স্ত্রীর সর্বাঙ্গে কালো কালো দাগ দেখলাম—চাবুকের দাগের মত। মেরেছেন নাকি ?

ভদ্রলোক একটু চুপ করিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, হ্যাঁ, দু-চার ঘা দিয়েছিলাম একদিন। বন্ধু বান্ধবেরা সব বললেন কিনা যে, ওসব ন্যাকামির একমাত্র ওষুধ প্রহার। তাই একটু, এমন বেশি কিছু নয়—অর্থাৎ— .

আচ্ছা, আর মারধোর করবেন না। এখন শুনুন। আপনার স্ত্রীর ছেলেপিলে না হ'লে অসুখ সারবে না; ছেলেপিলে যে হবে, তারও সম্ভাবনা অল্প। তবু চেষ্টা ক'রে দেখা যাক। আপনার নাম কি?

পাঁচুগোপাল বসাক।

ব্যবস্থাপত্র দিয়া তাঁহাকে বিদায় করিতে না করিতেই প্রতিবেশী হরিশবাবু আসিয়া উপস্থিত।

কি হয়েছিল মশাই? একটা পাগলী নাকি খোকাকে গলা টিপে ধরেছিল?

তাঁহাকে সব বুঝাইয়া বলিলাম।

তিনি বলিলেন, যাক, খুব ফাঁড়াটা কেটে গেছে। আপনি একবার ছেলেটাকে দেখে যাবেন। কেমন যেন নেতিয়ে পড়েছে।

আচ্ছা। গ্লুকোজটা খাওয়াচ্ছেন তো?

ওটা এখনও কেনাই হয় নি, না হয় আজ কিনেই আনি,—বুঝতেই তো পারছেন ডাক্তারবাবু, এই অল্প মাইনেতে সাত-আটটি ছেলেপিলে নিয়ে—তবু আপনাদের পাঁচজনের দয়া আছে ব'লে টিকে আছি। আপনি একবার দয়া ক'রে দেখে যাবেন। আনছি আজই গ্লুকোজ।

হরিশবাবু চলিয়া গেলেন। গরিব মানুষ, কাচ্চা-বাচ্চা লইয়া বিব্রত। অথচ সেদিন পর্য্যন্ত viriligen ইন্‌জেকশন লইবার জন্য ঝুলোঝুলি করিয়াছেন। আশ্চর্য মানুষের মন! আমার নিজের মনের দিকে তাকাইয়া দেখি, আর বিস্ময়ে অবাক হইয়া যাই।

ছাত্র-জীবনের কথা মনে পড়ে। অত্যন্ত গোঁড়া ছিলাম। আমার স্টোভে একটি ছেলে মুর্গীর ডিম সিদ্ধ করিয়াছিল বলিয়া স্টোভ ফেলিয়া দিই। আজ তো মুর্গীর মাংস না হইলে চলেই না। এমন কি গোমাংসেও আপত্তি নাই মানুষের অহরহ বিবর্তন! আজকের আমি, দশ বৎসর কেন, কয়েক মাস পরেই আর একজন লোক হইয়া যাইব। স্কুল, কলেজ, ধর্ম, হিতোপদেশ, সকলে সমস্বরে শিখাইল—পরস্ত্রী জননীবৎ। অথচ সেই পরস্ত্রীর প্রেমেই তো পড়িয়াছি। কিছুদিন পূর্বেও কি ইহা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল? ছিল না। আপনারা হাসিতেছেন তো? হাসিবেন না। পরস্ত্রী নয়। তবে স্ত্রী বটে। আমার সমস্ত সত্তাকে সে পরিপূর্ণ করিয়া বিরাজমান, অথচ—যাক, বর্ণনা করিব না। আমি ডাক্তার, আমি কবিও। আমার জীবন-কাহিনী যদি শুনিতে চান, তবে আমার কবিতাও পড়িতে হইবে। তাহাই আমার জীবনের সত্য প্রকাশ।

ডাক্তারবাবু!

কে? ভেতরে আসুন।

২

চতুর্দিকে নিবিড় অন্ধকার। নদীর উপর দিয়া নৌকায় চলিয়াছি। দূর গ্রামে কোন গৃহস্থ তাঁহার একমাত্র পুত্রের অসুখে বিপন্ন। সুতরাং আমাকেও খানিকটা বিপন্ন হইতে হইয়াছে।

নিবিড় অন্ধকারে নদীর ভাষা শুনিতেছি। বেগবতী তরঙ্গিণীর ভাষা—চলন্ত স্রোতের কলকল-ধ্বনি। ধীরে ধীরে সে আমার কাছে আসিয়া বসিল। কোন কথা নাই। নৌকা ভাসিয়া চলিয়াছে, স্রোত কথা কহিতেছে, সময় বহিয়া চলিয়াছে। শতাব্দী পার হইয়া

গেল, তাহার স্পর্শ যেন অনুভব করিতেছি। সমস্ত অন্তর পরিপূর্ণ। মনের কানায় কানায় কান্না জমিয়া উঠিতেছে। এই যে মধুর বেদনাময় অনুভূতি, ইহার ভাষা কোথায়? ছন্দে ছন্দে সমস্ত হৃদয় আলোড়িত হইয়া উঠিতেছে—

অন্ধকারে আঁখি মুদি দেখিতেছি তাহার স্বরূপ
নাহি কোন ছদ্মবেশ আর;
নয়ন-সম্মুখে তার সত্যমূর্তি জাগে অপরূপ,
আলো তারে দিল অন্ধকার।
দিবসের আলো যেন আড়াল করেছিল তারে,
ছলনায়, লোক-ভয়ে, ছোট বড় শত মিথ্যাচারে,
আবরিয়া রেখেছিল আপনার নিগূঢ় আত্মারে,
স্পর্শ যেন পাইতেছি তার।
দিবসে বলেছে যাহা চুপিচুপি এসে অন্ধকারে,
করিতেছে তাহা অস্বীকার।

তাহার সেই অস্বীকারের ভাষা শুনিতেছি। সে যেন বলিতেছে, দিবালোকে আমি তো তোমার কেহ নই। আমি তখন পৃথিবীর, আমি সমাজের। কিন্তু এ গভীর গহন অন্ধকার রাত্রে—

ওগো তুমি বল কে গো—ওগো মোর অন্তর-শায়িতা,
বৃথা কেন কাল নষ্ট কর,
দিবসের তীব্রালোকে অনায়াসে রহি লুক্কায়িতা
অন্ধকারে হও স্পষ্টতর।

তাহার নিশ্বাসের স্পর্শ যেন গায়ে লাসিতেছে। তাহার চুল আমার সর্বাঙ্গ ঢাকিয়া দিল।

আকাশ-কুসুম যাহা দিবসের সুতীব্র আলোকে,
অন্ধকারে তারি মালা গাঁথি আমি স্বপ্নাতুর চোখে;

সুনিবিড় তমিস্রায় ধরা দাও, বুঝিবে না লোকে
অপরূপ কি যে মূর্তি ধর।
দিবসে হারায়ে ফেলি, খুঁজে ফিরি বাণীহীন শোকে—
আপনারে কোথায় সংহর।

অনন্ত আকাশে অগণ্য নক্ষত্র—অন্ধকারকে উপেক্ষা করিয়া জ্বলিতেছে। অন্ধকার যেন বলিতেছে, আমাকে উপেক্ষা করিও না, আমি আছি বলিয়াই তোমরা জ্বলিতেছ; দিবসে তোমরা কোথায় থাক? আমার নিবিড়তায় তোমাদের প্রকাশ।

"তুমি মিথ্যা, তুমি মোহ"—দিবসের এ তীব্র-ভাষণ
বিজ্ঞানের নানা যুক্তি বহে,
অন্ধকারে ভেসে যায় বিজ্ঞতার সকল শাসন,
অন্ধকার কহে, নহে নহে।
অন্ধকারে প্রিয়া সে যে মোর লাগি আকুলা উন্মনা,
বাহুভরা আলিঙ্গনে, উন্মাদিনী, অজস্র-চুম্বনা,
অলস রভস-ভরে শ্রুতিমূলে প্রণয়-গুঞ্জনা,
অকারণে কত কি যে কহে!
আঁধার দিবস আসে—মিলাইয়া যায় সে মূর্ছনা,
আধার প্রতীক্ষা করি রহে।

সমস্ত অন্তর ভরিয়া হে অন্ধকার, তোমাকে নমস্কার করি। হে নক্ষত্র প্রকাশক, হে অনন্ত, অখণ্ড, তোমায় প্রণাম করি। স্বপ্ন-সাগরের নাবিক তুমি, অসম্ভবকে সম্ভব কর, সুদূরকে নিকটে আন, অন্তরকে বাহিরে লইয়া যাও। তুমি মহৎ, স্নিগ্ধ, তুমি নীরব। তুমি আমার প্রণতি গ্রহণ কর। কিন্তু একটু পরে তো আর তুমি থাকিবে না। আলোকের রথ-ঘর্ঘরধ্বনি যে শোনা যাইতেছে। সেই মুখর, সেই স্পষ্ট, সত্যবাদী কর্মী, সে তো আসিল বলিয়া। তখন তুমি কোথায় আত্মগোপন কর? তখন তোমার এ স্নিগ্ধ কান্তি

কোথায় লুকাইয়া রাখ ? তাহার নিশ্বাসের বেগ বাড়িতেছে। তাহার আলিঙ্গন যেন শিথিল হইয়া আসিতেছে। আলুলায়িত কেশবাস সম্বরণ করিয়া সে যেন উঠিয়া দাঁড়াইল। "আর একটু থাক।" তাহার তনুর গন্ধে আমার স্বপ্ন মদির। সে চলিয়া গেল।

কেবা সত্য, কেবা মিথ্যা—কে বলিয়া দিবে মোরে কহ,
দিবস, না গভীর আঁধার ?
যুক্তি কভু মুক্তি দেয় ? চিত্ত মোর ভাবে অহরহ,
উদ্বেলিছে প্রশ্নের পাথার।
সে পাথারে একখানি ভাসিতেছে দুঃসাহসী তরী,
তোমারে পাওয়ার আশা দুলিতেছে শিহরি শিহরি,
এ জীবনে হাসিয়াছি বহুদিন মন-প্রাণ ভরি,
বাকি আছে এখনো কাঁদার—
অসম্ভব সাধনায় পূর্ণ করি দিবা-বিভাবরী
বাকি আছে দুঃসাধ্য সাধার।

বাবু একটু উঠতে হবে।—মাঝি আসিয়া বলিল।

কেন ?

একটা মড়া এসে নৌকোটাতে ঠেকেছে।

উঠিয়া বাহিরে আসিলাম। মড়াই বটে—একটা স্ত্রীলোকের। চুলগুলা ভাসিতেছে। ঠোঁট এবং গালের খানিকটায় মাংস নাই। বীভৎস হাসি হাসিতেছে।

যাঁহাদের বাড়ি যাইতেছিলাম, তাঁহারা লোকজন লণ্ঠন প্রভৃতি লইয়া ঘাটেই দাঁড়াইয়া ছিলেন। আমি নামিবামাত্রই রোগীর পিতা নয়নবাবু আসিয়া আমার দুইটি হাত ধরিয়া বলিলেন, একটু পা

চালিয়ে যেতে হবে ডাক্তারবাবু, বড় বেশি বাড়াবাড়ি মনে হচ্ছে সন্ধ্যে থেকে।

পা চালাইয়া চলিলাম।

কদিন থেকে অসুখ?

আজ আটদিন।

ইতিপূর্বে কে দেখছিলেন?

অ্যালোপ্যাথি ওষুধ আমাদের ধাতে সয় না ব'লে হোমিওপ্যাথি করছিলাম, কিন্তু একটু বাড়াবাড়ি দেখে আজ আপনাকে খবর পাঠিয়েছিলাম।

ও।

বাড়িতে আসিয়া পড়িয়াছিলাম। রোগীর ঘরে গেলাম। পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম—ডবল নিউমোনিয়া। অবস্থা খুব সঙ্গিন। রাত কাটিবে না। রোগী প্রলাপ বকিতেছে—

কচাকচ কেটে ফেলছে—দেখতে পাচ্ছ না তুমি? উঃ, কত রক্ত! আমাকে নিয়ে চল এখান থেকে, ওই আর একটা মুণ্ডু পড়ল, থানায় খবর দেওয়া চাই—চল চল—আঃ—

বাহিরে আসিয়া বৃদ্ধ পিতাকে সমস্ত অবস্থা বুঝাইয়া বলিলাম। তিনি শশব্যস্ত হইয়া বলিলেন, তা হ'লে আজ রাতটা আপনি থেকে যান ডাক্তারবাবু, আপনার ফীস্ যা লাগে, তা আমি দেব। আমি যতই বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম যে, আমার থাকা বৃথা, ততই তাঁহাদের আগ্রহ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। অবশেষে থাকিতে হইল। তখন তাঁহাদের বলিলাম, তা হ'লে এক কাজ করুন। আজ সমস্ত রাত ওঁর কাছে একজনের থাকা দরকার। আপনারা পালা ক'রে সেটা করুন। আমি পাশের ঘরেই কোথাও থাকব, মাছে মাঝে দেখে যাব। কজন আছেন আপনারা?

আমি, মহিন্দর, বউমা আর আমার স্ত্রী। গোড়ার দিকটায় না

হয় বউমাই থাকুন। আমার স্ত্রীর আবার যা·মাথা ধরেছে, সেখানে আবার একজনের থাকা দরকার। তাঁকেও একবারটি দেখুন না হয় গেরো কি এক রকম ডাক্তারবাবু ?

দেখিলাম তাঁহার স্ত্রীকে। ষোড়শী যুবতী। তৃতীয়া পক্ষের স্ত্রীরা সাধারণত যাহা হইয়া থাকেন তাহাই। মাথাধরার যে ঔষধই দিই না কেন, সারিবে না। এক বড়ি অ্যাসপিরিন খাইয়া ঘুমাইতে বলিয়া বৃদ্ধের দিকে ফিরিয়া বলিতে হইল, উনি বড় কাতর রয়েছেন, আপনি এইখানেই থাকুন। আপনাকে যদি দরকার হয়, খবর দোব এখন।

তখন আসিয়া আসল রোগীর ব্যবস্থাদি করিলাম, ইনজেক্শন দিলাম। মাথার শিয়রে দেখি, তাঁহার স্ত্রী বসিয়া জলপটি দিতেছে মহিন্দর অর্থাৎ ছেলের পিসামহাশয় নিকটে দাঁড়াইয়া আছেন। তিনি বলিলেন, ডাক্তারবাবু, চলুন এইবার, একটু যা হোক মুখে দেবেন। আপনি চা খান কি ?

হ্যাঁ, খাই বইকি।

বাহিরের বারান্দায় বসিয়া জলযোগ করিতে করিতে শুনিলাম, রোগী প্রলাপ বকিয়া চলিয়াছে, ধর ধর—আহাহা—আউট হয়ে গেল —আজকাল নরেনটা কিচ্ছু খেলতে পারে না। এই, একটা বিড়ি দে তো—ওরে—আহাহা—

বাহিরের ঘরে আমি আর মহিন্দর।

মহিন্দর বলিতেছে, হাড়-কেপ্পন মশাই। আমি না-এসে পড়লে কি আপনাকে ডাকত নাকি ?

আমি মৃদু হাসিয়া বলিলাম, এসেই বা আর বিশেষ কি করলাম ওর তো জীবনের কোন আশা দেখি না।

কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া পিসামহাশয় বলিলেন, আহা, তাতে আপনার আর দোষ কি ? গোড়া থেকে যদি দেখতেন, তা হ'লেও বা একটা কথা ছিল। হাড়-কেপ্পন মশাই, চেনেন না আপনি ওকে। আমি আফিংখোর মানুষ, তোর ছেলের অসুখ শুনে দৌড়ে এলাম। বললে বিশ্বাস করবেন না মশাই, এক ফোঁটা দুধ এসে-ইস্তক পেটে পড়ে নি। চামার—চামার।

প্রসঙ্গ ফিরাইবার মানসে জিজ্ঞাসা করিলাম, ছেলেটি করেন কি ?

করবে আবার কি—বি. এ. ফেল ক'রে বিয়ে করেছে, এই মাস-ছয়েক মাত্র হ'ল। ওর ভাবনাই বা কি বলুন—বাপের এক ছেলে, নগদ টাকা, তেজারতি, বিষয়-আশয় যথেষ্ট। তবে অংশীদার জুটতেও পারে। বাপের চেষ্টার ত্রুটি নেই। পটাপট বিয়েই ক'রে চলেছে। প্রথম বউটা মোলো বেঘোরে, বিনা চিকিৎসায়। দ্বিতীয়টা গেল সর্পাঘাতে, সেও প্রায় বেঘোরে। এইবার এইটেকে ধরেছে—দেখা যাক। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া আবার মহিন্দর বলিল, হাড়-কেপ্পন, চামার—চামার। আমি আফিংখোর লোক, একফোঁটা দুধ দিতে ওর বুক ফেটে যায়।

আমি প্রসঙ্গ পরিবর্তন করিবার আর একবার চেষ্টা করিলাম। বলিলাম, আপনি বসুন একটু, দেখে আসি ও-ঘরে একবার।

হাত-ঘড়িটার পানে চাহিয়া দেখিলাম—দেড়টা।

পাশের ঘরে গিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে চক্ষুস্থির হইয়া গেল। শ্বাস উঠিয়াছে। বধূ পাশে ক্লান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। হাতে তখনও পাখাটি ধরা। সমস্ত মুখে গভীর পরিশ্রান্তি। সিঁথির সিঁদুরে আগুন জ্বলিতেছে। তাহাকে আর উঠাইলাম না। ব্যাগ হইতে একটা ইনজেকশন বাহির করিয়া দিতে যাইব, এমন সময় সব শেষ হইয়া গেল। মহিন্দরকে খবর দিলাম। সে আসিয়া বলিল, যাক। ওর ছেলে কি কখনও বাঁচে! এখানে ওটা ঢাকা রয়েছে কি ?

আমি বলিলাম, দুধ বোধ হয়।

এঁটো না কি?

না, এঁটো নয় বোধ হয়।

তবে আর এটা কেন নষ্ট হয়?—এই বলিয়া মহিন্দর সেই মৃতদেহের পাশে দাঁড়াইয়া লোভী শিশুর মত ঢকঢক করিয়া দুধটা খাইয়া ফেলিল।

বধূর ঘুম ভাঙিয়াছে। সে তাড়াতাড়ি জড়সড় হইয়া উঠিয়া হাওয়া করিতে লাগিল। এখনও বেচারা জানে না!

ক্রন্দনের রোল উঠিয়াছে। আমি বাহিরের ঘরে অপরাধীর মত বসিয়া আছি। পিসামশাই আসিয়া ফীসের টাকাটা হাতে দিলেন। বলিলেন, বাজিয়ে নিন মশাই—ও যা চামার, হয়তো সবগুলোই খারাপ দিয়েছে।

আবার নৌকার চড়িয়া ফিরিতেছি। আকাশে আলো ফুটিতেছে। আমার অন্তরলোক-বাসিনীরও ঘুম ভাঙিল। সে হাসিয়া আমার পানে চাহিল। আমার মন কিন্তু তখন বিষণ্ণ। সামান্য হাসিলাম মাত্র।

নদী বহিয়া চলিয়াছে।

নৌকা হইতে নামিয়া দেখি, একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক বসিয়া আছেন। আমাকে দেখিয়াই বলিলেন, কাল সন্ধ্যে থেকে আপনার খোঁজ করছি।

ভদ্রলোককে চিনিতাম না।

জিজ্ঞাসা করিতে হইল, আপনি কোথায় থাকেন?

আমি এখানে থাকি না। দু-চার দিনের জন্যে চেঞ্জে এসেছি।

ও।

ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলাম, ভদ্রলোকের বয়স যদিও পঁয়তাল্লিশের উপর, কিন্তু পোশাক-পরিচ্ছদে তাদৃশ গাম্ভীর্য নাই, শৌখিনতাই বেশি।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কি দরকার ?

আমাদের বাড়ি একবার যেতে-হবে, আমার ভাগ্নেটির তিন-চার দিন থেকে জ্বর হয়েছে। বাড়িতে আর অন্য লোকও কেউ নেই। আপনি একবার যাবেন ? ঘোষপাড়ার লাল বাড়িটাতে আছি আমরা।

আচ্ছা, যাব।

ঘোষপাড়ার লাল বাড়িতে গেলাম। প্রৌঢ় ভদ্রলোক প্রাণকৃষ্ণ বাবু, দেখিলাম, দাঁড়াইয়া আছেন। ভিতরে গেলাম, তাঁহার ভাগিনেয়কে দেখিলাম, ব্যবস্থাদিও করিলাম। প্রেসক্রিপশন লিখিতে লিখিতে হঠাৎ একবার লক্ষ্য করিলাম, প্রাণকৃষ্ণবাবু জানালা দিয়া পাশের বাড়ির ছাদের দিকে নির্নিমেষ নেত্রে চাহিয়া আছেন, এবং তাঁহার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া দেখিলাম, একটি মেয়ে ছাদে কাপড় শুকাইতে দিতে আসিয়াছে। ইহাও লক্ষ্য করিলাম যে, মেয়েটি নির্বিকার, কিন্তু প্রাণকৃষ্ণবাবু মুগ্ধ।

ভাগিনেয়, দেখিলাম, স-জ্বর অবস্থাতে মুচকি মুচকি হাসিতেছে। ব্যাপার কি ?

হঠাৎ প্রাণকৃষ্ণবাবু বলিয়া উঠিলেন, ওঃ !

জিজ্ঞাসা করিলাম, কি হ'ল ?

না, কিছু নয়। তা আপনাকে বলতে বাধাই বা কি থাকতে পারে ? এ এক বিপদ হ'ল দেখছি। চলুন বাইরের ঘরে।

বাহিরের ঘরে গেলাম। প্রাণকৃষ্ণবাবু বলিলেন, মশাই, বিপদ কি এক রকম! পাশের বাড়ির ছাদে যে মেয়েটি দেখলেন—দেখেন নি ?

হ্যাঁ, দেখলাম বটে একটি মেয়েকে।

ভদ্রলোক তখন আমার কানের গোড়ায় মুখ আনিয়া অতি চুপি-চুপি বলিলেন, মেয়েটি আমার প্রেমে পড়েছে। Hopelessly in love.

বলেন কি! কেমন ক'রে বুঝলেন?

আমি ওঘরে গেলেই ঠিক ছাদে আসবে। মুখচোখ লজ্জায় লাল হয়ে ওঠে আমাকে দেখলেই।

কি আর বলিব! একটু হাসিলাম মাত্র।

এমন সময় শ্যামবর্ণ মোটাসোটা একজন ভদ্রলোক প্রবেশ করিলেন। প্রাণকৃষ্ণবাবু বলিলেন, আসুন, সনাতনবাবু, এই যে, ডাক্তারবাবু এসেছেন। সনাতনবাবুই আপনার কাছে আমায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন ডাক্তারবাবু। আপনাদের আলাপ-পরিচয় আছে নিশ্চয়ই।

আলাপ-পরিচয় ছিল না। তবু সনাতনবাবুকে নমস্কার করিলাম।

সনাতনবাবু বলিলেন, কেনন দেখলেন প্রাণকৃষ্ণবাবুর ভাগ্নেকে? জ্বরটা কি ব'লে মনে হয়?

সত্য কথা বলিতে হইলে বলিতে হয়, বিশেষ কিছুই বুঝিলাম না। আন্দাজে ম্যালেরিয়ার ঔষধ দিয়াছি। রোগীর এবং আমার যদি কপাল ভাল হয়, উহাতেই সারিয়া যাইবে।

কিন্তু রোগীর আত্মীয়স্বজনের কাছে সরল সত্য কথা বলা চলে না, অস্পষ্টতার আশ্রয় লইয়া আত্মরক্ষা করিতে হয়। বলিলাম, রেমিটেণ্ট-গোছের মনে হচ্ছে। তবে কুইনিনটা গোড়ায় গোড়ায় একটু দিয়ে রাখা ভাল। দিন-দুয়েক দিয়ে দেখা যাক। সনাতনবাবু দেখিলাম, অত সহজে ভুলিবার পাত্র নহেন। জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনার diagnosis কি?

সে তো আর একদিনে চট ক'রে বলা চলে না। রক্তটা পরীক্ষা করলে হয়তো ধরা যেতে পারে।

সনাতনবাবু ইহাই চাহিতেছিলেন। বলিলেন, আজকাল আপনাদের ওই হয়েছে এক ফ্যাশান। অমুক পরীক্ষা কর, তমুক পরীক্ষা কর। সেকালের সব ডাক্তারেরা কিন্তু এসবের ধার ধারতেন না। ছিলেন আমাদের হেমন্ত ডাক্তার। ইত্যাদি অনর্গল বলিয়া গেলেন।

হেমন্ত ডাক্তার নাড়ী দেখিয়া পেটে টিউমার হইয়াছে বুঝিতে পারিতেন। রমেশ ডাক্তার রোগীর ফোটো দেখিয়া তাহার জ্বর আছে কি না বুঝিতেন। বিশ্বম্ভর ডাক্তার, পতিত কবিরাজ, হরিকিশোর কম্পাউণ্ডার, সকলেই চিকিৎসা-শাস্ত্রে আমাদের অপেক্ষা বেশি পারদর্শী ছিলেন বুঝিলাম।

হাসিয়া বলিলাম, হ্যাঁ, এঁদের মতন কি আমরা পারি? আমাদের এর বেশি আর বিদ্যে নেই।

সনাতনবাবু যেন একটু প্রসন্ন হইলেন।

বলিলেন, সেকালের সব ব্যাপারই ছিল আলাদা রকমের। খেতে পারতাম কত আমরা! ভরপেট খাওয়ার পর অবলীলাক্রমে দু সের সন্দেশ, দশ-বারোটা ল্যাংড়া আম কতবার খেয়েছি। গোটা পাঁঠা পারেন খেতে একটা?

স্বীকার করিতে হইল, পারি না।

তবে?

ইহার কোন্ সদুত্তর দিব ভাবিতেছি, এমন সময় হঠাৎ সনাতনবাবু বুকের পেশী ও হাতের গুলি দেখাইয়া বলিলেন, দেখুন, এখনও ব্যাপারখানা দেখুন। দেখিলাম, ভদ্রলোক পেশীবহুল সন্দেহ নাই। সনাতনবাবুর বয়স অন্তত ষাটের কাছাকাছি; এ বয়সের হিসাবে শরীরে বাঁধন আছে স্বীকার করিতেই হইবে।

আমার একবার নাড়ীটা দেখুন তো।

সনাতনবাবুর নাড়ী দেখিলাম। মনে হইল যেন high blood pressure। বলিলাম। শুনিয়া সনাতনবাবু হাসিয়া বলিলেন, ওটাও একটা আজকালকার ফ্যাশান, হাই ব্লড-প্রেশার!

এমন সময় প্রাণকৃষ্ণবাবু আড়ালে লইয়া গিয়া সনাতনবাবুকে কি বলিতে লাগিলেন। একটু পরে আবার দুইজনে ঘরে ফিরিয়া আসিলেন।

সনাতনবাবু ছাদটার পানে চাহিয়া মুচকি হাসিয়া বলিলেন, তাই নাকি? আজকালকার মেয়েরা যা হয়েছে, বিচিত্র নয় কিছুই।

বুঝিলাম, প্রাণকৃষ্ণ প্রেমকাহিনী বর্ণনা করিয়াছে। লোকটা পাগল নাকি? দর্শনী লইয়া বিদায় গ্রহণ করিলাম।

সবে ঘুমটি আসিয়াছে।

রাত্রি কত হইয়াছে বলা শক্ত। হাত-ঘড়িটা বন্ধ।

ডাক্তারবাবু!

ধড়মড় করিয়া উঠিলাম। বাহিরে গিয়া দেখি, লণ্ঠন-হাতে একটি লোক দাঁড়াইয়া আছে।

কি চান?

শিগগির একবার চলুন সনাতনবাবুর বাড়ি।

কেন, কি হল?

তিনি পাইখানা থেকে এসে কেমন করছেন। শুয়ে পড়েছেন।

পদগতিতে যতটা দ্রুত যাওয়া সম্ভব, গেলাম। গিয়া দেখি, সনাতনবাবু আপাদমস্তক ঢাকা দিয়া শুইয়া আছেন। শিয়রে বসিয়া স্ত্রী আকুল ভাবে বাতাস করিয়া চলিয়াছেন।

সনাতনবাবু, দেখি একবার আপনার হাতটা?

কোন উত্তর নাই।

আবরণ উন্মোচন করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, মারা গিয়াছেন।

পেশীবহুল দেহ ঠিকই আছে। প্রাণ নাই।

অ্যাপপ্লেক্সি।

ফিরিয়া আসিতেছিলাম। একাই।

হঠাৎ একটা অন্ধকার গলির ভিতর হইতে কে ডাকিল, ডাক্তারবাবু নাকি?

কে ?

দেখি, গলি হইতে বাহির হইলেন প্রাণকৃষ্ণবাবু।

আপনার টর্চটা একবার দিন তো ডাক্তারবাবু।

কেন, ব্যাপার কি ?

চুপিচুপি প্রাণকৃষ্ণবাবু বলিলেন, এই সন্ধ্যের সময় ওই গলিটার ভেতর—সেই মেয়েটা কাগজের মত কি একটা যেন ফেললে। ঠিক লভ-লেটার। দেখিলাম, গলিটা সেই ছাদ ও প্রাণকৃষ্ণবাবুর বাড়ির ঠিক মাঝখানে। কৌতূহল হইল। টর্চ লইয়া গেলাম গলির ভিতর।

সেখানে নানাবিধ আবর্জনা। তাহার মধ্যে একটা সাদা কাগজের মত কি রহিয়াছে দেখিলাম। প্রাণকৃষ্ণবাবু উন্মাদের মত ছুটিয়া গিয়া তাহা লইয়া আসিলেন। কাগজে মোড়া কি একটা যেন।

খুলিয়া দেখা গেল, কতকগুলি চুল।

মেয়েরা প্রসাধন-শেষে মাথার ওঠা-চুলগুলি অনেক সময় কাগজে মুড়িয়া বাহিরে ফেলিয়া দেয়, তাহাই।

দেখছেন ডাক্তারবাবু ?

হ্যাঁ, চিঠি কই, ও তো চুল। ফেলে দিন।

বড় বেরসিক লোক আপনি। ইংরেজী নভেলে পড়েন নি আপনি, মেয়েরা তাদের প্রণয়ীকে চুল উপহার দেয় ? এ তাই।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে প্রাণকৃষ্ণবাবুর দিকে চাহিয়া দেখিলাম, চোখে পাগলের দৃষ্টি।

ঠিক তো, পাগলই।

ঘরে শক্ত ব্যারাম, আর এই প্রৌঢ় ভদ্রলোক রাত্রি দ্বিপ্রহরে গলির মধ্যে প্রণয়-নিদর্শন খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। মনে পড়িল, এই রকম পাগলদের কথা পড়িয়াছিলাম বটে। একজনকে দেখিয়াছিলামও, তাঁহার ধারণা সম্রাট পঞ্চম জর্জ গোপনে তাঁহার নিকট টাকা কর্জ লইয়া শোধ দিতেছেন না। অন্য সব বিষয়ে ইঁহারা

সাধারণ লোকের মতই। কিন্তু একটি কোন বিশেষ বিষয়ে তাঁহারা পাগল। একেবারে বদ্ধ উন্মাদ। ইঁহার ধারণা, মেয়েরা দেখিবামাত্র ইঁহার প্রেমে পড়ে।

জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনার ভাগ্যে কেমন আছে?

চুলগুলি সযত্নে বুকপকেটে রাখিতে রাখিতে প্রাণকৃষ্ণবাবু বলিলেন, সমস্ত দিন ওই বিদ্যেধরীর জ্বালায় কি আর অন্য কিছু করবার অবসর পেয়েছি! বার-পাঁচেক ছাদে এসেছে, জানলাতেও তিনবার উঁকি দিয়েছে। জ্বালাতনে পড়া গেছে।

পাগলের সহিত আর কতক্ষণ বকিব!

বলিলাম, আচ্ছা, বাড়ি যান।

বাড়ি ফিরিয়া আসিয়া বিছানায় আবার শুইলাম। ভাবিতে লাগিলাম, প্রাণকৃষ্ণবাবুকে পাগল বলিতেছি, আমি নিজে কি তাই নই? যাহার হাসি, ছলনা, লজ্জা লইয়া আমি স্বপ্নের প্রাসাদ রচনা করিয়াছি, সে হয়তো আমাকে মোটেই ভালবাসে না। ওই ছাদের মেয়েটির মতই হয়তো সে আমার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন, আমি প্রাণকৃষ্ণবাবুর মত অন্ধকার গলিতে বৃথাই ঘুরিয়া মরিতেছি।

নিবিড় বর্ষা নামিয়াছে।

সকালে উঠিয়া অবধি দেখিতেছি, আকাশে বাতাসে বর্ষার আয়োজন। অবিশ্রান্ত বৃষ্টি, আকাশের গুরু গুরু ডাক। উঠানে কদম্বগাছটায় অসংখ্য ফুল। হাতে কোন কাজকর্ম নাই, একটিও রোগীর দেখা নাই। ভজুয়া চাকরটাকে কাল ছুটি দিয়াছি, এখনও পর্যন্ত সে আসিল না!

অলসভাবে বিছানায় বসিয়া বর্ষা-সমারোহ দেখিতেছি।

"আষাঢ়স্য প্রথম দিবসে"—মনে পড়িতেছে। আজ আষাঢ় মাসের তেসরা, এবং আরও অনেক অমিল আছে, কিন্তু মিলও যে প্রচুর। বলিতে ইচ্ছা করিতেছে—

আজিকে যদিও সখী, আষাঢ়ের তৃতীয় দিবস,
এবং যদিও নাম মোর
নহে কবি কালিদাস, নহি উজ্জয়িনীবাসী,
তবু আজি এই ঘন ঘোর
সুনিবিড় বরষার সুবিপুল আয়োজন—

ডাক্তারবাবু!

ভেতরে আসুন।

আসিলেন পিওন—হস্তে একটি টেলিগ্রাম।

Come sharp. Nagen seriously ill.

সুতরাং সমস্ত কবিত্বকে শিকায় তুলিয়া নগেনের ব্যাপারে মগ্ন হইতে হইল। আমরা স্বাধীন ব্যবসা করি কিনা! নগেন, জাতিতে বেহারী ব্রাহ্মণ, আমার বন্ধু—বিশিষ্ট বন্ধু।

তথাপি আমাকে ফী দেয়। দুই-এক বার না লইবার চেষ্টা করিয়া দেখিয়াছি, সে আন্তরিক অস্বস্তি বোধ করে। চিরকাল তাহার যুক্তিটা এইরূপ যে, ইহা তোমার ব্যবসায়। আমি তোমার বন্ধু বলিয়াই বিশেষ করিয়া তোমাকে ফী দেওয়া কর্তব্য, কারণ আমি তাহা দিতে এখনও সক্ষম। যখন অক্ষম হইব, তখন না হয় তোমার উপর দাবি করিব। এখন কেন? বলিবার কিছু নাই। নগেন থাকে মতিহারীতে। ট্রেনে করিয়া যাইতে হইবে। তিনবার পথে চেঞ্জ। এই বিপুল বর্ষা! কিন্তু নগেনের অসুখ। যাইতেই হইবে; অন্য কোন উপায় নাই।

মুষলধারা।

স্টেশন অভিমুখে চলিয়াছি। গাড়ির ঘোড়া দুইটি যেন আর টানিতে পারিতেছে না—পথে এত কাদা। গাড়োয়ান ঘোড়ার পৃষ্ঠে

অবিরাম চাবুক বর্ষণ করিয়া চলিয়াছে। গতি কিন্তু বাড়িতেছে না, আবার চাবুক।

ওরে, আর মারিস না।

ট্রেনের আর বেশি সময় যে নেই ডাক্তারবাবু।

হ্যাঁ, তা বটে।

ঘড়ি দেখিলাম, ট্রেন ছাড়িতে আর কুড়ি-পঁচিশ মিনিট বাকি আছে। পথও প্রায় মাইল-দেড়েক বাকি। টিকিট করিতে হইবে। সুতরাং ঘোড়ার প্রতি সহানুভূতি চলে না। বলিলাম, হাঁকিয়ে চল্ তা হলে।

আবার চাবুক চলিতে লাগিল।

কিছুদুর গিয়া একটা সাঁকো। সাধারণ কাঁচা রাস্তায় যেমন সাঁকো থাকে, সেই রকম। আমার গাড়ি যখন সেই সাঁকোর উপর উঠিল, তখন মনে হইল, যেন একজন লোক পাশ কাটাইয়া দাঁড়াইতে গিয়া নীচে পড়িয়া গেল।

ওরে, থাম্ থাম্। দেখ্ তো, নীচে কে পড়ে গেল যেন। গাড়োয়ান কর্দমাক্ত এক ভদ্রলোককে তুলিয়া আনিল। ঠোঁটের খানিকটা কাটিয়া রক্ত পড়িতেছে, সর্বাঙ্গ সিক্ত।

প্রাণকৃষ্ণবাবু।

আপনি কোথা যাচ্ছিলেন এই বৃষ্টিতে? আসুন, গাড়ির ভেতরে বসুন। কোথাও যাবেন নাকি?

প্রাণকৃষ্ণবাবু হাঁপাইতেছিলেন। সামলাইয়া লইয়া বলিলেন, এই একবার স্টেশনে যাচ্ছিলাম। সেই মেয়েটি এই ট্রেনে শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছে কিনা। শেষ দেখাটা দিয়ে আসা কর্তব্য নয়?—বলিয়া হাসিতে লাগিলেন। ঠোঁট কাটিয়া রক্ত পড়িতেছে। হাসি আর রক্ত একাকার হইয়া গেল।

স্টেশনে পৌঁছিলাম। তাড়াতাড়ি টিকিট করিয়া গাড়িতে বসিয়া

জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিলাম, সেই মূষলধার বৃষ্টিতে প্রাণকৃষ্ণবাবু সমস্ত প্ল্যাটফর্মে ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছেন, প্রতি জানালায় খুঁজিতেছেন। কই, কেহ তো মুখ বাড়াইয়া বসিয়া নাই!

হঠাৎ মেয়েদের গাড়ির কাছে গিয়া হাতলটা ঘুরাইতেই একজন রেলওয়ে কর্মচারী তাঁহাকে বাধা দিল, ওটা মেয়েদের গাড়ি। সরে যান, ট্রেন ছাড়ছে।

ট্রেন ছাড়িয়া দিল।

মুখ বাড়াইয়া দেখিলাম, প্রাণকৃষ্ণবাবু থতমত খাইয়া দাঁড়াইয়া আছেন। চোখে উন্মাদের দৃষ্টি, সর্বাঙ্গে কাদা, ওষ্ঠ বাহিয়া রক্তধারা পড়িতেছে।

গাড়ি বাহিরের সমস্ত দুর্যোগকে উপেক্ষা করিয়া চলিয়াছে। অগণিত মাঠ-বন-নদী-পর্বত পার হইয়া যাইতেছে। একা একটি কামরায় বসিয়া আছি। প্রাণকৃষ্ণবাবুর কথা ভবিতেছি। আহা, মানুষ কত অসহায়!

প্রাণকৃষ্ণবাবুর মুখটা বার বার মনে পড়িতেছে।

চতুর্দিকে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি। ঝড়ের বেগে ট্রেন ছুটিয়া চলিয়াছে। বসিয়া ভাবিতেছি, সে তো একদিনও বলে নাই যে, সে আমাকে ভালবাসে। আমি কাছে গেলে সরিয়া গিয়াছে—সাধ্যপক্ষে কাছেই আসে নাই, আমাকে পরিহার করিয়া চলিয়াছে। আমি যেন একটা ডাকাত। আহা, সত্যই যদি ডাকাত হইতাম। জোর করিয়া ছিনাইয়া লইয়া আসিতাম, যেমন অসঙ্কোচে একটা ফুল পট করিয়া ছিঁড়িয়া লই। কিন্তু আমি ভদ্রলোক, আমার মনের বর্বরটাকে মুখোশ পরাইয়া রাখিয়াছি।

ছদ্মবেশ ত্যাগ করিতে পারি না।

পৃথ্বীরাজরা কি মরিয়াছে, সংযুক্তারা কোথায় ?
ইচ্ছা করে, চীৎকার করিয়া তাহাকে বলি—

ঝঞ্ঝাসম তব দ্বারে হানা দিতে আজি আসিয়াছি,
অকস্মাৎ প্রাণ ভরে অকাতরে ভালবাসিয়াছি,
আপনার আচরণে শতবার কত শাসিয়াছি,
তবু ভাসিয়াছি।
ভাসিয়াছি আজি আমি সীমাহারা মহাপারাবারে—
অতল সে কালো জলে নিঃশেষে নিজেরে হারাবারে।
আপনারে বন্দী রাখি হিসাবের ক্ষুদ্র কারাগারে,
সখী, যারা পারে
নিক্তিতে ওজন করি করিতে প্রণয় নিবেদন,
আমি তাহাদের নহি। মোর নহে ক্ষীণ আবেদন।—
চিরকাল যুগে যুগে গণ্ডি-দেওয়া শান্তি-নিকেতন
করি উচ্ছেদন—
মর্মান্তিক তীব্র দাহ—এ পথের পাথেয় আমার,
তাই বলে ভাবিছ কি ঝরাইব নয়ন-আসার ?
পুরুষ কাঁদে না কভু, চিরকাল এক দাবি তার—
'তুমি যে আমার'।

আমার আমারই তবু—এ জীবনে নাই বা পেলাম,
স্পষ্ট ভাষে দাবিটুকু শুধু আজ জানাতে এলাম।
বেদনার বিষভাণ্ড নিজহস্তে তুলিয়া খেলাম,
মরিয়া গেলাম।
নিষ্কৃতি পেলে না জেনো—চিরকাল রহিব ঘিরিয়া,
চন্দ্রালোকে, বর্ষা-রাতে দেখা দিব মরম চিরিয়া,
দিবারাত্রি জীবনের ছোট বড় শত ফাঁক দিয়া
আসিব ফিরিয়া।

চীৎকার করিয়া বলিতে ইচ্ছা করে, অথচ পারি না। এই যে সংযম, ইহাই তো জীবনের চরম ট্র্যাজেডি। হয়তো তাই এত সুন্দর।

নগেনের ঘরে ঢুকিয়া দেখি—হৈ-হৈ ব্যাপার

সেই ক্ষুদ্র-পরিসর ঘরের মধ্যে এক বিরাট ষাঁড়কে ঢোকানো হইয়াছে, রোগী তাহার পুচ্ছ স্পর্শ করিবে। গো-দান হইতেছে। অর্থাৎ মুমূর্ষু রোগী যদি এই কার্য না করে, তবে তাহার মৃত্যুর পর সে নাকি বৈতরণী পার হইতে পারিবে না। দমিয়া গেলাম। শেষ অবস্থা নাকি? ষাঁড়টাকে কোনক্রমে বাহির করিয়া নগেনকে দেখিলাম। শক্ত ব্যাপার বটে—মেনিনজাইটিস।

বাহিরে আসিয়া বসিলাম রোগীর ব্যবস্থাদি করিয়া। হাত-মুখ ধুইয়া একটু শুইবার যোগাড় করিতেছি, এমন সময় মাথায় প্রকাণ্ড পাগড়ি এক ভদ্রলোক আসিয়া আমার নিকট বসিলেন। ধপধপে গায়ের রঙ, গোঁফ-দাড়ি কামানো, চোখে বুদ্ধির জ্যোতি জ্বলজ্বল করিতেছে, কপালে সিঁদুরের প্রকাণ্ড একটা টিকা। মাথায় সাদা কাপড়ের পাগড়ি।

তিনি ইহাদের গুরু। নগেনের অসুখ শুনিয়া দেখিতে আসিয়াছেন। ইনি একজন বিখ্যাত জ্যোতিষীও। নগেনের কোষ্ঠীবিচার করিয়াছেন। আমাকে বলিলেন, আজ রাত্রি বারোটা যদি পার করে দিতে পারেন, তা হলে ও এ যাত্রা রক্ষে পাবে। তা না হলে নয়। আপনি যে কোন ওষুধ দিয়ে, যেমন করে হোক রাত্রি বারোটা পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখুন। আমিও ক্রিয়াকর্ম যা করবার, তা করছি।

তাঁহার ভাষাটা অবশ্য সংস্কৃত-ঘেঁষা হিন্দী, আমি তর্জমা করিয়া দিলাম।

গভীর রাত্রি। কয়টা জানি না। আকাশে চতুর্দিকে ঘন ঘটা,

ঘন ঘন বিদ্যুৎ, অবিরাম মেঘ-গর্জন। নগেনের শয্যাপার্শ্বে একা বসিয়া তাহাকে অল্প অল্প করিয়া ব্র্যাণ্ডি খাওয়াইতেছি।

এই ফুলেশ্বরী!

নগেন প্রলাপ বকিতেছে। ফুলেশ্বরী তাহার প্রথম পক্ষের স্ত্রী। অনেক দিন হইল মারা গিয়াছে। দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রী শিয়রে বসিয়া সেবা করিতেছে আর শুনিতেছে যে, তাহার স্বামী একবারও তাহার নাম করিল না, বার বার ডাকিতেছে ফুলেশ্বরীকে।

পাশের ঘরে শুদ্ধ সাত্ত্বিক কুলগুরু রুষ্ট গ্রহের তুষ্টি-বিধানের জন্য হোমাগ্নি জ্বালিয়া স্তব পাঠ করিয়া চলিয়াছেন।

আমি অসহায়ের মত বসিয়া একটু একটু ব্র্যাণ্ডি খাওয়াইতেছি।

নগেন মাঝে মাঝে চীৎকার করিতেছে, ফুলেশ্বরী!

নগেনের স্ত্রী বসিয়া চোখ মুছিতেছে।

বাহিরে মেঘ, জল আর বিদ্যুৎ।

হঠাৎ সব থামিয়া গেল যেন। বাহিরের মেঘ-গর্জন কমিয়া গেল, প্রকৃতির শান্ত ভাব ফিরিয়া আসিল। নগেন হঠাৎ আমার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, একি, তুমি কখন এলে?

তাহার পর তাহার স্ত্রীর দিকে ফিরিয়া বলিল, কমলা, বালিশটা একটু ঠিক করে দাও তো।

কমলা কৃতার্থ হইয়া গেল। পণ্ডিতজী জিজ্ঞাসা করিয়া পাঠাইলেন, কয়টা বাজিয়াছে?

দেখি, বারোটা বাজিয়া দশ মিনিট। নগেন বাঁচিয়া গেল।

নগেন ভাল হইয়া গিয়াছে।

প্রাণকৃষ্ণবাবুর ভাগিনেয় টাইফয়েডে ভুগিয়া ভাল হইয়াছে। ভাল হইয়া সে তাহার পাগল মামাটিকে লইয়া স্থানত্যাগ করিয়াছে।

আমার প্র্যাকটিস ক্রমশ বাড়িতেছে।

অন্তরের পিপাসাও বাড়িতেছে।

বাহিরে আমি এত ভদ্র, অথচ ভিতরে আমি এত বর্বর! সেই আদিম যুগের কেভ-ম্যান আজিও আমার মধ্যে বাঁচিয়া আছে। সভ্যতার সমস্ত চেষ্টাই তো সে পণ্ড করিয়া দিতেছে। নীতিকথা বলিয়া কিছুতেই তাহাকে থামানো যাইতেছে না।

কিন্তু বাহিরের ভদ্র বেশও তো খুলিয়া উলঙ্গ পশুটাকে লইয়া সমাজে বিচরণ করিতে পারি না।

আমার মনে যে এত অশান্তি, এত দ্বন্দ্ব, বাহিরে আমাকে দেখিয়া কে তাহা বলিবে?

এই যে ডাক্তারবাবু!

সহাস্য নমস্কারে কহিলাম, আসুন।

রামগঞ্জে যেতে হবে একবার, কলেরা হয়েছে।

চলুন।

৩

তুমি আমাকে ভালবাস না?

কোন উত্তর নাই।

বল না!

তথাপি কোন উত্তর নাই।

বল না!

কি বলব?

আমাকে ভালবাস কি না?

জানি না।

বলিয়া সে চলিয়া গেল। বিমূঢ় হইয়া বসিয়া রহিলাম। তবে

কি আমাকে ভালবাসে না? কিন্তু আমার অন্তর্যামী তাহা তো স্বীকার করে না। কিন্তু বলে না কেন?

বসিয়া মনের গোপন গহন গভীরে,
কেন গো উতলা করিছ আকুল কবিরে,
ওগো, বল না!
তোমার স্বপন আমার নয়নে আঁকিয়া,
সুখ পাও কেন আড়ালে লুকায়ে থাকিয়া,
ওগো, বল না!
কাছাকাছি আছ, তবু মোরে ধরা দাও না—
তার মানে কি গো, মনে মনে মোরে চাও না,
ওগো, বল না!
তাই যদি হও, ডাক কেন নানা সুরেতে,
ভুলাইয়া কেন লয়ে যাও মায়া-পুরেতে,
ওগো, বল না!

সে যেন আবার আসিয়াছে। পিছন দিকে দাঁড়াইয়া আছে। আমি ফিরিয়া চাহিলাম না, আপন মনে লিখিয়া চলিলাম। তাহার আঁচলের স্পর্শটুকু পিঠে লাগিতে লাগিল।

লঘু হাসি তব, অকারণে কাছে আসা এ,
চকিত চাহনি—নহে কি প্রণয়-ভাষা এ?
ওগো, বল না!
নহে যদি তবে বল না কেন তা খুলিয়া,
সন্দেহটুকু দাও নাকো উন্মূলিয়া,
ওগো, বল না!

মনে হইল, যেন আনত নয়নে সে দাঁড়াইয়া আছে। তাহার সমস্ত মুখে লজ্জার স্নিগ্ধ শোভা। অধর কাঁপিতেছে।

সহজ নয়নে চাহ না মুখের পানে তো,
আঁখি নত কর—বুঝি না তাহার মানে তো,
ওগো, বল না !
ডাকি যবে তুমি চলে যাও সম্বরিয়া,
ডাকি না যখন, নানা ছলে এস সরিয়া.
ওগো, বল না !
যে কথা ঝলকে নয়নে অধরে পলকে,
যে কথা কাঁপিছে উড়ে-পড়া ওই অলকে,
ওগো, বল না !
ফুল ফুটে শেষে জান না কি যায় ঝরিয়া ?
যৌবন, সখী, জান না কি যায় মরিয়া ?
ওগো, বল না !

আরও কাছে সরিয়া আসিল। তবু ফিরিয়া দেখিলাম না ; আমার কি অভিমান নেই ? কবিতায় কিন্তু অভিমান ফুটিতেছে না, শুধু অনুনয়। ইচ্ছার বিরুদ্ধে লিখিয়া চলিয়াছি।

যে মন রেখেছি তব পায়ে দিব বলিয়া,
অকারণে, সখী, কেন যাও তারে দলিয়া,
ওগো, বল না।
ওই তো অধরে মুচকি হাসিটি ফুটেছে,
নয়নের কোণে শরম ফুটিয়া উঠেছে,
ওগো, বল না !
জানি মনে মনে, তবুও ভাষায় বল গো,
সে কথাটি যার লাগি আঁখি চঞ্চল গো,
ওগো, বল না !
বল না আমারে, বল বল সখী, বল না
অকারণে কেন এত অকরুণ ছলনা,
ওগো, বল না !

ঝুঁকিয়া পড়িয়া সে যেন দেখিতেছে। ফিরিয়া বসিলাম। সে তো নয়।

কে তুমি?

অপ্রস্তুত হইয়া সে দাঁড়াইয়া রহিল।

আমি দুখিনী বাবু, শুনেছি, আপনার বড় দয়া। তাই সাহস—

দিনের বেলা আসতে কি হয়?

দিনের বেলা আপনি নানা কাজে ব্যস্ত থাকেন, তাই।

কি হয়েছে তোমার?

দেখিলাম, সর্বাঙ্গে বড় বড় চাকা চাকা ঘা। নাকটা ফুলিয়াছে। ঠোঁটের কোণে সাদা সাদা ঘা। চক্ষু দুইটি লাল। কুষ্ঠ নয় তো?

কতদিন হয়েছে?

দু মাস থেকে।

ইনজেকশন দিতে হবে। খরচ লাগবে।

আমি গরিব মানুষ, আমাকে একটু দয়া করুন; ভগবান আপনার ভাল করবেন।

ভগবান রাজি হয়েছেন?

বুঝিতে না পারিয়া আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। আমাকে ভাল করে দাও, ভাল করে দাও, ভাল করে দাও। দুই হাত বাড়াইয়া সে আমার পা দুইটি জড়াইয়া হাউহাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি পা সরাইয়া লইলাম।

মহা মুশকিল! কি করা যায়?

বলিলাম, আচ্ছা আমার ফী দিতে হবে না। ওষুধের দামটা দিতে পারবে তো?

আমার কিছু নেই, আপনি দয়ার সাগর—

চুপ কর।

একটা প্রেসক্রিপশন লিখিয়া তাহার হাতে একটি টাকা দিয়া বলিলাম, বত্রিশ দাগ ওষুধ পাবে আর এস না আমার কাছে। ভাল যদি হয়, ওতেই হবে।

প্রণাম করিয়া সে চলিয়া গেল। ভাবিতে লাগিলাম, টাকা পাইলে উহাকে বোধ হয় এত অযত্ন করিয়া দেখিতাম না। তাড়াতাড়িতে আন্দাজে সিফিলিসের একটা প্রেসক্রিপশন লিখিয়া দিলাম। ঠিক হইল কি ?

মনের দিকে চাহিয়া দেখিলাম। তাহার মুখের পানে চোখ তুলিয়া চাহিতে লজ্জা করিতে লাগিল। তাহার কাছে যেন ছোট হইয়া গিয়াছি।

৪

আমায় মাপ করবেন হরিশবাবু, আমি পারব না।

সেই আমার প্রতিবেশী হরিশবাবু। তিনি কেরানী, ইন্সিওরেন্সের দালালও। আমি তাঁহার কোম্পানির ডাক্তার। তিনি একটি কেস আনিয়াছেন। লোকটা মোটা, ইউরিনে শুগার আছে। হার্টটাও সুবিধার নয়। হরিশবাবুর অনুরোধ, সর্বাঙ্গসুন্দর রিপোর্ট যেন একটা লিখিয়া দিই। ফার্স্টক্লাস লাইফ না হইলে তাঁহার কোম্পানি লইবে না। কিন্তু তাহা কি করা যায় ? দিনকে রাত্রি করা আমার দ্বারা সম্ভব নয়। হরিশবাবু বলিলেন, কত কষ্টে কত খোশামোদ করে লোকটাকে রাজি করালাম, আর আপনি দু মিনিটের মধ্যে সব শেষ করে দিলেন ? আপনার অবিদিত তো কিছুই নেই। ছেলেটা আজ প্রায় মাসাবধি ভুগছে। ওষুধ-পথ্য যোগাতেই জিব

বেরিয়ে যাচ্ছে। এই কেসটা হলে কিছু টাকা পাওয়া যেত, একটু বিবেচনা—

তা হয় না হরিশবাবু, মাপ করবেন।

মাপ আপনিই আমাকে করুন। করে দিন দয়া করে। আমার যে কি অবস্থা! আচ্ছা, ছেলেটির কি বাঁচবার আশা নেই?

শক্ত ব্যারাম, টাইফয়েড হয়েছে। বুঝতেই তো পারেন।

এসব জেনেও আপনি আমার অবস্থার প্রতি একটু দয়া করবেন না?

মাপ করুন।

হরিশবাবু খানিকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন, দিন তা হলে ছেলের প্রেসক্রিপশনটা লিখে।

ভাইটামিন ডি-টা?

ওটা এখনও কেনা হয় নি। দেখি যদি আজকে—

হঠাৎ হরিশবাবু আমার হাত দুইখানা ধরিয়া বলিলেন, সত্যি, বড় দুরবস্থায় পড়েছি ডাক্তারবাবু, ওটা যদি করে দিতে পারতেন!

তখন নিরুপায় হইয়া তাঁহাকে বলিতে হইল, তার চেয়ে বরং এক কাজ করুন, এই দশটা টাকা না হয় আপনি—

কথা শেষ করিতে পারিলাম না। উত্তেজিত হইয়া হরিশবাবু বলিয়া উঠিলেন, আপনি এমন করে আমায় অপমান করতে সাহস করলেন? আজ আমি না হয় কপালদোষে দরিদ্র হয়েছি, জানেন, আমি কত বড় বংশের ছেলে? রতনগঞ্জের চাটুজ্জেদের নাম এখনও ও অঞ্চলে লোকে ভোলে নি। কম করে দুশোখানা পাতা আমাদের বাড়িতে পড়ত, আর আপনি আজ দশটা টাকা আমাকে ভিক্ষা দিতে এলেন! আপনার—

হরিশবাবু আর বলিতে পারিলেন না। দুই ফোঁটা জল তাঁহার চোখে টলটল করিতেছে দেখিতে পাইলাম।

অপ্রস্তুতের চরম।

হরিশবাবু যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, থ্যাঙ্ক ইউ।

বৈকালে হরিশবাবুর বাড়িতে তাঁহার ছেলেকে দেখিতে গিয়াছি।

হরিশবাবু বাড়িতে নাই। তাঁহার স্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, হ্যাঁ বাবা, টাইফয়েড বলছ—কিন্তু ছেলে এমন বিড়বিড় করে কি বকছে? মাঝে মাঝে আঁতকে উঠছে।

টাইফয়েড ওরকম হয়।

কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, সেই যে সেদিন এক পাগলী ছেলেকে আঁকড়ে ধরেছিল, সে-ই কিছু নজর-টজর দেয় নি তো?

না না, ও কিছু নয়।

সেই দিন থেকেই বাছা কেমন যেন নেতিয়ে পড়েছে।

কিছু বলিলাম না। একটু পরে বলিলাম, দেখুন, এই ওষুধটা রেখে দিন। রোজ দশ-বারো ফোঁটা করে দেবেন খাবারের সঙ্গে মিশিয়ে—ভাইটামিন-ডি। ভুলবেন না যেন।

আচ্ছা। দাম কত এর?

দাম লাগবে না। এমনিই স্যাম্পল পেয়েছিলাম।

মিথ্যা কথা বলিয়া এত সুখ কখনও পাই নাই।

হরিশবাবু আসিলেন। আসিয়াই বলিলেন, আপনি তো কিছুতে দিলেন না; কিন্তু অল-ইণ্ডিয়া লাইফ অ্যাসিওরেন্স কোম্পানির এজেণ্ট কেসটিকে বেশ বাগিয়ে নিলে। আর খগেন ডাক্তার কেমন সুন্দর ফার্স্ট ক্লাস লাইফ রিপোর্ট দিয়ে দিয়েছে দেখে এলাম। আপনার যত সব ইয়ে—

চুপ করিয়া রহিলাম।

হরিশবাবুর স্ত্রী বলিতে লাগিলেন, দেখ, আজ অয়েলক্লথ আনা দরকার একটা। বিছানা বড্ড ভিজে যাচ্ছে।

হরিশবাবু বলিলেন, আচ্ছা।

গ্লুকোজটাও ফুরিয়েছে।

আচ্ছা।

কি রকম যেন অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলাম, বলিলাম, এবার তা হলে উঠি।

রাত্রে—গভীর রাত্রে, হরিশবাবুর ছেলে মারা গেল। একা উৎকর্ণ হইয়া মায়ের বুক-ফাটা কান্না শুনিতেছি। পাশে মিলের বড় চোঙটা হইতে মৃদু শব্দ করিয়া ধোঁয়া বাহির হইতেছে—ফঃ-ফঃ-ফঃ-ফঃ।

মনে হইল, একটা পাগলী যেন হাসিতেছে।

নিজেকে বড় অপরাধী মনে হইতে লাগিল। হয়তো ছেলেটার ভাল সেবা হয় নাই। ভিজা কাঁথায় শুইয়া শুইয়া, ভাল পথ্য না পাইয়া, বোধ হয় ছেলেটা মারা গেল। ছোট ছেলেরা তো প্রায় টাইফয়েডে মরে না। তবে?

দারিদ্র্য! হরিশবাবুর সেই লাইফটা ফার্স্ট ক্লাস লিখিয়া দিলে ক্ষতি ছিল কি? খগেন ডাক্তার তো দিয়াছে। আমাদের বিচারই কি নির্ভুল? ওই মোটা বহুমূত্ররোগী তাহার খারাপ হার্ট লইয়া হয়তো বহুকাল বাঁচিয়া থাকিবে, আর যে সব লাইফ ফার্স্ট ক্লাস বলিয়া লিখিতেছি—তাহারা হয়তো দুই দিন পরেই মারা যাইবে। কে জানে? হরিশবাবুর শুধু কিছু টাকা লোকসান করাইয়া দিলাম। কোন্‌টা ঠিক? সত্য কি?

মিলের চোঙে পাগলী হাসিতেছে—ফঃ-ফঃ-ফঃ-ফঃ-ফঃ।

ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম।

স্বপ্নে দেখিলাম, সে আসিয়াছে। দুই হাত দিয়া আমার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া চুম্বন দিয়া যেন বলিতেছে, তুমি ঠিক করেছ।

ঘুম ভাঙিয়া গেল। তখন ভোর। তখনও হরিশবাবুর বাড়ির কান্না থামে নাই। পাগলীও সমানে হাসিয়া চলিয়াছে—ফঃ-ফঃ-ফঃ। এলোমেলো ধোঁয়ার কুণ্ডলী সার বাঁধিয়া ভোরের আকাশে উড়িতেছে —যেন পাগলিনীর আলুলায়িত কেশভার।

৫

আমাকে রসুলপুর যেতে হবে।

নিরীহ গোয়ালা চুপ করিয়া গেল। রসুলপুর তাহার জমিদারের বাড়ি, সুতরাং সেখানেই আমার সর্বাগ্রে যাওয়া অবশ্য কর্তব্য, ইহা সে অস্বীকার করিতে পারিল না। তা ছাড়া গরিব মানুষ, ফী সব সময় দেয় না। মাঝে মাঝে দুধটা-দইটা দিয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। সে চুপ করিয়া রহিল। তাহাকে বলিলাম, ফেরবার পথে তোর ওখানে দেখে যাব; তুই বিকেলের দিকে বাড়িতে থাকিস। সে চলিয়া গেল।

ভাল আছেন তো ডাক্তারবাবু?

কে? দেখি আমাদের সেই মহিন্দর।

ভাল আছেন তো?

হ্যাঁ, এই এক রকম চলে যাচ্ছে। কি মনে করে?

বিশেষ কিছু নয়। একটু চুলকুনি হয়েছে, তাই—

দেখিলাম। সত্যই বিশেষ কিছু নয়। ঔষধ লিখিয়া দিলাম।

এইটে ঘষে ঘষে লাগাবেন। তা হলে আমি চলি? আমাকে অনেক ঘুরতে হবে এখন। আপনি কোথায় উঠেছেন? খাওয়া-দাওয়া হয়েছে তো?

মহিন্দর দেখিলাম উসখুস করিতেছে।

বলিলাম, বেশ তো, আমার এখানেই চাট্টি খাবেন। এই ভজুয়া!

ভৃত্য ভজুয়া আসিল। তাহাকে বলিলাম, বাবুকে বাইরের ঘরে বসতে দাও। ঠাকুরকে বলে দাও, উনি খাবেন এবেলা।

নানা স্থানে ঘুরিলাম।

কাহারও দাঁতে ব্যথা, কাহারও টাইফয়েড, কাহারও যক্ষ্মা, ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর, আমাশয়, বেরিবেরি—রোগের শেষ নাই। কাহারও আবার কিছুই নয়, মানসিক অস্বস্তি। দিব্য স্বাস্থ্য, তাহার কিন্তু বিশ্বাস, হজম হয় না। যা হোক একটা কিছু ব্যবস্থা করিতে হয়। অনেক বড়লোকের দেখি অসুখের কারণ—টাকা। হয় অত্যধিক খায়, নতুবা মাতাল, না হয় দুশ্চরিত্র। ইহার যদি কোনটাই না হয়, তাহা হইলে তাহার বিশ্বাস যে, হয় তাহার ধাতু-দৌর্বল্য, না হয় ইন্দ্রিয়শৈথিল্য ঘটিয়াছে।

সকলের ব্যবস্থা করি।

বাড়ি ফিরিয়া দেখি, অর্ধেক টাকা অচল।

বেলা দুইটায় ফিরিয়া শুনিলাম, মহিন্দর খাইয়া চলিয়া গিয়াছে। আমিও উর্ধ্বশ্বাসে খাইয়া লইলাম। রসুলপুর যাইতে হইবে।

জমিদার-বাড়ির গাড়ি আসিল, প্রকাণ্ড মোটর।

যাইবার সময় আলোয়ানটা চতুর্দিকে খুঁজিলাম। পাওয়া গেল না। ভজুয়া প্রাণপণ চেষ্টা করিল। আমিও করিলাম, আলোয়ানটা কিছুতে আর পাইলাম না। বাড়িতে একটা স্ত্রীলোক না থাকিলে চলা অসম্ভব। অন্তরলোক-বাসিনী মুখ টিপিয়া হাসিলেন।

মোটর ছুটিতেছে।

তীরবেগে ছুটিয়া চলিয়াছি। স্পীড-এর যুগ। জীবনের গোনা দিন কয়েকটি উর্ধ্বশ্বাসে ছুটিতে ছুটিতে কাটাইয়া দিতে হইবে। কত-টুকু মানুষের আয়ু! যতটা পারি ছুটাছুটি করিয়া দেখিয়া লই। নাই বা হইল সবটা ভাল করিয়া দেখা। ক্ষণিকের চাক্ষুষ পরিচয়, সেটাও কি কম! সুন্দর ফুলে ভরা গাছটা, তাহার পর একপাল

গরু, একজন পথিক, একটা পুল, তুইটা কুকুর, আবার একটা গাছ, চমৎকার মেয়েটি, একরাশ ধূলা উড়াইয়া আর একটা মোটর, ধূলা ভেদ করিয়া এক ঝাঁক অশোকফুল চট করিয়া দেখা দিয়া মিলাইয়া গেল। বাঃ, পাশের মাঠে পুকুরটি কি সুন্দর! গরুর গাড়ির সারি চলিয়াছে, তুইটি বুড়া-বুড়ী মোট বহিয়া যাইতেছে, সাঁওতাল মেয়েটির যৌবন কি নিটোল, মুর্গীগুলা ছুটিয়া গেল—রোখো, রোখো। যাক, ছেলেটা বাঁচিয়া গিয়াছে।

তীরবেগে ছুটিয়াছি।

এইরূপ তীরবেগে ছুটিতে ছুটিতে সন্ধ্যা-নাগাদ রসুলপুরে পৌছানো গেল।

রসুলপুরের জমিদার বছর তুই হইল মারা গিয়াছেন।

নিঃসন্তান যুবতী বিধবা রাণীজী সম্পত্তির অধিকারিণী।

আমাকে সম্বর্ধনা করিলেন জমিদারের নূতন নায়েব—কুঞ্জলাল-বাবু। তিনিই এখন সর্বেসর্বা এবং তাঁহার কর্মদক্ষতায় জমিদারির উন্নতিও হইয়াছে বিস্তর। লোকটি, দেখিলাম, বিনয়ের অবতার।

আমি গাড়ি হইতে নামিবামাত্র তিনি হেঁট হইয়া আমার পদধূলিই লইয়া ফেলিলেন। আমি সন্ত্রস্ত হইয়া হাঁ-হাঁ করিয়া উঠিলাম। তিনি বলিলেন, সে কি! আপনি ব্রাহ্মণ, তা বললে কি চলে?

রসুলপুর জমিদার-বাড়িতে এই আমার অল্পদিন যাতায়াত শুরু হইয়াছে।

নায়েবটিকে ইতিপূর্বে চিনিতাম না।

জিজ্ঞাসা করিলাম, অসুখ কার?

ভেতরে আসুন, বসুন, ঠাণ্ডা হোন। অসুখের কথা তো হবেই।

ভিতরে গেলাম। গিয়া দেখি, সমারোহ-ব্যাপার। তুইজন ভৃত্য চেয়ার আগাইয়া দিল। হাতমুখ ধুইবার জল, চা, জলখাবার, পান, তামাক, বিনয়-বচন—ক্রমান্বয়ে আসিতে লাগিল।

আমি যেন বাড়িতে জামাই আসিয়াছি। বলিলাম, চলুন, এবার রোগী দেখা যাক।

হ্যাঁ হ্যাঁ, চলুন।

অসুখ কার?

রাণীজীর।

পরীক্ষা করিয়া বুঝিলাম, পাঁচ মাস হইবে। ভয়ের কারণ তো কিছু দেখিতেছি না, অথচ—। নিমেষের মধ্যে কারণটা বুঝিতে পারিলাম। বিধবা যে! হিন্দুর ঘরের বিধবা!

টাকার জন্যে নয়, ওসব আমার দ্বারা হবে না।

হাজার টাকা পেলেও নয়?

না। আমাকে মাপ করবেন।

আশা করি, কথাটা গোপন রাখবেন।

নিশ্চয়।

ফী লইয়া বাহির হইয়া আসিলাম। এবারে কুঞ্জলালবাবুর পদধূলি লইবার আগ্রহ দেখিলাম না।

বিদ্যুদ্বেগে ফিরিয়া চলিয়াছি। সমস্ত অন্তঃকরণে দারুণ বিতৃষ্ণা। অনর্থক আমার এতটা সময় নষ্ট করাইল।

এই, রোখো।

নামিয়া পড়িলাম। সকালে কারু গোয়ালাকে বলিয়াছিলাম, ফিরিবার সময় তাহার বাড়ি যাইব। মাঝামাঝি রাস্তা দিয়া হাঁটিয়াই চলিলাম। অত্যন্ত অন্যমনস্ক। কতক্ষণ চলিয়াছিলাম খেয়াল নাই। বারুইপুর গ্রামের ভিতর আসিতেই একটা কুকুর ঘেউঘেউ করিয়া উঠিল, চমক ভাঙিল।

সন্ধান করিয়া কারু গোয়ালার বাড়ি বাহির করিলাম।

কাছে গিয়া বুকের ভিতরটা ধড়াস করিয়া উঠিল।

কান্নার শব্দ।

আগাইয়া গেলাম। কারুর ছেলে একটু আগেই মারা গিয়াছে।

কলেরা হইয়াছিল।

সময়ে চিকিৎসা করিলে বোধ হয় বাঁচিত।

কারুর স্ত্রীর আর্তনাদ কানে আসিতে লাগিল, ওগো ডাক্তারবাবু, এত দেরি করে কেন এলে গো, আমার বাছা যে চলে গেছে।

৬

রাত্রে বাড়ি ফিরিয়া কিছু খাইলাম না।

মনটা খারাপ। ভজুয়া সহানুভূতির স্বরে জিজ্ঞাসা করিল, একটু চা বানিয়ে দোব ?

উপুড় হইয়া শুইয়া ছিলাম। বলিলাম, না।

কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছি জানি না।

ঘুম যখন ভাঙিল, তখন চন্দ্র অস্তোন্মুখ। ম্লানায়মান জ্যোৎস্নায় সমস্ত পৃথিবী তন্দ্রাতুর। আশ্চর্য মানুষের মন। কয়েক ঘণ্টা পূর্বে পৃথিবীর সমস্ত-কিছু বিস্বাদ মনে হইতেছিল। এই নির্জন শেষরাত্রে ঘুমন্ত পৃথিবীর দিকে চাহিয়া করুণায় সমস্ত মন ভরিয়া গেল। অসহায় পৃথিবী ঘুমাইতেছে। আজন্ম রুগ্না। রোগের নানা যন্ত্রণার পর হঠাৎ যেন গভীর অবসাদে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। পাণ্ডুর জ্যোৎস্না যেন পৃথিবীর বিষণ্ণ হাসি।

সামনের বাগানটায় পায়চারি করিতেছি। শেফালিফুলগুলি ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। ঘাসে ঘাসে শিশির। কে যেন সারারাত বসিয়া কাঁদিতেছে। কে সে ? সে কি রাত্রে লুকাইয়া আসে ?

নীরব চারিদিক,
গহন চারিধার,
এস না এ সময়ে
এস না একবার!
আকাশে তারা ছাড়া,
নাহি তো কারো সাড়া,
কেহ তো জানিবে না
এ নিশি-অভিসার!

৭

বিরক্তি বোধ হইতেছিল।

দেখুন, আপনি আমাকে না চিনলেও নলিনীবাবুকে চেনেন তো? তিনি আমার পিসতুতো শালা হন। তা ছাড়া পূর্ণিয়ার যিনি আজকাল সবজজ, তিনিও হলেন আমাদের নিকট-আত্মীয়, সম্পর্কে বেয়াই বলতে পারেন। ওই যে আপনাদের মিলের ম্যানেজার সর্বেশ্বরবাবু, তিনি হলেন গিয়ে আমার জ্যাঠতুতো বোনের মামা। আপনাদের বাড়িও গেছি। তখন আপনি বোধহয় খুবই ছেলেমানুষ। সেটা হবে গিয়ে নাইন্টিন টুয়েলভ। ওই যে নাম করছিলাম ব্রহ্মাপুরের ডাক্তার, তিনি হলেন গিয়ে আমার খুড়তুতো ভায়ের আপন শালা। তা ছাড়া এ অঞ্চলে আমাদের চেনা-শোনা ঢের লোক রয়েছে, ওই কালীকিঙ্কর—ওই যে কমিশনার সাহেবের ওখানে কাজ করেন, ওঁকে তো মেসো বলেই বরাবর ডাকি। তা ছাড়া আজকাল যিনি হরিহরপুরের দারোগা, তিনি হলেন আমার মামার শ্বশুর। আপনাদের পাড়াতেও রয়েছেন জীবনবাবু, তিনি গিয়ে—

তাঁহাকে থামাইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, বুঝলাম। কিন্তু আপনি চান কি ?

এই একটু দরকারে পড়ে এসেছি। খগেন ডাক্তারটা এত বেশি টাকা চায় যে, আমাদের মতন গেরস্তলোকের পক্ষে দেওয়া অসম্ভব। আপনার শুনতে পাই দয়াধর্ম আছে।

দরকারটা কি ?

একখানা সার্টিফিকেটের। খগেন ডাক্তার আমার পিসের ভাগনে কিনা, সেই ভরসায় গিয়েছিলাম। শিক্ষা হয়ে গেল। ষোল টাকা চায় একটা সার্টিফিকেট দিতে! ডাক্তার, না, ডাকাত!

আদ্যোপান্ত সব শুনিলাম। বলিলাম, আমায় মাপ করবেন। মিথ্যে সার্টিফিকেট আমি দিই না।

মিথ্যে মানে? আমি যা বলছি, তা কি মিথ্যে বলে মনে করছেন ?

মিথ্যে বলে মনে করছি না। হতে পারে সত্যি। কিন্তু শোনা কথার ওপর নির্ভর করে কোনও সার্টিফিকেট আমি দিতে পারব না।

লোকটা খানিকক্ষণ চুপ করিয়া গেল। ভদ্রলোকের ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া ভুরু, কানে গোছা-গোছা চুল, নাকের ভিতর দিয়া খানিকটা চুল দেখা যাইতেছে। অনুমান করিলাম, বক্ষে ও পৃষ্ঠদেশেও রোমের অসদ্ভাব নাই। মাথায় টাক, গোঁফ-দাড়ি কামানো; কিন্তু তিন-চার দিন বোধ হয় কামানো হয় নাই, খোঁচা-খোঁচা হইয়া উঠিয়াছে। ক্ষণপরেই তাঁহার মুখে মৃদু হাস্য খেলিয়া গেল।

আমার এমন বিপদে যদি সাহায্য না করেন, তা হলে যাই কোথায়, বলুন ?

কি করব বলুন, আমি নাচার।

ফী আমি আপনাকে দোব, তবে একটু কনসেশন করতে হবে। চাকরি করে সংসার চালাতে—

আমাকে মাপ করবেন, দিতে পারব না।

বেশ, পুরো ফী-ই দোব আপনার। কত নেন আপনি ?

টাকার জন্যে আটকাচ্ছে না। ওরকমভাবে আমি সার্টিফিকেট দিই না।

তবে কি বলতে চান, আমার চাকরিটা যাক ?

তার মানে ?

মানে, আমি দরখাস্ত করেছি যে, এই গ্রামে এসে আমি হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েছি। এক মাসের ছুটি চাই। তারা বলেছে, অবিলম্বে একটা মেডিকেল সার্টিফিকেট দাও। এক মাস কামাই করেছি, এখন তার সঙ্গত কারণ দেখাতে না পারলে হয়তো দূর করে দেবে। করি কি বলুন তো ? মেডিকেল সার্টিফিকেট মানে —আপনি আর খগেনবাবু। খগেনবাবু ছুরি শানিয়ে বসে আছেন, আপনি বিবেক শানিয়ে বসে আছেন। আচ্ছা ফ্যাসাদে পড়লাম তো !

ঝাঁকড়া-ঝাঁকড়া ভুরু কুঞ্চিত করিয়া ভদ্রলোক বসিয়া একদৃষ্টে আমার দিকে তাকাইয়া রহিলেন।

অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলাম।

ভজুয়া আসিয়া খবর দিল, বাহিরে দুইজন লোক অপেক্ষা করিতেছে। ঝাঁকড়া-ভুরু প্রশ্ন করিলেন, একটু বিবেচনা করে যদি দেখতেন !

মাপ করবেন, পারব না।

ভদ্রলোক উঠিলেন। দ্বার পর্য্যন্ত গিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, আপনি যেন মনে করবেন না, আমি অসুখে পড়ি নি। সত্যি, আমার অসুস্থতার জন্যেই আমি কাজে জয়েন করতে পারি নি। কিন্তু আমি কখনও অ্যালোপ্যাথি ওষুধ খাই না। আমার নিজের হোমিওপ্যাথির বাক্স আছে। নিজের চিকিৎসা নিজেই করি আমি। নিজের সার্টিফিকেটও যদি লিখতে পারতাম ! যাই খগেনের কাছেই।

He is more amenable to reasons. He sells his services, but at an exorbitant rate—এই যা মুশকিল।

হঠাৎ ভদ্রলোকের আলোয়ানখানার দিকে দৃষ্টি পড়িল, ঠিক আমার আলোয়ানটারই মত।

ভদ্রলোক আমার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া বলিয়া উঠিলেন, আলোয়ানটা দেখছেন? কাল এই আলোয়ানটা কিনতে গিয়েই তো হাতের টাকা গেল ফুরিয়ে। তা না হলে খগেনের কাছেই নিতাম সার্টিফিকেট। বারো টাকায় ড্যাম চীপ। কি বলেন? এর দাম অন্ততপক্ষে ষাট টাকা।

বলিলাম, পঁচাত্তর।

ওঃ, তাই নাকি?

কোথা থেকে কিনলেন আপনি?

আপনি চিনবেন কি? ওপারের একটি লোক। মহিন্দর তার নাম। এসে বললে, ভাই, মুশকিলে পড়েছি, এই আলোয়ানটা রেখে কিছু টাকা দে। দেখে লোভ হল। কিনে ফেললাম। ঠকি নি তো?

না।

আমার আলোয়ান গায়ে দিয়া ঝাঁকড়া-ভুরু চলিয়া গেল। আমি বসিয়া শীতে কাঁপিতে লাগিলাম। পুলিসে খবর দিতে প্রবৃত্তি হইল না।

মনের ভিতর কে যেন বলিতে লাগিল, পুলিসেই যখন খবর দিলে না, একটা আইন যখন ভঙ্গ করিলে, তখন সার্টিফিকেটটাও দিয়া দিলে না কেন? লোকটাও খুশি হইত, তোমারও টাকা হইত। তা ছাড়া, লোকটার সত্যই অসুখ করিয়াছিল তো। না হয় তোমাদের ঔষধ খায় নাই। ভজুয়া আসিয়া আবার খবর দিল, বাহিরে লোকেরা অপেক্ষা করিতেছে।

গেলাম বাহিরে।

প্রথমেই দেখা হইল এক কাবুলীর সঙ্গে। সে সেলাম করিয়া সহজ প্রাঞ্জল ভাষায় ব্যক্ত করিল যে, তাহার পারার ব্যারাম হইয়াছে। চিকিৎসা করাইতে চায়। তাহাকে ব্যবস্থা দিবামাত্র সে যথারীতি ফী দিয়া বিদায় গ্রহণ করিল।

আসিল একজন বাঙালী।

একটু প্রাইভেটে আপনার সঙ্গে 'টক' করব।

বেশ তো।

প্রাইভেটে 'টক' করিলাম।

কি মনে হচ্ছে আপনার ?

আমার তো মনে হয় সিফিলিস।

কি করে হল ?

সে তো আপনিই ভাল বলতে পারবেন।

ভদ্রলোক একটু কাঁচুমাচু হইয়া গেলেন।

কখনও কোন ইম্‌পিওর কানেক্‌শন হয় নি আপনার ?

জিভ কাটিয়া তিনি বললেন, আজ্ঞে না।

তখন বলিলাম, রক্তটা পরীক্ষা করান তা হলে। আমার দেখে তো ওই ছাড়া আর অন্য কোন সন্দেহ হয় না।

আচ্ছা, গামছা-টামছার ছোঁয়াচ লেগে, কিংবা কিছু ডিঙিয়ে—

হ্যাঁ, হতে সবই পারে। ওই আকাশের সূর্যটাও এক্ষুনি দপ করে নিবে যেতে পারে। আটকায় কে ? সবই সম্ভব।

উপায় ?

রক্ত পরীক্ষা করান। ইত্যবসরে এই ওষুধগুলা ব্যবহার করুন।

সচ্চরিত্র বাঙালী ভদ্রলোক বিদায় লইলেন। বলিয়া গেলেন, ফী টা পরে পাঠাইয়া দিবেন।

তারপর আসিল একজন মারোয়াড়ী। তাহার সিকায়েৎ অর্থাৎ ধাতু-দৌর্বল্য। বগলে করিয়া এক বাণ্ডিল প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন আনিয়াছে। দিল্লীর হাকিম হইতে আরম্ভ করিয়া ছোট বড় বহু চিকিৎসকের দাওয়াই সে করিয়াছে, কিন্তু কিছুমাত্র ফল হয় নাই। আমার নামডাক শুনিয়া সে অনেক আশায় আমার শরণাপন্ন হইয়াছে—বিজলিকা ইল্‌হাজ করাইবার বাসনা। শেঠজী অনেক 'রূপেয়া' খরচ করিয়াছে এবং এখনও করিতে প্রস্তুত আছেন, যদি তাঁহার রোগটা সারিয়া যায়। দেখলাম, দুগ্ধবতী গাভী বটে, সামান্য একটি টর্চের সাহায্যে ইহাকে বেশ কিছুদিন দোহন করা চলে। কিন্তু কেমন দুর্বুদ্ধি হইল, মামুলী একটা হজমের ঔষধ লিখিয়া দিয়া লোকটাকে বিদায় করিলাম। ফী টা কিন্তু শেঠজী নগদই দিয়া গেল।

তাহার পর আসিলেন ও-পাড়ার হারাণদা।

ওহে ডাক্তার, একটা ব্যবস্থা কর মাইরি। আর তো পারা যায় না। ভয়াবহ হয়ে উঠল ক্রমে।

ব্যাপার কি?

গিন্নী আবার কাল রাত্তিরে একটি কন্যারত্ন প্রসব করেছেন। এই নিয়ে পাঁচটি হল—চারটি ছেলে ছাড়া। একটা উপায় বাতলাও ভাই। তা না হলে তো গেলাম। কণ্ট্রাসেপ্‌শন না কি সব তোমাদের আজকাল আছে, তাই একটা কিছু করতে হচ্ছে এবার।

হাসিয়া বলিলাম, ফুল-প্রুফ কোন কণ্ট্রাসেপশন আছে নাকি? আমার তো জানা নেই।

তার মানে, আমি কি ফুল বলতে চাও?

তা না হলে ত্রিশ টাকা মাইনের উপর নির্ভর করে বিয়ে করে বস!

তা হলে বাংলা দেশে ক'টা বাঙালী ছেলে বিয়ে করার উপযুক্ত আমাকে বল তো?

একটাও নয়।

তা হলে কি বলতে চাও, বাঙালীর বংশ লোপ হোক?

হোক না। ভিখারীর বংশবৃদ্ধি নাই বা হল হারাণদা।

হারাণদা হাসিয়া বলিলেন, তাই বুঝি তুমি নিজে এখনও বিয়ে কর নি? রোজগার তো বেশ করছ, এবার একটা বিয়ে-থা কর। তোমার ছেলেপিলেরা তো আর ভিখারীর বংশধর হবে না।

বুঝিলাম, হারাণদার আত্মাভিমানে আঘাত লাগিয়াছে।

বলিলাম, আমরা সবাই সমান।

হারাণদা বলিলেন, এখনও রক্তের তেজ আছে, বুঝতে পারছ না, কিন্তু কিছুকাল পরে বুঝবে—ছেলেপিলে না থাকলে সংসার মরুভূমি।

পিয়ন চিঠি দিয়া গেল। 'শুভবিবাহ'-মার্কা লাল খাম। কে আবার বিবাহ করিতেছে! খুলিয়া দেখিলাম—জনৈক যাদুগোপাল বসাকের জ্যেষ্ঠ পুত্র পাঁচুগোপাল বসাকের সহিত হারাধন দাসের কন্যা চঞ্চলা দাসীর শুভপরিণয় হইবে। আমি যেন সবান্ধবে—ইত্যাদি।

কে পাঁচুগোপাল বসাক?

খামের ভিতর হইতে আর একটা কাগজ বাহির হইল। হাতে-লেখা চিঠি; তাহাতে লেখা—

ডাক্তারবাবু, আশা করি মনে আছে। আমার যে স্ত্রীকে আপনার কাছে লইয়া গিয়াছিলাম (সেই 'নন্দদুলাল' গান), তিনি আত্মহত্যা করিয়া মারা গিয়াছেন। আবার বিবাহ করিতেছি। আশীর্বাদ করুন, যেন সুখী হই। যদি আসিতে পারেন, অত্যন্ত আনন্দিত হইব।—পাঁচুগোপাল।

সেই সন্তান-লালায়িতা পাগলিনী আত্মহত্যা করিয়াছে!

যাক।—উঠিয়া পড়িলাম।

হারাণদা বলিলেন, উঠলে যে!

আমার হাতে যদি ক্ষমতা থাকত, কি করতাম জানেন?

হারাণদা বলিলেন, কি?

সকলকে গুলি করতাম। তোপের মুখে দাঁড় করিয়ে উড়িয়ে দিতাম।

বলিয়া ভিতরে চলিয়া গেলাম। একবার মনে হইল, উক্ত চঞ্চলা দাসীর পিতা হারাধন দাসকে টেলিগ্রাম করিয়া মানা করি যেন পাঁচুগোপালের সঙ্গে মেয়ের বিবাহ না দেয়। উহার গনোরিয়া আছে। কিন্তু একটু আগে যেমন পুলিসকে খবর দিতে পারি নাই, ইহাও পারিলাম না।

অথচ বিবেক লইয়া বড়াই করি!

৯

ক্যাঁচ করিয়া বাড়ির সামনে মোটরটা থামিল।

একি, এ যে রসুলপুরের জমিদার-বাড়ির মোটর! ড্রাইভার আসিয়া সেলাম করিয়া একখানি পত্র হাতে দিল। খাম ছিঁড়িয়া দেখি—

এবারে অসুখ খুব মর‍্যাল এবং অত্যন্ত আর্জেন্ট। আপনি পত্র-পাঠমাত্র চলিয়া আসুন।—কুঞ্জলাল

চলিলাম। অরণ্যপ্রান্তর পার হইয়া মোটর ছুটিতেছে।

সেখানে গিয়া যাহা শুনিলাম, তাহা সংক্ষেপে এই—আমি আমার ডাক্তারী বিবেক লইয়া যাহা করিতে অসম্মত হইয়াছিলাম, একটা সামান্য দাই টাকার লোভে তাহা করিয়াছে, এবং তাহার ফলে ব্যাপার যাহা দাঁড়াইয়াছে, তাহা অতি সাংঘাতিক।

কুঞ্জলালবাবু বলিলেন, আপনি বাঁচান ডাক্তারবাবু।

ভাবিয়া দেখিলাম, এখন তো আমার ডাক্তারী এটিকেটে বাধিবার কথা নয়। এখন সে রোগী; কারণ যাই হোক। বলিলাম, বেশ, যথাসাধ্য চেষ্টা করছি। এই জিনিসগুলো গাড়ি পাঠিয়ে আনিয়ে নিন।

এক্ষুনি।

গাড়ি ছুটিল।

রাণীজী প্রাণে রক্ষা পাইবেন, যদি আর কোন কম্প্লিকেশন না হয়। আমার সমস্ত বিদ্যাবুদ্ধি ও কৌশল যেন সার্থক হইল। অথচ গোড়ার দিকটাই বা করিলাম না কেন? তাই ভাবিতেছি। সেই অসহায় শিশু তো রক্ষা পাইল না। সমাজ যাহাকে চায় না, তাহাকে বাঁচাইবে কে?

অথচ দাই না করিয়া আমি করিলে জিনিসটা এত অবৈজ্ঞানিক-ভাবে করিতাম না। শিশু 'তো গিয়াছে, জননীও যে যায়-যায়। যাই হোক, এ যাত্রা বোধ হয় বাঁচিয়া গেল। কিন্তু—। যাক, আর ভাবিব না।

সমস্ত রাস্তা কিন্তু ভাবিতে ভাবিতে আসিলাম। কি অসহায় আমরা ডাক্তারেরা! কতকগুলো অসম্পূর্ণ জ্ঞানের বোঝা মাথায় করিয়া রোগীর হাটে তাহা ফেরি করিয়া বেড়াইতেছি। বিবেক বলিয়া যাহা মনে করি, তাহা আর কিছুই নয়, ফাঁকি। একই বিবেক নানা কথা কয়। যাহা যুক্তিযুক্ত, বিবেক তাহা করিতে চাহে না; যাহা অন্যায় বলিয়া মনে হইতেছে, তাহাতে দেখি বিবেকের সায় আছে। বিবেক মানে যুক্তি-মার্জিত বুদ্ধি নয়, বিবেক—সামাজিক বুদ্ধি। এই বিবেক-বলেই লোকে এককালে সতীদাহ করিত, গঙ্গা-সাগরে সন্তান বিসর্জন দিত; আজও সেই বিবেকই কাপালিককে নরবলিতে প্রণোদিত করে, বিধবাকে উপবাসে দেহ শীর্ণ করিতে

পরামর্শ দেয়, অসুখে পড়িলে ঔষধ না খাইয়া মাদুলি লইতে প্রলুব্ধ করে। সেই এক জাতীয় বিবেকই ডাক্তারকে নির্বিচারে একটা পশু করিয়া ফেলিয়াছে। সে ফর্ম মানিয়া চলিয়াছে, যুক্তির ধার ধারে না।

তা ছাড়া আমরা করিতেই বা পারি কি? কতটুকু ক্ষমতা আমাদের? যাহার জন্য প্রাণপণ করিয়া খাটিলাম, ঔষধের পর ঔষধ দিলাম, রক্ত মল মূত্র সমস্ত পরীক্ষা করিলাম, ব্যাধি হয়তো ধরা পড়িল, হয়তো পড়িল না। ধরা পড়িল, কিন্তু তবু সারিল না। ধরা পড়িল না, অথচ সারিয়া গেল।

ইহাতে কি প্রমাণ হয়? আমরা অসহায়, নিতান্ত অসহায়। অথচ রোগী মনে করে, আমরা যেন তাহার প্রাণটা পকেটে করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। আমাদের টাকা, খোশামোদ—নানা প্রকারে স্তুতি করিয়া চলিয়াছে সে।

বাড়ি যখন পৌঁছিলাম, তখন প্রায় রাত্রি নয়টা। আমি নামিবা-মাত্র একটি স্ত্রীলোক আসিয়া প্রণাম করিল।

কে?

নতমুখে সে দাঁড়াইয়া রহিল। বলিল, আমি আসমানি।

কি চান আপনি?

কিছু নয়। এমনই দেখা করতে এসেছিলাম।

বেশ, ভেতরে আসুন।

তাহাকে সঙ্গে লইয়া ভিতরে গেলাম। চিনিতে পারিলাম না।

কে আপনি?

আমাকে চিনতে পারছেন না? এই কিছুদিন আগে আপনার কাছে এসেছিলাম। সেই যে আর একদিন সন্ধ্যেবেলা—। আমার গা-ময় ঘা ছিল। আপনি একটা টাকা দিয়ে আমাকে একটা ওষুধের প্রেসক্রিপশন লিখে দিলেন, সেই ওষুধ খেয়ে আমার সব সেরে গেছে। আরও খেতে হবে কি?

আমি অভিভূত হইয়া গেলাম। নিতান্ত অবহেলাভরে তাহাকে যে প্রেসক্রিপশনটা লিখিয়া দিয়াছিলাম, তাহার এই ফল দেখিয়া আমার নিজেরই মুখে কথা সরিতেছিল না। এত অসামান্য রূপ তাহার ওই কদর্য রোগটার তলায় চাপা পড়িয়াছিল, আশ্চর্য!

বলিলাম, আচ্ছা, আর এক শিশি কিনে খেও। হাতে পয়সা আছে তো? কোথা থাক তুমি?

রংবাজারে। হ্যাঁ, এবার আমি কিনে খেতে পারব।

বুঝিলাম, রূপজীবিনী সে। স্বাস্থ্য ও রূপ যখন সে ফিরিয়া পাইয়াছে, তখন তাহার পয়সার অভাব কি?

সে চলিয়া গেল। আমি বিবেককে ব্যঙ্গ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, এটাও কি ঠিক কাজ হইল? এমন একটা মোহিনী অগ্নিশিখাকে সমাজে ছাড়িয়া দিয়া কি সৎকার্য করিলে! এ তো নিবিয়া গিয়াছিল প্রায়। আমিই তো আবার তাহাকে জ্বালাইয়া তুলিলাম। উচিত হইল কি?

হারাণদা আসিয়াছিলেন।

তিনি বলিলেন, আচ্ছা ডাক্তার, হরিশবাবুর সঙ্গে কি তোমার কোন ঝগড়া হয়েছে নাকি?

বলিলাম, না। কেন বল তো?

তিনি তোমার নামে নানা রকম সব রটিয়ে বেড়াচ্ছেন। তুমি নাকি তাঁর ছেলের অসুখের সময় গলায় পা দিয়ে তোমার প্রাপ্য আদায় করেছ। ফী পাও নি বলে সময়মত নাকি যাও নি! বেঘোরে ছেলেটা তোমার হাতে পড়ে বিনা চিকিৎসায় নাকি মারা গেছে!

তাই নাকি?

হ্যাঁ, সেদিন খগেন ডাক্তারের ওখানে বসে তোমার খুব নিন্দা করছিলেন হরিশবাবু। তুমি নাকি দাম্ভিক—কত রকম সব বলছিলেন।

সামান্য একটু হাসিয়া চুপ করিয়া রহিলাম।

হারাণদা বলিয়াই চলিলেন, তোমার নাকি স্বভাব-চরিত্রও আজকাল খুব খারাপ হয়ে উঠেছে! ভদ্রলোকের বাড়িতে নাকি তোমাকে ডাকা বিপজ্জনক!

কি রকম?

রংবাজারের একটা মাগী নাকি তোমার বাড়িতে সন্ধ্যেবেলা আসে! হরিশবাবু স্বচক্ষে দেখেছেন। তা ছাড়া তুমি নাকি কচি বয়সের একটা ঝি রেখেছ আজকাল! তোমার না চাকর ছিল আগে একটা?

হ্যাঁ, ঝিটা তারই বউ। সে ছুটিতে বাড়ি গেছে। তার স্ত্রী তার হয়ে কাজ করছে। সে নিজেই রেখে গেছে। আমি বাহাল করি নি।

তোমার রান্না করে কে?

ওই ঝি।

বল কি? ওর হাতে খেতে তোমার প্রবৃত্তি হয়?

ওর স্বামীর হাতে খেতে প্রবৃত্তি হচ্ছিল, ওর হাতেই বা হবে না কেন?

হারাণদা একটু চুপ করিয়া গেলেন।

ক্ষণপরে বলিলেন, এটা ঠিক নয়, ডাক্তার। বলা যায় না কিছুই, দুর্বল মানুষের মন তো। বিচলিত হতে কতক্ষণ?

বিচলিত হয় বই কি।

বল কি?

হ্যাঁ, এখন যেমন বিচলিত হয়েছে তোমার নাকে একটা ঘুষি মারবার জন্যে। এ ইচ্ছাকে যেমন দমন করছি, তেমনই সে ইচ্ছাও দমন করি। ভয় পেও না।

হারাণদা বলিলেন, আমার নাকে তোমার ঘুষি মারতে ইচ্ছে করছে? অপরাধ আমার?

কি দরকার ছিল তোমার এই সব সুসংবাদগুলি বহন করে এনে আমার এমন নির্জন অবসরটা মাটি করবার ? কি অপরাধ করেছি তোমার কাছে ? তোমার বাড়িতে বিনা-পয়সায় দেখি এবং তোমার সঙ্গে আত্মীয়ের মত ব্যবহার করি, এই ?

হারাণদা বলিলেন, আহাহা, অত চট কেন ? তোমাকে ভালবাসি, তাই বলছি। না হলে কি দরকার আমার ?

আচ্ছা, এখন উঠি তা হলে।—ভিতরে চলিয়া গেলাম।

নির্জন বাড়ি। এলোমেলো বিছানা। বিছানার উপর একগাদা বই—অগোছালো পড়িয়া আছে। মশারির খানিকটা হাওয়ায় উড়িতেছে। চায়ের বাটিটা পিরিচের উপর কাত হইয়া পড়িয়া আছে—সকালে-খাওয়া চা এখন পর্যন্তও ধোওয়া হয় নাই। ঘরে চাবি দেওয়া ছিল, চাকরানীর দোষ নাই। সামনের দেওয়ালে বিবেকানন্দের ছবির উপর দেখিলাম, একটা টিকটিকি লাঙুল আস্ফালন করিতেছে। মহাত্মা গান্ধীর ছবির উপরে আর একটা। তাহারও লাঙুলে শিহরণ। একটা বই লইয়া ক্যাম্প-চেয়ারটায় শুইয়া পড়িলাম। বইটা খুলিতেই একটা দশ টাকার নোট বাহির হইয়া পড়িল। কবে যেন রাখিয়া ভুলিয়া গিয়াছিলাম। আকাশের দিকে চাহিয়া চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। চাঁদ আর মেঘে লুকোচুরি—পুরাতন ছবি, অথচ চির নূতন।

উতরোল নদীজল কহে থাকি থাকি,
তরী ভাসিল না।
ভাসিতেছি বসে বসে একান্ত একাকী,
ভালবাসিল না।
দীর্ঘ দিবা-বিভাবরী সমস্ত অন্তর ভরি
রয়েছে তবুও তারে বাহিরে সন্ধান করি।
অন্ধকারে ধীরে ধীরে শেফালি পড়িছে ঝরি,
সে তো আসিল না!

ভাবিতেছি বসে বসে একান্ত একাকী,
ভালবাসিল না।
অনিমেষে আকাশের তারাগুলি চায়
নিশীথ-গগনে,
অনামা ফুলের গন্ধ ভেসে আসে হায়,
উতলা পবনে।
মনে হয়, চিত্ত মোর ফুটিয়াছে কদম্বশাখায়,
ছুটিয়াছে মহাশূন্যে বিহঙ্গের উড়ন্ত পাখায়,
বিগলিয়া পড়িতেছে চাঁদিনীতে বিনিদ্র রাকায়
—স্বপনে স্বপনে।
অনিমেষে আকাশের তারাগুলি চায়
নিশীথ-গগনে।

কোথায়? মানুষের কথার এত মূল্য? একবার কথা দিলে তাহার আর নড়চড় হইবার জো নাই? ভালবাসার মূল্য নাই, কথারই মূল্য? আশ্চর্য আমাদের সমাজ!

ডাক্তারবাবু!

কে? ভেতরে আসুন।

একি, এ যে হরিশবাবু!

কি খবর?

একবার আমাদের ওখানে যেতে হবে। আমার স্ত্রীর হঠাৎ পেটে বেদনা উঠেছে একটা, ছটফট করছে।

হারাণদার কথা মনে পড়িল। মনে করিলাম, যাইব না। কিন্তু তৎক্ষণাৎ মনে হইল, হরিশবাবুর স্ত্রী তো কোন দোষ করেন নাই। ব্যাগটা লইয়া বাহির হইয়া পড়িলাম।

হরিশবাবুর ব্যবহারে মনটা ভাল ছিল না।

এমন সময় সকালবেলা ডাকাডাকি করিয়া এক ভদ্রলোক আমার নিদ্রাভঙ্গ করিলেন। বাহিরে আসিয়া দেখি, একজন চেনা উকিল—দাঁড়াইয়া চশমা মুছিতেছেন।

কিছু মনে করবেন না, ঘুমটা ভাঙালাম।

না না, কিছু না। বসুন। কি খবর?

দুঃসংবাদ। ডাক্তারের কাছে যখন এসেছি, তখন বিপদ নিশ্চয়ই কিছু। তবে একটু 'ফেভার' করতে হবে।

বিরক্ত হইলাম।

বলিলাম, ব্যাপারটা কি আগে শুনি?

উকিলবাবু আবার চশমা মুছিতে শুরু করিলেন। ফুলহাটির নন্দ মিত্তিরদের চেনেন তো? তাদেরই ফ্যামিলির। আজকাল বেচারারা বড় গরিব হয়ে পড়েছে। তার ওপর রোগও ধরেছে বিষম। চিকিৎসাও হল অনেক রকম। ডাক্তারি, কবরেজি, হোমিওপ্যাথি, হাকিমি পর্যন্ত। উপস্থিত গঙ্গার ধারে চেঞ্জে আছেন। দেখে ভারি কষ্ট হয়। আপনি তার চিকিৎসার ভারটা নিন।

রূঢ়ভাবে বলিয়া ফেলিলাম, এসব কেসে ফেভার করতে পারব না, মাপ করবেন। আমাকে দিয়ে চিকিৎসা করাতে হলে ফী লাগবে।

বড় গরিব কিন্তু।

বেশ তো, আপনার যখন দয়া হয়েছে, আপনিই তাঁর হয়ে ফী-টা দিয়ে দিন। আপনি তো গরিব নন। দয়া জিনিসটাও খারাপ নয়। কিন্তু আপনার মনে দয়ার সঞ্চার হল, তার জন্যে আমার আর্থিক লোকসান করাটা কি ঠিক?

চশমা মুছিতে মুছিতে উকিলবাবু একটু বিদ্রূপের স্বরে বলিলেন, বেশ তো, ফী আপনার দেওয়া যাবে। কিন্তু ডাক্তারদের কি দয়া-ধর্ম থাকতে নেই? লোকে তো বলে, আপনার দয়া-ধর্ম আছে।

আমি হাসিয়া বলিলাম, আমার স্বকীয় দয়ার দরুন যা আর্থিক

ক্ষতি ও মানসিক অশান্তি, তা তো আমাকে ভোগ করতেই হয়। তাই যথেষ্ট আমার পক্ষে। দুনিয়ার লোকের দয়ার বোঝা যদি আমাকে বইতে হয়, তা হলে তো আমি নাচার। আমি অক্ষম, স্বীকারই করছি।

উকিল-ভদ্রলোক খানিকক্ষণ নীরবে চশমা মুছিতে লাগিলেন। পরে বলিলেন, বেশ, তা হলে যাচ্ছেন কখন ?

বিকেলের দিকে যাব। চারটে পাঁচটা আন্দাজ।

বেশ, তাই ঠিক রইল। যাই তা হলে।—বলিয়া তিনি চলিয়া যাইতে উদ্যত হইলে বলিলাম, বসুন, বসুন। চা-টা খেয়ে যান। অত রাগ করছেন কেন ?

উকিলবাবু আবার বসিলেন।

বলিলাম, দেখুন মশাই, আমার ক্রমশ ধারণা হচ্ছে যে, দয়া-দাক্ষিণ্য করে আমরা কিছুতেই কারও উপকার করতে পারি না, অন্তত এদেশে। ওদেশে কি হয় জানি না। নিন, সিগারেট নিন।

উকিলবাবু বলিলেন, দয়া-দাক্ষিণ্য করে উপকার করতে পারছেন না, মানে ? বুঝলাম না।

তার মানে, আমি যদি বিনা পয়সায় চিকিৎসা করি, তাহলে আমাকে কেউ আর ডাকবে না। কেউ ডাকেও যদি, তাহলেও আমি যা বলব, তা করবে না। আমার প্রেসক্রিপশনের ওপর ভক্তি কমে যাবে।

না না, তা কি কখনও হয় ?

আমি নিজে দেখেছি, তাই বলছি। এই সেদিনই তো আমাদের পাড়ার একটা লোককে দেখে হঠাৎ আমার করুণার সঞ্চার হল। জিজ্ঞাসা করলাম, কি হয়েছে তোর ? সে বললে যে, বিগত তিন মাস যাবৎ সে জ্বরে ভুগছে। পেটে পিলে লিভার আর জল। দীন দরিদ্র অসহায় ভেবে দয়ার সঞ্চার হল। নিজের সময় খরচ

করে তার রক্ত-পেচ্ছাব পরীক্ষা করলাম, দেখলাম, কালাজ্বর। রীতিমত ইনজেকশন না দিলে মরে যাবে। কি করি, গাঁটের পয়সা খরচ করে ওষুধ কিনে তার চিকিৎসা শুরু করলাম। ফল কি হল বলুন দেখি?

আশা করি, সে ভালই হয়েছে।

না। সে দুটো ইনজেকশন নিয়ে সরে পড়েছে। খবর নিয়েছি, সে এখন রামু কবরেজের দাবাই করছে এবং তার মা নিজের খাড়ু বিক্রি করে অর্থ সরবরাহ করছে। What do you say?

সব ক্ষেত্রেই যে লোকে এমন অকৃতজ্ঞ হবে, তা কে বললে আপনাকে?

আহা, আপনি বুঝছেন না। এটা অকৃতজ্ঞতা নয়, এইই মানুষের স্বভাব। যা সুলভ, আমরা তার মূল্য বুঝি না। দুর্লভের দিকে আমাদের স্বাভাবিক টান। আপনারও, আমারও।

অর্থাৎ?

অর্থাৎ আপনি যদি নিজে আজ টাইফয়েডে আক্রান্ত হয়ে আমাকে ডাকেন এবং আমি যদি বিনা পয়সায় আপনার চিকিৎসা শুরু করি, তা হলে বড় জোর তিন-চার দিন আপনি আমার চিকিৎসায় টিকে থাকবেন। যদি আপনি ভদ্রলোক হন, আপনি আমাকে বলবেন, অমুক ডাক্তারকে একবার কনসাল্ট করলে হত না? অমুক ডাক্তারকে আপনি তখন টাকা দিয়ে ডেকে তৃপ্তি পাবেন। আপনার টাকা যদি বেশি থাকে, তাতেও আপনার তৃপ্তি হবে না, যতক্ষণ কলকাতা থেকে কোন হোমরা-চোমরা ডাক্তার এসে আপনাকে শোষণ না করছেন। এই করবেন, যদি আপনি ভদ্রলোক হন। আর যারা অভদ্রলোক—যা আমাদের দেশের অধিকাংশ—তারা তিন দিন জ্বর ছাড়তে না দেখলে চতুর্থ দিন আপনাকে না ডেকে বেশি-ফী-ওলা একজন ডাক্তার ডাকবে, আপনার নিন্দে করবে এবং যেহেতু তাকে টাকা দিয়ে

ডেকেছে, সেইহেতু তার ওষুধ শেষ পর্যন্ত খেয়ে দেখবে। টাইফয়েড অবশ্য যখন সারবার, তখন আপনি সারবে। কিংবা সারবার না হলে সারবে না। বিনা পয়সায় চিকিৎসা করা হয় না। ওটা একটা সস্তায় নাম কেনবার উপায়—আহা, অমুক ডাক্তার দয়ার অবতার। কিন্তু আশ্চর্য, অসুখ একটু শক্ত হলেই লোকে 'অবতার'কে ত্যাগ করে চামারের আশ্রয় গ্রহণ করে। এই মনুষ্য-ধর্ম।

উকিলবাবু তখন বলিলেন, কি জানি মশায়!

জানাজানি কিছু নেই, এই হল ফ্যাক্ট। আপনার এই মিত্তির মশাই, ইনি এত চিকিৎসা যে করিয়েছেন, খুব সম্ভবত কাউকে রীতিমত পয়সা দেন নি। তাই নানা চিকিৎসক চেখে বেড়াচ্ছেন।

হ্যাঁ, তা বটে। সবাই ওঁর ওপর দয়াই করেছেন।

Here you are। সেইজন্যে কারও ওপর বিশ্বাস হয় নি। কারও ওষুধ উনি বোধ হয় ভাল করে খান নি।

আজ বিকেলে তা হলে—

হ্যাঁ, চারটের সময় যাব।

উকিলবাবু বিদায় লইলেন।

উঠিতে যাইব, এমন সময় ব্যাগ-হস্তে এক এজেন্টের প্রবেশ।

নমস্কার। আজ তিন দিন থেকে আপনার সঙ্গে দেখা হচ্ছে না। আমি ওমুক কোম্পানিকে রিপ্রেজেন্ট করছি।—বলিয়া তিনি একখানি কার্ড হাতে দিলেন এবং বলিলেন, এই সব আমাদের লিটারেচার, এই একখানা আপনার জন্যে ডায়েরি, আর এইগুলো সব স্যাম্পল।

ধন্যবাদ।

এই ওষুধটা আপনি ট্রাই করেছেন?—বলিয়া তিনি একটা ঔষধের স্যাম্পল তুলিয়া দেখাইলেন।

না, ওটা এখনও দেই নি কাউকে। নামই মনে থাকে না।

ভদ্রলোক একটু হাসিয়া বলিলেন, ওটা ট্রাই করে দেখুন।

থাইসিসে একেবারে ওয়াণ্ডারফুল। কলকাতায় ডক্টর অমুক, ডক্টর তমুক এ ছাড়া তো আজকাল কিছু লেখেনই না।—বলিয়া তিনি কয়েকজন নামজাদা ডাক্তারের নাম করিলেন এবং বলিলেন, এই দেখুন না, কত টেস্টিমোনিয়াল দিয়েছেন।—বলিয়া একগোছা ছাপানো কাগজ আমার নাসিকাগ্রে ধরিয়া দিলেন। দেখিলাম, নামজাদা কয়েকজন ডাক্তারের সহি-করা প্রশংসাপত্র রহিয়াছে বটে। রাগে সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া গেল।

বলিলাম, দেখুন, ওসব ডাক্তারদের নাম বেশি করবেন না আপনারা আমাদের কাছে। তা হলে আপনাদের ওষুধের প্রতি যা-ও আমাদের একটু শ্রদ্ধা আছে, কমে যাবে। ওসব ডাক্তারদের সম্বন্ধে আমাদের সত্যিকার ধারণা কি জানেন ?

কি ?

ওঁরা হাতুড়ে ডাক্তার—ডাক্তারী খেতাবধারী পেটেণ্ট মেডিসিনের ভেণ্ডার। ওঁরা দেশের দুঃখ বোঝেন না, রোগীর ভালমন্দ বিচার করেন না, যে ওষুধের বিজ্ঞাপন পান, সঙ্গে সঙ্গে তাই লিখে দেন। যাঁর প্রেসক্রিপশন যত দুষ্প্রাপ্য, তিনি তত বড় ডাক্তার। সুতরাং ওঁদের কথার ওপর সত্যিকার ডাক্তার যাঁরা তাঁরা মোটেই বিশ্বাস করেন না। তাঁদের দ্বারস্থ হতে হয় রোগীর খাতিরে, দায়ে পড়ে—স্বেচ্ছায় নয়।

রোগীর খাতিরে কেন ?

কারণ, রোগীর বিশ্বাস, কোন বড় ডাক্তার দেখলেই রোগ সেরে যাবে। দামী ওষুধ না খেলে ব্যারাম দমবে না। রোগীরা বৈজ্ঞানিক নয়, তারা সাধারণ মানুষ। মানুষের স্বভাবই হচ্ছে—যা দুর্লভ, তাই পাবার চেষ্টা করা। আমরা অনর্থক স্বাভাবিক বিশ্বাসকে ক্ষুণ্ণ করব কেন ? রোগ যদি দুঃসাধ্য হয়, রোগীর যদি পয়সা এবং বিশ্বাস থাকে, আমরা তাকে তার বিশ্বাস-অনুসারে চলতে বাধা না দিয়ে তাকে

কোন বড় ডাক্তারের হাতে সঁপে দিয়ে আসি। মরা-বাঁচা! কে কিসে মরে, কে কিসে বাঁচে, জানি না। তবে আপনি যেসব ডাক্তারের নাম করছেন, ওঁদের প্রতি শ্রদ্ধা নেই। ওঁরা ব্যবসাদার, বুদ্ধিমান, ধনবান; কিন্তু বৈজ্ঞানিক নন। দরকারে পড়লে ওঁদের শরণাপন্ন হই, কিন্তু শ্রদ্ধা করতে পারি না।

এজেন্ট ভদ্রলোক একটু যেন অপ্রস্তুত হইয়া গেলেন। তাহার পর বলিলেন, আপনি যা বলছেন, তাই বোধ হয় ঠিক। কি করব বলুন মশাই, আমাদের চাকরি করতে হয় পেটের দায়ে। কোন্ ওষুধ ভাল, কোন্‌টা মন্দ, সে আপনারাই বোঝেন। তবে এটা ঠিক, এই অঞ্চলে যদি এ ওষুধটার সেল না বাড়ে, তা হলে হয় আমাকে আসাম অঞ্চলে বদলি করবে, না হয় দূর করে দেবে।

চকচকে স্যুটের ভিতর হইতে সহসা দীন দরিদ্র বাঙালীমূর্ত্তি আত্মপ্রকাশ করিল।

প্রতিবাদ করিতে পারিলাম না।

উপরন্তু বলিতে হইল, আচ্ছা, চেষ্টা করে দেখব। মুশকিল কি জানেন, এসব ওষুধের কম্পোজিশন প্রভৃতি না জেনে লিখতে কেমন যেন বাধ-বাধ ঠেকে।

কলকাতায় ওঁরা তো বেশ লেখেন।

হ্যাঁ, সে তো জানি। সেজন্যে আমাদের মাঝে মাঝে অপবাদও সহ্য করতে হয় যে, আমরা আপ-টু-ডেট নই। অনেক রোগী এজন্যে হাতছাড়াও হয়ে যায়। আচ্ছা, রেখে যান, লিটারেচারটা পড়ে দেখব।

এজেন্ট বিদায় লইলেন।

আসিলেন হারাণদা, তাঁহার স্ত্রীর জ্বর ছাড়িতেছে না।

হারাণদার সহিত আসিলেন কুমুদবাবু। তিনি হারাণদার প্রতিবেশী, সবজান্তা ভদ্রলোক। তিনি বলিলেন, আচ্ছা ডাক্তারবাবু, কুইনিনটা আর কত দিন দেবেন?

আরও দিন দুই চলুক।

আর কুইনিন দেওয়াটা কি ঠিক? ওটা শুনেছি পয়জন, শরীর গরম করে।

ইচ্ছা করিল, ঠাস করিয়া একটা চড় মারি।

তৎপরিবর্তে হাসিয়া বলিলাম, না, ওতে কিছু হবে না।

তাঁহারা চলিয়া গেলে আসিলেন রামবরণ সিং। ইনি তেজস্বী পুরুষ। রাগিয়া একজনের মাথা ফাটাইয়া দিয়াছিলেন। সেই ফাটা-মাথার আমি চিকিৎসা করিয়াছিলাম। এখন মকদ্দমা বাধিয়াছে। রামবরণ সিং আসিয়াছেন আমার কাছে তদ্বির করিতে। আমি একজন প্রধান সাক্ষী। রামবরণ সিং ক্ষুণ্ণ মনে ফিরিয়া গেলেন।

তৃণখণ্ড ভাসিয়া চলিয়াছি।

বৈকালে ফুলহাটির মিত্রবংশের বংশী মিত্রকে দেখিতে গেলাম। গেটে ঢুকিতে গিয়া দেখি, চার-পাঁচটা ছাগল রহিয়াছে। হঠাৎ চোখে পড়িল, ছাদের ওপরেও অনেক ছাগল, আলিসা হইতে গলা বাড়াইতেছে। কি সর্বনাশ, বারান্দা যে ছাগলে পরিপূর্ণ! ব্যাপার কি? ছাগলের রাজত্ব যে!

বৈঠকখানায় বসিয়া ভিতরে খবর পাঠাইলাম। বৈঠকখানাতেও দেখিলাম, ছাগলের অভাব নাই। স্বচ্ছন্দে তাহারা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এত ছাগল কেন এ বাড়িতে? আমার আগমনবার্তা শুনিয়া উকিলবাবু বাহিরে আসিলেন। উকিলবাবুটি ইঁহাদের নিকট-আত্মীয়। বলিলেন, চলুন ভেতরে।

ভিতরে রোগীর ঘরে দেখি, সেখানেও ছাগল। ইহাদের কি মাথা-খারাপ?

জিজ্ঞাসা না করিয়া পারিলাম না।

এত ছাগল কেন বলুন তো—চতুর্দিকেই দেখছি?

ওঁর বুকের ব্যারাম কিনা! কবিরাজ মশায় বলেছেন, বাড়িতে ও রোগীর ঘরে ছাগল রাখতে।

সর্বনাশ! তাই বলে এত ছাগল!

রোগীকে পরীক্ষা করিলাম।

বৃদ্ধ জরাজীর্ণ ভদ্রলোক। মুখময় পাকা দাড়ি ও গোঁফ, ক্রমাগত কাসিতেছেন। সর্বদা জ্বর ভোগ করিতেছেন। বুঝিতে দেরি হইল না যে, যক্ষ্মাই হইয়াছে। কবিরাজ মহাশয় রোগ ঠিকই ধরিয়াছেন। সে কথা আর রোগীর সম্মুখে উচ্চারণ করিলাম না। ছাগল-প্রসঙ্গ চালাইব মনে করিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, কত দিন থেকে এসব ছাগল পুষছেন? হঠাৎ পাশের ঘর হইতে নারীকণ্ঠে একজন উত্তর দিল, আমি তো বিয়ে হয়ে অবধি দেখছি এই ছাগল। পিছন ফিরিয়া দেখিলাম, পর্দার অন্তরালে কেহ দাঁড়াইয়া আমাদের কথাবার্তা শুনিতেছেন।

বলিলাম, ছাগল রাখা এ ব্যারামের পক্ষে ভালই।

পর্দার অন্তরাল হইতে কোন জবাব আসিল না।

উকিলবাবু বলিলেন, চলুন, আমরা বাইরে গিয়ে বসি। আপনার দেখা হয়ে গেছে তো?

হ্যাঁ, চলুন।

বাহিরে গিয়া দেখি, বৈঠকখানায় যে চেয়ারটায় আমি বসিয়া ছিলাম, তাহার উপর স-দাড়ি এক ছাগল দাঁড়াইয়া আছে।

বলিলাম, ছাগল তো একটা সমস্যা দেখছি এ বাড়িতে!

বলেন কেন? তাড়ান দেখি আপনি একটি ছাগল, বংশীবাবুর মা তা হলে আর কাউকে আস্ত রাখবেন না।

বংশীবাবুর মা বেঁচে আছেন নাকি?

চশমা মুছিতে মুছিতে উকিলবাবু বলিলেন, হ্যাঁ, তা আছেন। মহা মুশকিল! কি রকম বুঝলেন?

বুঝলাম যা, তা বলতে ইচ্ছে করছে না।

অর্থাৎ ?

অর্থাৎ উনি বাঁচবেন না। থাইসিস হয়েছে।

দ্রুততর বেগে চশমা মুছিতে মুছিতে উকিলবাবু বলিলেন, বলেন কি ? থাইসিস তো ভারি ছোঁয়াচে রোগ, না ?

হ্যাঁ, ছোঁয়াচে বইকি।

আপনি থাইসিস বলে ডিক্লেয়ার করছেন ?

আশঙ্কা করছি। কোন জিনিস জোর করে ডিক্লেয়ার করার মত অহঙ্কার আমার নেই। মনে হচ্ছে, খুব সম্ভবত থাইসিসই। স্পিউটামটা পরীক্ষা করে দেখলে অনেকটা বোঝা যাবে।

তাই করুন তা হলে।

কাল তা হলে স্পিউটাম পাঠাবেন আমার কাছে। আর এক কথা। রোগীকে এসব কথা বলবেন না যেন। তা ছাড়া, আমার মনে হয়, কবরেজী চিকিৎসা যেমন চলছে চলুক না। আমাকে আর কেন জড়াচ্ছেন ওর মধ্যে ?

না না, আপনাকে কেসটা হাতে রাখতে হবে। আপনার ওপরই আমাদের ফেথ বেশি। বিনা বাক্যব্যয়ে সকালের সেই নূতন ঔষধটা প্রেসক্রিপ্শনে লিখিয়া দিয়া চলিয়া আসিলাম।

আসিবার সময় উকিলবাবু পুরা ফীই দিলেন।

পরদিন সকালে বংশীবাবুর স্পিউটাম পরীক্ষা করা হইল, যক্ষ্মাই হইয়াছে।

রোজই বৈকালে মৃত্যুপথযাত্রী বংশীবাবুর বাড়ি যাইতে হয়। বাঁচিবে না জানিয়াও যাইতে হয়। লম্বা-চওড়া কথাও বলিতে হয়। থাইসিস শুনিবার পর হইতে উকিলবাবুটি কিন্তু আর এ বাড়িতে পদার্পণ করেন না।

সাবধানী লোক।

প্রায় এক মাস পরে।

সেদিন সন্ধ্যার সময় বংশীবাবুর বাড়িতে গিয়াছি।

বাড়িতে তিনটি প্রাণী। রুগ্ন বংশীবাবু, তাঁহার বৃদ্ধা 'মাতা এবং বংশীবাবুর স্ত্রী। উকিলবাবু আর আসেন না। ঝি-চাকর আছে, তাহারাই কাজকর্ম সব করে।

আমাকে প্রায়ই যাইতে হয়। বংশীবাবুর মাতা আমাকে পুত্র-সম্বোধন করিয়াছেন, এবং বংশীবাবুর স্ত্রীও আমার সামনে বাহির হইতেছেন। অল্প বয়স, বছর কুড়ি-বাইশ হইবে।

বংশীবাবুর স্ত্রীর মত অসামান্যা রূপসী সচরাচর চোখে পড়ে না। সেদিন সন্ধ্যাবেলা গিয়া দেখি, বংশীবাবুর স্ত্রী দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া প্রসাধন করিতেছেন। আমাকে দেখিয়া মাথায় কাপড় দিয়া বেশ সপ্রতিভভাবে বলিলেন, আসুন, বসুন।

বলিলাম, মা কোথায় আপনার ?

তিনি শিবমন্দিরে পূজো দিতে গেছেন।

তা হলে বংশীবাবুকে দেখি গিয়ে, চলুন। কেমন আছেন আজ-কাল ? কাল টেম্পারেচার কত উঠেছিল ?

১০১ পর্যন্ত। আপনি কিন্তু এক্ষুনি পালাতে পারবেন না। মা বলে গেছেন যে, আপনি এলে যেন তাঁর জন্যে অপেক্ষা করেন। আমি চুলটা ওঘরে ততক্ষণ বেঁধে নিই। তারপর ওই সব ছাগল তাড়িয়ে তাড়িয়ে ঘরে ঢোকাতে হবে। এ এক ভাল কাজ হয়েছে আমার।

বধূ চলিয়া গেলেন। আমি বংশীবাবুকে দেখিতে গেলাম। দেখিলাম, ক্রমশই দিন ঘনাইয়া আসিতেছে। বংশীবাবু রোগ-বিষয়ক নানা প্রশ্ন করিয়া চলিয়াছেন।

আর রোগ সারতে কতদিন লাগবে, হার্টটা কেমন ?—ইত্যাকার নানারূপ প্রশ্ন।

দেওয়ালে একটা ঘড়ি টক টক টক করিয়া শব্দ করিতেছে।

আশেপাশে ছাগল ঘুরিতেছে।

বংশীবাবু কাসিতেছেন আর প্রশ্ন করিতেছেন।

আমি বসিয়া মিথ্যা কথা বলিয়া চলিয়াছি।

মিনিট পনেরো পরে চামচিকার মত একটি শিশু কোলে করিয়া বংশীবাবুর স্ত্রী আসিয়া আমাকে উদ্ধার করিলেন। 'বলিলেন, চলুন, ওঘরে আপনি বসবেন। ওরে কানাইয়া, তুই বাবুর কাছে একটু বস।

আমি বিস্মিত হইয়া দেখিতেছিলাম। যাহার স্বামী মর-মর, তাহার প্রসাধনের এই পারিপাট্য! কপালে খয়েরের টিপটি পর্যন্ত পরিতে ভুল হয় নাই। ডুরে শাড়িটি দিব্য কায়দা করিয়া পরিয়াছেন। তা ছাড়া স্বামীর শয্যাপার্শ্বে কানাইয়াকে বসাইয়া তিনি আসিলেন আমার সঙ্গে গল্প করিতে!

বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, তার চেয়ে চলুন না, বংশীবাবুর ঘরে বসেই গল্প করা যাক।'

সর্বনাশ! মা এসে যদি দেখেন যে, আমি ওঁর কাছে বসে আছি, তা হলে কুরুক্ষেত্র কাণ্ড হবে।

তাই নাকি?

হ্যাঁ। যে কবরেজ এই সব ছাগল পুষতে পরামর্শ দিয়েছে, সেই বলে গেছে যে, এসব রোগে স্ত্রীর সাহচর্যও বিষবৎ। মরবার সময় স্বামীর যে একটু সেবা করব, তাও দেবেন না আপনারা? তাঁহার চোখ দুইটা যেন হিংস্র ক্ষোভে দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। তারপর নিজের মনেই বলিয়া ফেলিলেন, আমার আবার স্বামী-সেবা! মাঝে মাঝে ইচ্ছে করে কি জানেন?—গঙ্গায় ঝাঁপ দিই।

কেন?

কেন নয়? আমার কতদিন বিয়ে হয়েছে জানেন? মাত্র চার বছর। আমার বাবা সব জেনেশুনে ওই ঘাটের মড়ার সঙ্গে আমার

বিয়ে দিলেন। সবই অদৃষ্ট। না না, দ্বিতীয় পক্ষ নয়—প্রথম পক্ষই। উনি আজীবন কৌমার্য রক্ষা করবেন ঠিক করে জীবনের পঞ্চাশটা বছর কাটিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর যখন রোগে ধরল, তখন মায়ের অনুরোধে পড়ে বিবাহ করলেন আমাকে—বংশরক্ষার জন্যে। এই দেখুন বংশধর।—বলিয়া সেই চামচিকার মত শিশুটাকে তুলিয়া ধরিলেন। ছেলেটা আচমকা ঘুম ভাঙিয়া চীৎকার জুড়িয়া দিল। আমি কি আর বলিব! চুপ করিয়া রহিলাম। মনে হইল, পিঠের দিকে যেন কিসে একটা ঠেলা দিতেছে। ফিরিয়া দেখি, একটা লোমশ ছাগল।

বংশীবাবুর স্ত্রী বলিলেন, আমার এখন একমাত্র কাজ হয়েছে—ওই দুর্গন্ধ ছাগলগুলো চরানো আর এই বংশধরকে পালন করা।

সদর-দরজায় শব্দ শোনা গেল।

শুদ্ধ পট্টবস্ত্রপরিহিতা বৃদ্ধা নারী পুত্রের কল্যাণে শিবপূজা করিয়া ফিরিতেছেন।

দুই দিন পরে।

বাড়ি ফিরিতেই ভজুয়া এক চিঠি দিল।

আলো জ্বালিয়া দেখি, একি কাণ্ড! এ যে এক প্রেমপত্র। কোন্ এক কমলা তাহার প্রাণেশ্বরকে লিখিতেছে! খামটা উল্টাইয়া দেখিলাম—আমারই তো নাম লেখা। ডাক্তার না লিখিয়া 'শ্রীযুক্ত' লিখিয়াছে।

এ কি রকম হইল? আমার চিঠি তো নয়। কার এ? পত্রখানি আদ্যোপান্ত পড়িলাম। বিশ্রী হাতের লেখা, বানান-ভুলে পরিপূর্ণ, মধ্যে মধ্যে অশ্লীল ইঙ্গিতও আছে, কিন্তু তবু চিঠিখানি পড়িয়া ভারি ভাল লাগিল। কত সরলতা, কত আবেগ, কত আগ্রহ চিঠিখানিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সংসারের কত খুঁটিনাটি সংবাদ, কত তুচ্ছ ঘটনাকে উপলক্ষ্য করিয়া কত উদ্বেগ।

চিঠিখানি দ্বিতীয় বার পাঠ করিতেছি, এমন সময় ভজুয়া আসিয়া

সংবাদ দিল, বাহিরে এক ভদ্রলোক দাঁড়াইয়া আছেন, দেখা করিতে চাহেন।

চিঠিখানি রাখিয়া বাহিরে গেলাম। অচেনা ভদ্রলোক। তিনি বলিলেন যে, পাট খরিদ করিতে তিনি অদ্য এ স্থানে আসিয়াছেন। তাঁহার নামে একটি চিঠি আসিবার কথা ছিল। ডাকঘরে খোঁজ করিয়াছিলেন, পিওন বলিয়াছে যে, আমাদের উভয়ের নাম এক হওয়াতে, ইত্যাদি।

হ্যাঁ, চিঠি আছে আপনার। ভুল করে খুলে ফেলেছিলাম, কিছু মনে করবেন না।

পত্র লইয়া ভদ্রলোক চলিয়া গেলেন, কিন্তু আমার মনে তরঙ্গ তুলিয়া গেলেন। খাওয়া-দাওয়া শেষ করিয়া শুইতে গেলাম। ঘুম আসিল না। সে কি সত্যই কোন দিন আসিবে না? সম্ভাবনা তো নাই। যাহা পাইবার সম্ভাবনা নাই, যাহা অসম্ভব, তাহাই মানুষ চায়, তাহা লইয়াই মানুষ স্বপ্ন-রচনা করে। সেদিন সকালবেলা এই লইয়া কত বক্তৃতাই না করিলাম। সত্যই তো।

কত রাত্রি হইয়াছে জানি না।

জানালা দিয়া লুব্ধক-নক্ষত্র দেখা যাইতেছে। কি উজ্জ্বল!

একবার যদি কলিকাতা যাই, সে কি আমার সঙ্গে দেখা করিবে?

না করিবার কারণ তো নাই।

কবে তুমি দেখা দেবে—থেমে যাবে কথা মোর
নীরব হইয়া বাহু-বন্ধে,
তোমারে পাই না কাছে, তাই তো বাসনা ঘোর
কবিতায় কেঁদে মরে ছন্দে।
শরতে বা বরষায়, প্রভাতে বা সন্ধ্যায়
হৃদয় প্লাবিয়া যায় যে অলকনন্দায়,
তারি কলকল্লোল

ছন্দের তোলে রোল,

—সাগর চুমিতে চাহে চন্দ্রে।

সাগরের মন্ত্র কি শুনেছ কখনো প্রিয়া,

নির্জন সৈকতে একান্ত মন দিয়া ?

দেখেছ কি প্রান্তরে,

পবন অশান্তরে,

উন্মাদ বনানীর গন্ধে ?

নাঃ, লিখিতেও ভাল লাগে না। কথার পর কথা গাঁথা! কথায় কখনও উদ্বেলিত অন্তরের আকুলতা প্রকাশ করা যায়? এ যেন ক্ষুদ্র চামচে সমুদ্রকে ধরিয়া দেখাইবার চেষ্টা। প্রকৃতির মত যদি ভাষা পাইতাম! প্রভাতের সুরঞ্জিত আকাশ বর্ষার ঘনঘোর মেঘে বিদ্যুতের শিহরণ, ঢলঢল পুষ্পের সুবাসিত পেলবতা—কথাহীন, অথচ কি ভাষাময়! কত স্পষ্ট, কত স্বচ্ছ, কত প্রাণময়!

ডাক্তারবাবু।

তাড়াতাড়ি উঠিয়া বাহিরে গেলাম। দেখিলাম, বংশীবাবুর চাকর কানাইয়া।

কি রে?

জলদি চলিয়ে। বাবুকা হালৎ বড়া খারাপ।

বংশীবাবু তো মারা গেলেন। আর এক বিপদ। বংশীবাবুর স্ত্রী সত্যসত্যই গঙ্গায় ঝাঁপ দিয়াছেন।

ধর—ধর—ধর।

পাড়ার দুইজন উৎসাহী ছোকরা লাফাইয়া পড়িয়া তাঁহাকে অজ্ঞান অবস্থায় তুলিয়া ফেলিল। অনেক সেবা-শুশ্রূষার পর তাঁহার জ্ঞান-সঞ্চার হইলে তিনি চক্ষু খুলিয়া আমাকে দেখিতে পাইয়া বলিয়া উঠিলেন, একি! আমি তা হলে মরি নি? কেন আমাকে তুললেন আপনারা? আমার জীবনে কি আছে, যার জন্যে আমি বাঁচব?

দরিদ্র স্বামীর চিকিৎসায় সর্বস্ব গেছে, বাপ-মা বেঁচে নেই ; দিনকতক পরে না খেয়ে আমার ছেলেটা আমার চোখের সামনে মারা যাবে। দগ্ধে দগ্ধে মরবার জন্যে বাঁচালেন আমাকে আপনারা ? কেন তুললেন বলুন, কেন তুললেন ?

বলিবার কিছুই নাই। তাঁহাকে তুলিয়া এবং বাঁচাইয়া সত্যই যেন নিজেকে অপরাধী বলিয়া মনে হইতে লাগিল।

ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া তিনটা বাজিল।

১০

দুই মাস কাটিয়া গিয়াছে।

উল্লেখযোগ্য ঘটনা কিছুই ঘটে নাই। ডাক্তারী জীবনের নিত্য ঘটনার তালিকা আর নাই লিখিলাম। হাতে দুইটা টাইফয়েড-রোগী আছে—নিঃসহায়ের মত তাহাদের চিকিৎসা করিয়া চলিয়াছি। রোগ আপনি বাড়ে, আপনি কমে, আমি মাত্র দুইবার করিয়া তাহাদের বাড়ি গিয়া প্রত্যহ কিছু টাকা লইয়া আসি।

ও-পাড়ার হারাণদার স্ত্রীর যক্ষ্মা হইয়াছে। বেচারীর বাঁচিবার জন্য কি আগ্রহ ! অথচ বাঁচিবে না। তাহাকে রোজ সান্ত্বনা দিয়া আসিতে হয়, ভাল হয়ে যাবেন বইকি।

হারাণদা কণ্ট্রাসেপশন করিতেছেন।

ঘোষাল-পাড়ার কালাজ্বর-রোগীটা বেশ ভাল হইয়া আসিতেছিল। হঠাৎ তাহার পেট-খারাপ হইয়াছে। চিন্তায় আছি।

ম্যালেরিয়া, আমাশয়, বেরিবেরি, ফোড়া, দাদ—মানুষের ব্যাধিরও শেষ নাই, আমাদের অজ্ঞতারও শেষ নাই। অথচ মজ্জমান লোকে তৃণখণ্ড জানিয়াও তাহার দিকে হাত বাড়াইবে, ইহা তাহার মজ্জাগত দুর্বলতা। আমরা সেই হতভাগ্য তৃণখণ্ড। ভাসিয়া চলিয়াছি—ডুবন্ত মানুষ কখন আমাদের দিকে হস্ত প্রসারণ করিবে।

রসুলপুরের রাণীজী ভাল আছেন। তিনি আমাকে 'বাবা' বলিয়া সম্বোধন করেন। আমার প্রতি তাঁহার অসীম শ্রদ্ধা। কুঞ্জলাল আমাকে দেবতা বলিয়া মনে করে। রাণীজীর জমিদারিতে আমার প্র্যাকটিস একচেটিয়া।

ডাক্তারবাবু!

কে? ভেতরে আসুন।

আসিল, রংবাজারের আসমানী। একি! চেহারা এত খারাপ কেন? খুকখুক করিয়া কাসিতেছে। আসিয়া বসিয়া পড়িল।

কি হল তোমার আবার?

আজ মাসখানেক থেকে জ্বরে ভুগছি। কেউ কাছে নেই যে, একটা খবর পাঠিয়ে জানাই আপনাকে। তা ছাড়া রোজ রোজ যে নিয়ে যাব আপনাকে, সে পয়সা কোথায় পাব ডাক্তারবাবু? মরতে মরতে তাই নিজেই এলাম।

আসমানী হাঁপাইতে লাগিল।

তাহার গলা, বুক, নাড়ী যথারীতি পরীক্ষা করিলাম। জ্বর আছে।

রক্ত উঠেছিল মুখ দিয়ে?

হ্যাঁ, আজ চার-পাঁচ দিন থেকে একটু একটু উঠছে কাসির সঙ্গে। কাসতে কাসতে গলাটা চিরে গেছে বোধ হয়।

রাত্রে কি ঘাম হয়?

হ্যাঁ, বিছানা বালিশ একেবারে ভিজে যায়।

বুঝিলাম, করাল রোগে ধরিয়াছে। যক্ষ্মা—আসমানীর জীবন-নাট্যলীলা শেষ হইবার আর বেশি দেরি নাই।

ঔষধ লিখিয়া দিলাম। সে চলিয়া যাইবার পূর্বে জিজ্ঞাসা করিল, আবার কবে আসব?

তোমাকে আর আসতে হবে না। আমি যখন ওদিকে যাব, দেখে আসব তোমায়। ফী দিতে হবে না। কোনখানটায় থাক তুমি?

রংবাজারে সেই যে শিবমন্দিরটা আছে, তার সামনের গলিতে আমার বাসা।—বলিয়া সে প্রণাম করিয়া চলিয়া গেল।

আসিলেন হরিশবাবু। তাঁহার স্ত্রীর 'কলিক' আমার চিকিৎসায় সারিয়াছে। সুতরাং আমি ভাল লোক এবং সেই জন্যই বোধ হয় খগেন ডাক্তারের নিন্দা আমাকে প্রত্যহ শুনিতে হইত, যদি না সেদিন হঠাৎ তাহা থামাইয়া দিতাম।

বলিয়াছিলাম, দেখুন, হরিশবাবু, বসে বসে কারও নিন্দেটিন্দে করবার স্থান এ নয়। আপনাদের ক্লাব রয়েছে, 'বান্ধবসমাজ' রয়েছে কি করতে তা হলে?

হতবুদ্ধি হরিশবাবু বলিলেন, নিন্দে মানে? খগেন ডাক্তারের মত অমন 'কাটথ্রোট' দুটি আছে নাকি? এ তো তার মুখের ওপর বলতে পারি আমি। আমি কারু কিছু ইয়ে করি নাকি।

যাই হোক, ওসব আলোচনা আমার এখানে হয়, এটা আমি পছন্দ করি না।

আচ্ছা, বেশ তো।

সেই হইতে হরিশবাবু ও-কথা আর বলেন না।

হরিশবাবু আসিলেন।

হরিশবাবু পুত্রশোক ভুলিয়াছেন।

আসিয়াই বলিলেন, আচ্ছা ডাক্তারবাবু, 'ওকাসা' জিনিসটা কেমন? কখনও ব্যবহার করেছেন?

না, আমার নিজের কোন অভিজ্ঞতা নেই। আপনি এ বয়সে ওসব উত্তেজক ওষুধ আর নাই ব্যবহার করলেন।

না না, আমার জন্যে নয়। আমার এক ফ্রেণ্ডের জন্যে।

হরিশবাবুর রসনা যাহাই বলুক, তাঁহার মুখচোখ আসল কথা ফাঁস করিয়া দিল। দুর্বল মানুষ! আমিও দুর্বল।

নয়ন মল্লিকের বাড়ি যখন পৌঁছিলাম, তখন ভোর।

নয়ন মল্লিককে মনে আছে, সেই যাঁহার বাড়িতে মহিন্দরের সঙ্গে দেখা হয়? মল্লিক মহাশয়, দেখিলাম, একটি ভাঙা মোড়ার উপর বসিয়া দাঁতন করিতেছেন।

আসুন, আসুন ডাক্তারবাবু। ওরে, একটা মোড়া দে।

বসিয়া প্রশ্ন করিলাম, অসুখ কার?

অসুখ হচ্ছে গিয়ে আমার স্ত্রীর এক গ্রাম-সম্পর্কের দাদা আছেন, তাঁর। তিনি এখানে আসেন প্রায় মাঝে মাঝে। এবার এসে জ্বরে পড়ে গেছেন।

মহিন্দরবাবু কোথা?

কি জানি! সে যে কখন কোন্ চুলোয় থাকে, সেই জানে।—বলিয়া খড়ম চটচট করিতে করিতে মল্লিক মহাশয় ভিতরে গেলেন। মল্লিক মহাশয়ের তিন কুলে কেহ নাই, এক পরিবার ছাড়া। শুনিয়াছি, লক্ষপতি লোক। অথচ ঘর-দ্বার পোশাক-পরিচ্ছদ দেখিয়া তাহা বোঝা শক্ত। মহিন্দরের কথা মনে পড়িল।

মল্লিক মহাশয় ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন, চলুন তবে। শ্যামলালকে দেখেই নিন আগে। তারপরে চা-টা হবে এখন, কি বলেন?

হ্যাঁ, সেই ভাল।

শ্যামলালকে দেখিলাম। সুদর্শন, স্বাস্থ্যবান যুবক। জ্বর একটু হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা বিশেষ কিছু নয়। অর্থাৎ এমন কিছু নয়, যাহার জন্য দূর হইতে পঁচিশ টাকা ফী খরচ করিয়া ডাক্তার আনা প্রয়োজন। সাধারণ ম্যালেরিয়া বলিয়াই বোধ হইল। অথচ ইহার জন্য কৃপণ মল্লিক সহসা কেন এতগুলা টাকা ব্যয় করিতেছেন, বুঝিতে পারিলাম না।

ফিসফিস করিয়া মল্লিক-পত্নী মল্লিককে বলিলেন, তুমি আহ্নিকটা সেরে নাও না। ডাক্তারবাবু শ্যামদাদাকে ততক্ষণ দেখুন।

হ্যাঁ হ্যাঁ, এই যাই। ত্রস্ত মল্লিক আহ্নিক করিতে গেলেন।

ব্যাপারটা ক্রমশ স্পষ্টতর হইতে লাগিল। দেখিলাম, শ্যামদাদার জন্য মল্লিক-পত্নীর উৎকণ্ঠার অবধি নাই। নানারূপ প্রশ্নে তিনি আমাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিলেন। বেদানা কতখানি করিয়া রোজ খাওয়ানো প্রয়োজন, শহর হইতে দামী পেটেণ্ট ঔষধ কি কি আনাইতে হইবে, শরীরটা সারিয়া গেলে ইঁহার পক্ষে বায়ু-পরিবর্তন করিবার উপযোগী স্থান মসুরি, শিলং, না পুরী, এই সব নানা কথা। শেষটা তিনি প্রসঙ্গত বলিলেন, উনি টাকা না দেন, আমি দোব। আপনি যা যা ব্যবস্থা করা দরকার মনে করেন, সমস্ত খোলাখুলি একটা কাগজে লিখে দিয়ে যান। হ্যাঁ, আর শ্যামদাদাকে বলে যান তো আপনি ভাল করে যে, দুধ খাওয়াটা কত উপকারী এই রোগা শরীরে; কিছুতে উনি দুধ খাবেন না।

দুধ খাইতে বলিতে আর আপত্তি কি? বলিলাম।

দেখিলাম, অর্ধনিমীলিত নয়নে, স্মিত মুখে শ্যামলাল নিরানব্বই ডিগ্রী জ্বর লইয়া শুইয়া আছেন, মল্লিক-পত্নী আন্তরিকতার সহিত তাঁহার মাথায় হাওয়া করিয়া চলিয়াছেন। ভ্রাতৃবৎসলা মল্লিক-পত্নী।

আহ্নিক সারিয়া মল্লিক মহাশয় দ্বারপ্রান্তে দেখা দিলেন। চলুন ডাক্তারবাবু, বাইরে গিয়ে বসা যাক।

বাহিরে বসিয়া চা পান করিতেছি। মল্লিক মহাশয়ের বাড়ির চা যে কি বস্তু, তাহা বর্ণনা করা আমার সাধ্যাতীত, চায়ের সহিত তাহার যাহা সাধারণ মিল আছে তাহা এই যে, তাহা গরম।

মল্লিক মহাশয়ও দেখিলাম, প্রাতঃকালীন জলযোগ করিতেছেন—কিছু ছোলাভিজা ও মিছরি। মিছরি খাওয়ার পদ্ধতিটি একটু বিচিত্র। না চিবাইয়া—চাটিয়া চাটিয়া খাইতেছেন।

আমাকে দেখিয়া হাসিয়া বলিলেন, জিবকে ঠকাচ্ছি ডাক্তারবাবু। তাহার পর মল্লিক কাজের কথা পাড়িলেন, কেমন দেখলেন?

ভয়ের কোন কারণ নেই, ভাল হয়ে যাবেন।

আচ্ছা, বেদানাটা কি খুব বেশী খাওয়া ভাল জ্বরের ওপর?

দিতে পারেন। আপত্তি কি?

বৃদ্ধ চুপ করিয়া গেলেন।

আবার বলিলেন, এবারে কিন্তু ফী-টা কিছু মাপ করতে হবে আমায়। দরিদ্র মানুষ আমি। আপনাদের যথাযোগ্য দর্শনী কি দিতে পারি?

বলিলাম, তা হলে আমাদের চলে কি করে বলুন?

আচ্ছা, কিছু কম করে নিন।

এই পৃথিবীতে ভাগ্যিস শ্যামলালদাদারা আছেন, তবু আমরা করিয়া খাইতেছি।

ফী কিছু কমই লইতে হইল। মল্লিক মহাশয় নাছোড়।

১১

আরও পনরো দিন কাটিয়াছে।

দিনের বেলা কাজ ছিল না। ঘুমাইয়া পড়িয়াছিলাম। হঠাৎ এক বিচিত্র স্বপ্ন দেখিলাম। সে যেন আসিয়াছে। বাগানে নির্জন জ্যোৎস্নায় যেন তাহার সহিত মুখামুখি বসিয়া আছি।

সেই কতকাল আগে—তোমার একটা কবিতায় চিঠি পেয়েছিলাম। আর তো চিঠি লেখ না। ভুলে গেলে আমায়?

না, ভুলি নি। তবে—

তবে কি?

ভুলে যাওয়া অসম্ভব নয়।

তুমি এর আগে এমন করে ভালবেসেছ কাউকে?

হ্যাঁ, নার্স ব্রাউনকে।

আর?

অত মনে নেই। তোমাকে পেয়ে সব্বাইকে ভুলে গেছি।

আর কবিতা লেখ না আজকাল ?

বল তো মুখে মুখে বানাই একটা।

বানাও তো।

স্বপ্নের ঘোরে কবিতা রচনা করিতে লাগিলাম। বেশ মনে আছে, সে আমার কাঁধের উপর মাথা রাখিয়া বসিয়া আছে। আমি স্বপ্নাচ্ছন্ন হইয়া বলিয়া চলিয়াছি—

ভুলব কবে কাহার কথা কি ভাবে,
নিজেই আমি জানি না তার খবর ;
কোন্ শিখাটি মন যে কবে নিবাবে,
কখন খোঁড়া হবে যে কার কবর—
কেমন করে বলব বল সখী,
নিজের কাছে নিজেই আমি ঠকি।
তোমার চোখে অশ্রুধারা,—ওকি !
হঠাৎ দেখি বিপদ হল জবর।
কাল কি হবে ভাবছ কেন সেসব ?
আজকে তুমি মনিব, আমি নফর।

সখী, আমার সারা হৃদয় জুড়ে যে
আজকে তুমি পেতেছ এই আসন,
জান সেথায় কত আগুন পুড়েছে ?
কতদিনের কত স্মৃতি-নাশন ?
আগুন কত জ্বলে এবং নেবে,
সেসব কথা লাভ কি বল ভেবে ?
অশ্রু মুছে এক্ষুনি তো দেবে
চুম্বনেতে উচ্ছ্বাসিত ভাষণ।
ইন্সিওরেন্স প্রেমের চলে কি ?
মানবে কি তা প্রিমিয়ামের শাসন ?

প্রথম মনে লাগল যবে আগুন
লকলকিয়ে রক্ত-রাঙা ঝলকে,
ভুলেই গেছি আশ্বিন কি ফাগুন,
হিসাব তার এখন রাখে বল কে ?
হঠাৎ জ্বলে হঠাৎ পুনরায়
দীপ্ত শিখা লুপ্ত হয়ে যায়,
তাহার পানে মন কি ফিরে চায়,
তোমায় দেখে গেলাম ভুলে পলকে ;
ভুলেই গেছি আশ্বিন কি ফাগুন,
হিসাব রাখে এখন তার বল কে ?
পুড়েই যদি যেতাম, হত ভাল কি—
একই প্রেমের আলো এবং ধূমেতে ?
মদির হত তা হলে এই আলো কি,
সুধায় ভরা তোমার মধু-চুমেতে ;
ক্ষণিক তরে সকল ভুলে থাকা,
অধরখানি অধর 'পরে রাখা,
শরমভরে সোহাগটিরে আঁকা,
স্বপন দেখে জড়িয়ে ধরা ঘুমেতে ?
পুড়েই যদি যেতাম হত ভাল কি—
একই প্রেমের জ্বালা এবং ধূমেতে ?
পুষ্পে নানা,—ওগো আমার ললিতে,
একটি পূজা করছি চিরকালই তো—
একই মন্ত্রে একই রকম বলিতে,
প্রতিমাটাই বদল হয় খালি তো।
একটি সুরে বাজল বাঁশী নানা,
সত্যি সখী নাইকো তব জানা ?
একই আগুন ফিরিয়ে দিয়ে হানা
বারে বারেই নানা প্রদীপ জ্বালি তো।
পুষ্পে নানা,—ওগো আমার ললিতে,
একটি পূজা করছি চিরকালই তো।

আজকে সখী, আকাশ-ভরা জ্যোছনা,
হৃদয় মোর চলছে দ্রুত, শোন তো।
কাঁদছ কেন? সত্যি কথা বোঝ না?
বুকের পরে কান পাতিয়া শোন তো।
চকমকিয়ে তুলছে দুটি দুল,
মন্দ বায়ে কাঁপছে দুটি চুল,
বলেছি যা ভুল—সেসব ভুল,
উতল প্রাণ তোমার পায়ে প্রণত।
কাঁদছ কেন? ঠাট্টা তুমি বোঝ না?
বুকের পরে কান পাতিয়া শোন তো।

ডাক্তারবাবু।

ঘুমটা ভাঙিয়া গেল। খক-খক-খক—বাহিরে কে কাসিতেছে। উঠিয়া কপাট খুলিলাম। দেখি, আসমানী দাঁড়াইয়া আছে। হাতে তাহার একটি পুঁটুলি।

একি আসমানী, হঠাৎ?

আপনি দু-তিন দিন যান নি, তাই একবার দেখাতে এলাম।

কেমন আছ? ভেতরে এস।

ভাল নেই, ডাক্তারবাবু। এবার আমার অসুখটা সারছে না কেন বলুন তো?

সেরে যাবে। দু-চার দিন সময় নেবে।

কমছেও না তো, বরং যেন বাড়ছে, কাল সারা রাত্তির আমার ঘুম হয় নি। সারা রাত বসে কেসেছি।

আবার সে খক-খক করিয়া কাসিতে শুরু করিল।

একটু পরে সে আবার সসঙ্কোচে বলিল, কিছু যদি মনে না করেন ডাক্তারবাবু, একটা কথা বলব।

কি কথা, বল।

আমার গয়নাপত্তর যা অল্পস্বল্প আছে, আপনার কাছে এনেছি। আপনি যদি দয়া করে নিয়ে—

তোমার গয়নাপত্তর? আমি নোব কেন?

কতদিন আর বিনা-পয়সায় আপনাকে কষ্ট দোব। সেবার এক শিশি ওষুধ খেয়েই আমার সেরে গেল; এবারে সারছে না কিছুতে। আপনি বরং ভাল করে দেখে একটা ওষুধের ব্যবস্থা করুন।

তাহার মনস্তত্ত্ব বুঝিলাম। সে ভাবিতেছে যে, বুঝি বিনা-পয়সায় দেখি বলিয়া তাহার ভাল চিকিৎসা করিতেছি না। ভিক্ষার চাউল আকাঁড়া তো হইবেই।

তাহাকে বলিলাম, তোমাকে ভাল ওষুধই তো দিচ্ছি। সেবারেও তো তুমি আমাকে কিছু দাও নি। খারাপ ওষুধ দিয়েছিলাম কি?

একটু অপ্রস্তুতের হাসি হাসিয়া আসমানী কহিল, না। আমি তা ভাবি না। পাঁচীর মা বলছিল কিনা যে, বদ্যির কড়ি না দিলে ব্যামো সারে না। তাই আমি—

আচ্ছা, আগে ভাল হয়ে ওঠ, পরে দিও এখন। দেবার সময় ঢের পাবে।

তা হলে একটা ভাল দেখে ওষুধ লিখে দিন, যাতে চট করে সেরে যাই। কতদিন ভুগব!

চোখের কোণে তাহার অশ্রু জমিয়া উঠিল। তাহার সে শ্রী নাই, গালের হাড় দুইটা উঁচু হইয়া উঠিয়াছে, বিবর্ণ রক্তহীন মুখে জীবনের বাতি নিবিয়া আসিতেছে, কোটরগত চক্ষু দুইটিতে অস্বাভাবিক জ্যোতি। বসিয়া কাসিতেছে—খক-খক-খক। তাহাকে বলিলাম, আচ্ছা, এবারে একটা দামী ওষুধ লিখে দিলাম, খাও, ভাল হয়ে যাবে।

অনেক আশ্বাসবাণী দিয়া তাহাকে বাড়ি পাঠাইলাম।

তৃণখণ্ডের আশ্বাস-বাণী।

কতক্ষণ এই ভাবে বসিয়া ছিলাম জানি না। যতই দিন যাইতেছে, ততই নিজের অসারতা নিজের কাছে ধরা পড়িতেছে। ছদ্মবেশ খুলিয়া খসিয়া যাইতেছে।

জ্ঞানের অহঙ্কার! কতটুকু আমাদের জ্ঞান? এ যেন সামান্য শঙ্কিত দীপশিখা জ্বালিয়া বিশ্বব্যাপী অন্ধকারকে আলোকিত করিবার চেষ্টা! অনেকের প্রদীপে আবার শিখাও নাই, শুধুই প্রদীপটা লইয়া ঘুরিতেছে।

বিবেক? প্রচলিত আইনের মত, সমাজের শৃঙ্খলা বজায় রাখিবার শৃঙ্খল— ন্যায়-অন্যায়-সম্পর্ক-বিরহিত। দয়া-মায়া, স্নেহ-মমতার তোয়াক্কা রাখে না। সময় ও সুবিধা-অনুযায়ী নিজের বেশ পরিবর্তন করে।

আমার বাহিরে যাইবার 'সুট', ও আমার বিবেক—প্রায় একই বস্তু। 'সুট' বহিরাবরণ মাত্র—আমার জীবন্ত ত্বকের সহিত তাহার আকাশ-পাতাল তফাত।

হঠাৎ বাহিরে কলরব উঠিল।

কে যেন কাহাকে মারিয়াছে! মহা হৈ-চৈ।

ক্ষণপরে হরিশবাবু কাঁদিতে কাঁদিতে আসিয়া উপস্থিত। মাথা দিয়া রক্ত গড়াইতেছে, কামিজটা ভিজিয়া গিয়াছে।

ব্যাপার কি?

ভজুয়া তাহার মাথায় লাঠি মারিয়াছে।

ভজুয়া? আমার চাকর ভজুয়া? হঠাৎ?

খোঁজ করিয়া যাহা জানিলাম, তাহা এই—

হরিশবাবু নাকি ভজুয়ার স্ত্রীর প্রতি—বাকিটা আর নাই লিখিলাম। ভজুয়া ক্ষেপিয়া উঠিয়াছে, মার ডালেঙ্গে—। অনেক কষ্টে তাহাকে থামাইয়া রাখিয়াছি।

সমাপ্তি কিন্তু এখানেই নয়।

হরিশবাবু আমারই দেওয়া ব্যাণ্ডেজ মাথায় বাঁধিয়া বন্ধুমহলে প্রচার করিয়া বেড়াইতেছেন যে, আমারই প্ররোচনায় ভজুয়া তাঁহাকে মারিতে সাহস করিয়াছে। তা না হইলে ভজুয়ার সাধ্য কি—ইত্যাদি।

লোকটাকে চাবকাইয়া দিব ?

কিন্তু আমি অশিক্ষিত ভজুয়া নই। সে যাহা পারে, আমি তাহা পারি না। সুতরাং বোধ হয় মনে মনে হরিশবাবুকে ক্ষমাই করিলাম, এবং প্রত্যহ তাঁহার ফাটা মাথা জোড়া দিবার চেষ্টায় স্মিত মুখে ড্রেস করিয়া চলিতে লাগিলাম।

কে ?

হরিশবাবুর চাকর—রামধন।

হরিশবাবুর স্ত্রী, আমার জন্য একটু তরকারি পাঠাইয়া দিয়াছেন।

ভদ্রমহিলা সত্যই আমাকে স্নেহ করেন।

অথচ স্বামী-স্ত্রী।

একখানা চিঠি হাতে করিয়া স্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছি।

নয়নবাবুর পত্র—নয়ন মল্লিকের। তিনি লিখিয়াছেন, মহিন্দর জেলে গিয়াছে এবং তৃতীয় পক্ষও পক্ষবিস্তার করিয়া উড়িয়া গিয়াছেন ; শ্যামলাল সহকারী।

নয়নবাবু লিখিতেছেন, সংসারে আর সুখ নাই। মনে বৈরাগ্য আসিয়াছে। আমার নগদ দেড় লক্ষ টাকা এবং বিষয়-সম্পত্তি কোন সৎকার্যে দান করিয়া যাইতে চাই। আমি একটা উইল করিতে চাই যে, আমার পত্নী—যেখানেই থাকুন—আমার সম্পত্তি হইতে ভরণ-পোষণ-খরচা পাইবেন। তাঁহাকে আমি ভালবাসিতাম। একটা ভুল করিয়াছেন সত্য। কিন্তু উদরের দায়ে যেন সে ভুলটাকে

আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে বাধ্য না হন—এই আমার অভিপ্রায়। আমিও তো ভুল করিয়াছিলাম, এই বয়সে একটা কচি মেয়েকে বিবাহ করিয়া। ভুলের কিছু প্রায়শ্চিত্ত করিয়া যাইতে চাই। আমার বাকি টাকা ও সম্পত্তি স্ত্রীশিক্ষা-প্রচারের জন্য খরচ হউক—ইহাই আমার ইচ্ছা। আপনাকে ট্রাস্টী করিতে চাই। আপনার মতামত ও পরামর্শ জানাইবেন।

ভাবিতেছি. মানুষের কতটুকু চিনি আমরা !

আচ্ছা, তাহাকেও কি আমি ঠিক চিনিয়াছি ? সেই কি তাই, যাহা আমি ভাবি ? সে তো আমার এত ভালবাসা অগ্রাহ্য করিয়া অপরের বাগ্‌দত্তা হইয়া বসিয়া আছে। আমাকে একছত্র চিঠিও লেখা দরকার মনে করে না। তবে কি—কিন্তু হায় মানুষের মন ! সমস্ত যুক্তিকে তুচ্ছ করিয়া সে স্বপ্ন দেখিতেছে—

মনে হয় যেন বাতায়নে আছ দাঁড়ায়ে একা,
ঘুমায় সকলে, শয়ন-ঘরের নিবেছে বাতি,
আঁধারের বুকে চাহিছ আমার বারেক দেখা,
আকাশ জুড়িয়া থমথম করে নিশীথ-রাতি।
মেঘের মতন উদাসী হৃদয় ভাসিয়া চলে,
মূর্ত কামনা জ্বলিছে নিবিছে তারার দলে,
সহসা নয়ন ভরিয়া উঠিছে নয়নজলে,
ক্ষণিকের তরে চাহিছ আমার স্বপন-সাথী।
এ কি মিছে কথা ? হয়তো বা তাই—বলো না তবু,
ভেঙো না সে ভুল—ভেঙো না, এ ভুল অনেক দামী,
হোক মিছে কথা, কল্পনা হোক, ভেঙো না কভু,
ভেঙো না; ভেঙো না, ভুলেরই স্বপন দেখিব আমি।
যদি কভু মোরে ধরা নাহি দাও সর্বনাশী,
তোমারি স্মরণে বাজুক আমার বিরহ-বাঁশী,
ছলনা তোমার, চাহনি তোমার, তোমার হাসি
নানা সুরে মোরে আকুল করুক দিবস-যামী।

১৩

ডাক্তারের দিন কাটিতেছে।

রোগী বাঁচে, রোগী মরে, টাকা রোজগার করি। বিতৃষ্ণা জন্মিয়া যায়। আবার যেদিন 'কল' কম থাকে, সেদিনও শান্তি পাই না। এইজন্যই বোধ হয় মানুষ শেষবয়সে ভগবানকে চায়, অর্থাৎ এমন একটা জিনিসকে আকাঙ্ক্ষা করে, যাহা পাওয়া যায় না। সুতরাং মোহ ফুরায় না, শিশুর চাঁদ পাওয়ার মত। আমি মাঝে মাঝে চোখ বুজিয়া চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু যদি কোন ছবি মানসপটে ভাসিয়া উঠে, সে ছবি ভগবানের নয়, তাহার। অবর্ণনীয় সে চাহনি!

জীবনের গোনা দিনগুলি একে একে ফুরাইয়া যাইতেছে। এ জীবনে আর তাহাকে পাইলাম কই? পাই নাই? আমার সমস্ত প্রাণ-মন পরিপূর্ণ করিয়া এই তো সে অহরহ বসিয়া আছে, তবু তাহাকে পাই নাই? তাহাকে বাহিরে চাই, বাহিরে পাইয়া হারাইতে চাই। আশ্চর্য!

সত্যই তো, জীবনের দিনগুলি একে একে চলিয়া যাইতেছে, একদিন মরিয়া যাইব। তাহাকে পরজন্মে পাইব কি? পরজন্ম কি আছে? বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয়, আছে। বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা হয়, এই জীবনের পরপারে আবার আমাদের মিলন হইবে। সেখানে সে কাহারও বাগ্‌দত্তা নয়। সেখানে সে কেবল আমার—আমারই।

ডাক্তারবাবু!

কে? ভেতরে আসুন।

আসিলেন ঝাঁকড়া-ভুরু।

ডাক্তারবাবু, আপনি কি আসমানীর চিকিৎসা করছিলেন?

হ্যাঁ, কেন বলুন তো?

চলুন একবার দয়া করে, তার অবস্থা বড় খারাপ।

আসমানীকে আপনি চিনলেন কি করে?

সে আমার মেয়ে।

আপনার মেয়ে ?

হ্যাঁ, আমারই মেয়ে, বাড়ি থেকে এক ছোঁড়ার সঙ্গে পালিয়ে যায়। সেই থেকে খুঁজছি তাকে। সেইজন্যেই অসুখের মিথ্যে সার্টিফিকেট দিয়ে দিয়ে ছুটি নিচ্ছি। আমার অসুখ-টসুক সব মিছে কথা। আমার আসল অসুখ এই।

ঝরঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন।

কার মুখে শুনেছিলাম, হতভাগী এইখানেই কোথায় লুকিয়ে আছে। তাই খুঁজে বেড়াচ্ছিলাম। আজ তাকে পেয়েছি, কিন্তু এ কি অবস্থায় পেলাম! কি হয়েছে তার? তার মুখে শুনলাম, আপনি তার ওপর অনেক দয়া করেছেন। বলুন না ডাক্তারবাবু, কি হয়েছে তার? বাঁচবে তো?

বলিতে পারিলাম না। কেবল বলিলাম, চলুন, গিয়ে দেখি।

আসমানী মরিয়াছে। সবাই মরিবে। আমিও মরিব—হয়তো কালই। তাহার কথা কেবলই ভাবিতেছি। আসমানীর নয়, তাহার। আশ্চর্য মানুষের মন! এ সময় সে আসিয়া মন জুড়িয়া বসিল। এই তো জীবন, আজ আছে কাল নাই।

আঁধার—আঁধার খালি, চতুর্দিকে গাঢ় অন্ধকার,
তীব্র বেগে বহিতেছে বায়ু,
খুঁজি কারে হাতে লয়ে ক্ষুদ্র দীপ, ত্রস্ত শিখা তার,
অতি অল্প অনিশ্চিত আয়ু।
অচিরাৎ বায়ুবেগে নিবে যাবে ক্ষুদ্র দীপশিখা,
অকস্মাৎ অন্ধকারে চূর্ণ হবে স্বপ্ন-অট্টালিকা,
স্রোত মুখে তৃণখণ্ড। বক্ষে তার প্রেম-মরীচিকা,
দুঃখে সুখে কাঁপে তার স্নায়ু।
আঁধারে পড়িতে চাহে অদৃষ্টের রহস্য-লিপিকা
লয়ে অল্প অনিশ্চিত আয়ু।

কিছুক্ষণ

অগ্রগামী কবি

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

শ্রীচরণেষু—

ভাগলপুর

১৩ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪৪

১

সময়ের স্রোত বহিয়া চলিয়াছে।

সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-তারা, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়, জন্ম-জীবন-মৃত্যু সব চলিয়াছে। কত আশা-নিরাশা, আনন্দ-অবসাদ, স্তুতি-নিন্দা, সুন্দর-কুৎসিত, কালস্রোতের ঘূর্ণাবর্তে লীলায়িত হইয়া উঠিতেছে। অদৃশ্য ভবিষ্যৎকে লক্ষ্য করিয়া—কিংবা হয়তো লক্ষ্য না করিয়াই—নিখিল বিশ্ব ভাসিয়া চলিয়াছে।

আমিও চলিয়াছি।

গরুর গাড়ির গাড়োয়ানটাকে বলিলাম, তুই ট্রেনটা ফেল করাবি দেখছি—একটু হাঁকিয়ে চ। ফলে সে অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি দিয়া মন্থরগতি বলীবর্দযুগলকে উত্তেজিত করিবার চেষ্টা করিল। গতিবেগ সামান্য একটু বাড়িল বটে, কিন্তু তাহা এমন নয় যে, নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

বন্ধুর গ্রাম্য পথ।

যতদূর দৃষ্টি চলে, চাহিয়া আছি। চোখে পড়িতেছে দূরে তালগাছের সারি। ঋজু বলিষ্ঠ দেহ লইয়া আকাশের বুকে নিজেদের বৈশিষ্ট্য আঁকিয়া রাখিয়াছে। তাহাদের আশপাশের ঘনসন্নিবদ্ধ বৃক্ষশ্রেণীকে এতদূর হইতে চেনা যায় না। নগণ্য জনতার মত উহারা দিগন্তরেখাকে আড়াল করিয়া রাখিয়াছে মাত্র। ডান দিকের একটা ঝোপ হইতে একটা শৃগাল হঠাৎ বাহির হইয়া এদিক-ওদিক চাহিতে লাগিল। তাহার পর হঠাৎ আমাদের সাড়া পাইয়া সচকিত হইয়া ছুট দিল। সঙ্গে সঙ্গেই দেখি আর একটা। গাড়োয়ান গরু দুইটিকে আর একবার সম্ভাষণ করিয়া আমাকে বলিল, গতিক ভাল লয়।

কিসের গতিক ?

দু-দুটো গিয়ে শেয়াল ডান দিকেই, লক্ষণ ভাল লয়।

তাই নাকি ?

লয় তো কি, কাগ, শেয়াল আর সাপ—এ তিনটি জানোয়ার ভারি ইয়ে জানবেন আপনি। হনুমানও বটে।

বাজে। কলিকালে ওসব আর ফলে না।

গাড়োয়ান খানিকক্ষণ কিছু বলিল না। বোধ হয় অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিল। হঠাৎ গরুর পিঠে এক ঘা লাঠি বসাইয়া দিয়া সে কহিল, আমার হাতে-হাতে ফল দেখা আছে। শোনা কথা লয় যে, বলব ইয়ে—আরে, ই শালার বয়েলটাও একের লম্বর হারাম-জাদ।—বলিয়া সে বলদটার পৃষ্ঠদেশে সশব্দে আর এক ঘা বসাইয়া দিয়া শুরু করিল।

তাহার কাহিনী এই যে, প্রায় বৎসর-খানেক পূর্বে সে লবাইগঞ্জের হাট হইতে মথুর মাঝির সঙ্গে ফিরিতেছিল। ফিরিবার পথে ঠিক তাহার বাঁ পাশ ঘেঁষিয়া প্রকাণ্ড একটা সাপ চলিয়া যায়। সে সাপ তাহার গণেশকেই লইতে আসিয়াছিল, তাহা সে তখন জানিতে পারে নাই।

জিজ্ঞাসা করিলাম, গণেশ কে ?

আমার ছেলে বাবু। ইয়া দামাল দুরন্ত ছেলে ছিল আমার গণেশ।

তাকে সাপে কামড়ে দিলে নাকি ? সঙ্গে ছিল তোমার ?

সঙ্গে থাকবে কিসের লেগে ? বলছিলাম না আপনাকে, ভারি বিতিকিচ্ছি জানোয়ার ওগুলা! বাড়ি যেতে না যেতেই শুনলাম, গণশার অসুখ—পেট নামছে, বমিও খুব। পহরখানেক রাত হতে না হতেই সব খতম। ওসব কলেরা-মলেরা আমি বুঝি না বাবু, লিয়তি ওকে টানছিল। চ, চ বাবা, আর একটুকুন বাকি—একটু চলে চ—

গাড়োয়ানের কর্কশ স্বর কোমল হইয়া আসিয়াছিল। গরু দুইটি

তাহার শোকের সুযোগ লইয়া যতদূর সম্ভব মন্থর গতিতে চলিতে লাগিল। আমিও খানিকক্ষণের জন্য ভুলিয়া গেলাম যে, এই ট্রেনটা আমার ফেল করা চলিবে না। কাল আমার কলেজ খুলিবে এবং আমার পারসেনটেজ টায়ে-টায়ে আছে। গাড়ির ছইয়ের ভিতর হইতে মুখ বাহির করিয়া সামনে পথের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলাম। দেখিলাম, একজোড়া খঞ্জনপক্ষী পুচ্ছ দোলাইয়া পথের ধারে চরিয়া বেড়াইতেছে।

২

ট্রেন ছাড়ে নাই।

আমার ট্রেন আসেই নাই। শীঘ্র আসিবার সম্ভাবনাও ছিল না। শৃগালদর্শনের ফল হয়তো। পশ্চিমগামী একখানা গাড়ি লাইনচ্যুত হইয়াছে। এ গাড়িখানা না উঠিলে অন্য কোন গাড়ি আসা অসম্ভব। সমস্ত ট্রেনখানার যাত্রীরা সেই ক্ষুদ্র স্টেশনটির প্ল্যাটফর্মে নামিয়া এক বিচিত্র জনতার সৃষ্টি করিয়াছে। আমিও গিয়া তাহাদের দলে যোগ দিলাম। অপরিচিত জনতা।

একটি লোকও আমার চেনা নয়।

নিজের বিছানা ও সুটকেসটি স্টেশনের কোথায় নিরাপদে রাখা যায় চিন্তা করিতেছি, এমন সময় টেলিগ্রাফ-অপারেটরবাবুটি সহাস্য-মুখে আমাকে সম্বোধন করিলেন, এই যে সার, আপনিও জুটে গেছেন দেখছি! এই ট্রেনে যাচ্ছিলেন বুঝি?

যেতে আপনারা দিচ্ছেন কই? আপাতত এ জিনিসগুলো কোথায় রাখি, বলুন দেখি? চারিদিকে যা ভিড়—

এই যে, এখানে রেখে দিন না।—বলিয়া তিনি তাঁহার আপিসের একটা কোণ দেখাইয়া দিলেন।

ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ ছিল।

ছুটির প্রারম্ভে যখন মামার বাড়ি আসিতেছিলাম, তখন গাড়িতে

ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয় হয়। সিগারেট আদান-প্রদান করিতে করিতে আলাপটা ঘনিষ্ঠই হইয়াছিল। মনে পড়িতেছে, সেই স্বল্প আলাপের মধ্যেই জানিতে পারিয়াছিলাম যে, ভদ্রলোকের পরিবারের নাম বিনোদিনী এবং তিনি স্বামীর কাছে আসিয়া থাকিতে উৎসুক; কিন্তু রেল-কোম্পানি এমন কৃপণ যে, কিছুতেই ভাল একটা কোয়ার্টার তাঁহাকে দিতেছে না। ভদ্রলোকের নাম মাখনলাল। বেশ মন-খোলা লোক। প্রায় মাস-খানেক পূর্বে একদা উভয়ে এই স্টেশনে নামিয়াছিলাম। মাখনবাবু আসিয়া কাজে জয়েন করিয়াছিলেন এবং আমি মামার বাড়ি চলিয়া গিয়াছিলাম। এই অপরিচিত জনতার মধ্যে মাখনবাবুকে পাইয়া এবং তাঁহার ভদ্র ব্যবহার দেখিয়া ভাল লাগিল।

নিকটস্থ টুলটিতে উপবেশন করিলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, কি করিয়া ট্রেনটা হঠাৎ এমন ভাবে পড়িয়া গেল?

মুচকি হাসিয়া মাখনবাবু বলিলেন, গাঁজা—অর্থাৎ আমাদের রামদীনের কীর্তি।

রামদীন কে?

পয়েণ্টসম্যান।

পয়েণ্টসম্যান গাঁজা খেয়ে এই কীর্তি করেছে? বলেন কি মশাই?

গলা খাটো করিয়া মাখনবাবু বলিলেন, আসল ফ্যাক্ট হল এই। তবে আমরা রামদীনকে বাঁচাবার চেষ্টা করছি। আপনি যেন কথাটা বলে বেড়াবেন না।

সহসা টেলিগ্রাফের কলটা টকটক করিয়া উঠিল এবং মাখনবাবু আমার দিকে পিছন ফিরিয়া বসিয়া টক্কা-টরে শুরু করিয়া দিলেন। তাহার পর হঠাৎ আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, সমস্ত দিন ভোগান্তি আছে আজ। রিলিফ ট্রেন সন্ধ্যের আগে পাওয়া যাবে না। আবার কল কথা কহিয়া উঠিল, আবার মাখনবাবু সাড়া দিলেন। আমি উঠিয়া বাহিরে আসিলাম।

বাহিরে আসিয়া দেখি, স্টেশন-প্ল্যাটফর্মের কোণে যে জলের কলটা আছে, তাহার সম্মুখে বহু লোকের ভিড়। কয়েকজনের উচ্চ কণ্ঠস্বর শোনা যাইতেছে।

একটি শীর্ণকান্তি লোক তারস্বরে চীৎকার করিতেছেন। রগের শিরগুলা ফুলিয়া উঠিয়াছে।—একশো বার বলব আমি। সেকেন কেলাসের টিকিট আছে বলে কি তোমার বাবুর বেশি তেষ্টা নাকি আমাদের চেয়ে? ইস, ভারি সেকেন কেলাস ফলাতে এসেছে আমার! সর বলছি—

ভৃত্য-স্থানীয় একটি ছোকরা একটি প্রকাণ্ড কুঁজায় জল ভরিতেছিল। সে অবিচলিতকণ্ঠে উত্তর করিল, আমার ভরা হোক আগে। হুড়বড় করো না।

চাকরটির গায়ে ফরসা হাত-কাটা ফতুয়া, কানে একটি অর্ধ-দগ্ধ বিড়ি। বেশ চালাক-চতুর চেহারা।

শীর্ণ ভদ্রলোক বলিলেন, তোমার ওই দিগগজ কুঁজো ভরতে তো সন্ধ্যে হয়ে যাবে। সর, আমার এই ছোট ঘটিটা ভরে নিই আগে।

ভৃত্য কোন জবাব না দিয়া জল ভরিতে লাগিল। শীর্ণকান্তি লোকটি বলিতে লাগিলেন, ওহে, কথার জবাব দাও না কেন হে তুমি? আচ্ছা বেল্লিক ছোকরা তো!

মুখ সামলে কথা বলবেন আপনি।

মুখে এক থাবড়া মারব তোমার। ডেঁপো ছোকরা কোথাকার!

এই ভিড়ের মধ্যে কারু বাপের সাধ্যি আছে, আমার গায়ে হাত দিক দিকি!

বাপ তুলে গালাগালি দেবার জায়গা পাও নি আর? ব্যাটাচ্ছেলে, হারামজাদা—

মুখ সামলে কথা বলবেন আপনি।

একজন দীর্ঘাকার বলিষ্ঠ কাবুলিওয়ালা বৃথা বাক্যব্যয় না করিয়া আগাইয়া গেল এবং এক ঝটকায় ছোকরাকে সরাইয়া দিয়া নিজের

বদনা ভরিতে শুরু করিয়া দিল। সেই কাবুলি-ঝটকার প্রাবল্যে যাহা প্রত্যাশিত, তাহাই ঘটিল। কুঁজা ভাঙিয়া গেল এবং ভৃত্য ভূশায়ী হইল। ঠিক সঙ্গে সঙ্গে ওয়েটিং-রুম হইতে এক আর্ত নারী-কণ্ঠে আকৃষ্ট হইয়া ফিরিয়া দেখিলাম, একটি মহিলা নিতান্ত অসহায়-ভাবে বলিতেছেন, ওমা, কি হবে গো! কাবলেটা ছট্টুকে মেরে ফেললে যে গা!

আইনত এইবার আমার পৌরুষ জাগ্রত হওয়ার কথা। কিন্তু ব্যাপার দেখিয়া আমি ফিক করিয়া হাসিয়া ফেলিলাম। হাসি অবশ্য বেশিক্ষণ টিকিল না, কর্মক্ষেত্রে শেষ পর্যন্ত অবতীর্ণ হইতেই হইল।

ওয়েটিং-রুম হইতে একজন বৃদ্ধগোছের ভদ্রলোক বাহির হইলেন। পুরু লেন্সের চশমা পরা। ভদ্রলোক মহিলাটাকে বলিলেন, তুই ভেতরে যা, আমি দেখছি।

বলিয়া তিনি আগাইয়া আসিলেন। আসিয়া "ছট্টু, এই ছট্টু—" বলিয়া চীৎকার করিয়া উঠিয়া অসহায়ভাবে এদিক-ওদিক চাহিতে লাগিলেন। আমার সহিত চোখাচোখি হইতেই একটু আগাইয়া আসিয়া বলিলেন, বড় মুশকিলে পড়া গেল! বিধবা মেয়েটা কাল থেকে নিরম্বু উপবাসী, অথচ জল জোগাড় করা মুশকিল ব্যাপার দেখছি। ওই কাবলের সঙ্গে যোঝবার সামর্থ্য আমার তো নেই। ওরে ছট্টু—এ ব্যাটা চাকর আচ্ছা বাক্যবাগীশ! আবার কার সঙ্গে বচসা শুরু করেছে!

তখন আমাকে বলিতে হইল, আমাকে একটা কিছু পাত্র দিন তো, চেষ্টা করে দেখি, যদি জল আনতে পারি।

ভদ্রলোক তাড়াতাড়ি আমার হাত দুইটি ধরিয়া বলিলেন, অনেক ধন্যবাদ আপনাকে। দেখুন, যদি পারেন। যা ভিড়!

ফিরিয়া দেখিলাম, কাবুলিওয়ালা বেশ স্বচ্ছন্দে সমস্ত কলটা অধিকার করিয়া মুখ-প্রক্ষালন করিতেছে, এবং অন্তত পঞ্চাশজন প্যাসেঞ্জার বিরক্তি-বিদ্রূপ-হতাশার ভঙ্গীতে তাহাকে ঘিরিয়া নানা

প্রামে চীৎকার করিতেছে। ছট্টুও উঠিয়াছে এবং সেই শীর্ণকান্তি লোকটিকে নিকটে পাইয়া বাচনিক বীররসের অবতারণা করিতেছে।

আমি বৃদ্ধ ভদ্রলোকটিকে বলিলাম, একটা কিছু পাত্র দিন তা হলে।

আসুন।

ভদ্রলোকের পিছু পিছু ওয়েটিং-রুমে ঢুকিয়া অ্যালুমিনিয়মের একটা ঘটি লইয়া কলের দিকে অগ্রসর হইলাম। ভিড় ঠেলিয়া কাবুলিওয়ালার নিকটস্থ হওয়াই মুশকিল। হিন্দু, মুসলমান, মাড়োয়ারী, বাঙালী, বেহারী সকলেই জমাট বাঁধিয়া রহিয়াছে। সকলেরই লক্ষ্য কলটার উপর, কেহই কিন্তু অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। গাড়ু হস্তে এক বেঁটে ভদ্রলোক একটু তফাতে দাঁড়াইয়া ছিলেন। তিনি আমাকে অযাচিতভাবে উপদেশ দিলেন ও ব্যাটার হয়ে যাক আগে, তারপর এগুবেন মশাই। কেন মিছিমিছি সকালবেলায় গো-খাদক ব্যাটার হাতে মার খেয়ে মরবেন?

দেখি।

ভিড়ের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলাম এবং কাহাকেও ঠেলিয়া, কাহারও পা মাড়াইয়া, কাহাকেও অনুনয় করিয়া, কাহারও পাশ কাটাইয়া কাবুলিওয়ালার নিকটস্থ হইলাম। সে তখন তোড়ে কল খুলিয়া দিয়া মাথা ধুইতেছে। আমি কাছে আসিতেই সে আমার ঘটিটার দিকে তাকাইয়া জিজ্ঞাসুভাবে আমার দিকে চাহিল। চাহিবামাত্র আমি তাহাকে ভাঙা-ভাঙা হিন্দীতে বুঝাইয়া বলিলাম যে, একটি জেনানী অত্যন্ত পিপাসার্ত, তাহার জন্য জল অবিলম্বে প্রয়োজন, সুতরাং কলটা একবার ছাড়িয়া দেওয়া দরকার।

জরুর।

কাবুলিওয়ালা তৎক্ষণাৎ কল ছাড়িয়া দিল। এত অল্প আয়াসে ব্যাপারটা মিটিয়া গেল দেখিয়া বিস্মিত হইলাম। কাবুলিওয়ালার প্রতি রাগের ভাবটা কমিয়া আসিল। ঘটি অর্ধেক ভরা হইয়াছে,

এমন সময় কাছায় টান পড়িল। ফিরিয়া দেখিলাম, সেই বেঁটে ভদ্রলোকটি একমুখ হাসিয়া আমাকে বলিতেছেন, এই ফাঁকে আমার গাড়ুটাও ভরে দিন না মশাই, আপনাকে যখন ভরতে দিয়েছে। পুলিশে কাজ করেন বুঝি আপনি? হেঁ-হেঁ, তাই—

আমি কোন উত্তর দিলাম না। আমার ঘটি পরিপূর্ণ হইলে সরিয়া দাঁড়াইয়া ভদ্রলোককে বলিলাম, এইবার নিন না। কিন্তু কাবুলিওয়ালা সে সুযোগ তাঁহাকে দিল না। আমি সরিয়া যাইতেই সে আসিয়া কল দখল করিল, এবং বাকি সকলে নিষ্ফল কোলাহল করিতে লাগিল।

ভিড় ঠেলিয়া জলের ঘটিটা লইয়া সন্তর্পণে ওয়েটিং-রুমের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম। বৃদ্ধ দ্বারেই দাঁড়াইয়া ছিলেন। তাঁহার বিধবা কন্যাও দেখিলাম পিছনে দাঁড়াইয়া আছেন। আশা করিতে-ছিলাম, তিনি আমার এই অসাধ্যসাধনে পুলকিত হইয়া আমায় ধন্য-বাদ দেবেন, এবং ওই পিপাসিতা বিধবাটি সকৃতজ্ঞ দৃষ্টির দ্বারাও আমাকে অন্তত পুরস্কৃত করিবেন।

কিন্তু কিছুই হইল না।

বিধবাটি বলিলেন, ও জল আমি খাব কি করে?

ভদ্রলোক বলিয়া উঠিলেন, কেন?

তারপর হঠাৎ আমার পায়ের দিকে চাহিয়া হতাশভাবে বলিয়া ফেলিলেন, এঃ, সব মাটি হল!

মেয়েটি বলিলেন, তুমি ওঁকে বলে দিলে না কেন বাবা, ওঁর কি অত খেয়াল আছে?

আরে বাঃ! হিন্দু বিধবার জন্যে জুতো পায়ে দিয়ে জল আনে নাকি কেউ?

অপরাধী পাদুকাযুগলের প্রতি চাহিয়া আমি একটু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িলাম।

বৃদ্ধ আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, আরে বাঃ, তাতে কি হয়েছে?

জলটা অন্য কাজে লাগবে। ভিড়টা কমুক একটু, জল পাওয়া যাবে এখুনি।

কি করিব ভাবিতেছি, এমন সময় সোরগোল করিতে করিতে টেলিগ্রাফ-মাস্টার মাখনলাল আসিয়া হাজির।

আরে মশাই, আপনাকে খুঁজে খুঁজে আমি হয়রান। হঠাৎ কোথায় ডুব মারলেন? ও কি হাতে জলের ঘটি কেন?

বলিলাম।

মাখনবাবু হাসিয়া বলিলেন, আচ্ছা, তার জন্যে ভাবনা কি? আপনার মেয়ের জন্যে জল-টল সব আমি বাসা থেকে পাঠিয়ে দিচ্ছি। ও কলের আশা ছেড়ে দিন।

তাহার পর আমার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, আসুন আপনি, চা জুড়িয়ে যাচ্ছে।

জলের ঘটিটা নামাইয়া দিয়া মাখনলালের অনুবর্তী হইলাম। যাইতে যাইতে মাখন আমাকে কনুই দিয়া এক খোঁচা মারিয়া ভ্রূ নাচাইয়া বলিলেন, কেল্লা মার দিয়া, বুঝলেন? কোয়ার্টার পেয়ে গেছি। ওয়াইফকে এনে ফেলেছি। খান না এখন কত চা খাবেন আপনি। —বলিয়া ভদ্রলোক হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। পর-মুহূর্তেই আবার গম্ভীর হইয়া চিন্তিতস্বরে শুরু করিলেন, ট্রেনখানা ডিরেলড হয়ে বড় যাচ্ছেতাই কাণ্ড হয়ে গেল। রামদীনটাকে এনি হাউ বাঁচাতে হবে। আমাদের মাস্টার মশাইও উঠে পড়ে লেগেছেন। দেখা যাক, কতদূর কি করা যায়। ব্যাটা গাঁজা খেয়েই মরেছে কিনা, তা না হলে লোক ভাল। ও-ই তো নিজের কোয়ার্টারটা আমায় ছেড়ে দিয়েছে। তা না হলে বিনুকে আমি আনতে পারতাম নাকি? ব্যাটা গ্রেট সোল। বললে আমাকে, হুজুর, বহুমায়িকো লিয়ে আনেন—আমি টিশনে শুতব। হামার তো জরু-টরু কোই নেই আছে। ব্যাটা আবার বাংলা বলে। সত্যি, ব্যাটার তিন কুলে কেউ নেই। লোক ভাল। মাটি করেছে ব্যাটাকে গাঁজাতে।

আমি বলিলাম, ছোটবাবুর কোয়ার্টার নেই, অথচ পয়েন্টস-ম্যানের কোয়ার্টার আছে, এ কি রকম ব্যবস্থা ?

কোয়ার্টার থাকবে না কেন ? ওই যে দেখুন না, রিপেয়ার হচ্ছে—টিমে তেতালা চালে।—বলিয়া তিনি দূরে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইলেন।

মাখনবাবুর সহিত কথা কহিতে কহিতে চলিতেছিলাম এবং লক্ষ্য করিতেছিলাম, কত বিভিন্ন জাতীয় যাত্রী এই ছোট স্টেশনটিতে আটকাইয়া পড়িয়াছে।

একটা মেলা বসিয়া গিয়াছে যেন।

ট্রেন লাইনচ্যুত হইয়াছে প্রায় ঘণ্টা দুই হইল। এই দুর্ঘটনার আকস্মিকতা প্রথমে সকলের মনকে নিশ্চয়ই যথেষ্ট নাড়া দিয়াছিল, এখন দুই ঘণ্টা পরে সে ভাবটা আর নাই। এই দুর্ভাগ্যটাকে মানিয়া লইয়া এখন সকলে খানিকক্ষণের জন্য থিতাইয়া বসিয়াছে। ছোট বড় নানা দলে বিভক্ত হইয়া সকলে নিজ নিজ সুবিধা অন্বেষণে তৎপর হইয়াছে।

আরশোলা-রঙের আজানুলম্বিত গলাবন্ধ কোট গায়ে একটি মাড়োয়ারী সপরিবারে এক স্থানে বসিয়া আছেন, দেখিলাম। হলুদ-রঙের পাগড়ি বহু পাকে পাকানো। মুখে ভীত-বিনীত-চতুর ভাব। চক্ষু চারিদিকে ঘুরিতেছে। গোঁফজোড়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে। কাছেই দুই-তিনজন ঘোমটা-দেওয়া মহিলাও বসিয়া আছেন। হাতে ও পায়ে মোটা মোটা গোল গোল গহনা পরা, পরনে লাল ও হলুদ রঙের ছাপা সস্তা জরির-পাড়-বসানো কাপড়, অঙ্গে প্রায় তদনুরূপ ওড়না। যদিও ঘোমটা দেওয়া, কিন্তু অনর্গল কিড়ির-মিড়ির করিয়া বকিয়া চলিয়াছেন। আমাদের নিকটবর্তী হইতে দেখিয়া মাড়োয়ারী ভদ্রলোক সসম্ভ্রমে দাঁড়াইয়া উঠিয়া সেলাম করিলেন এবং মাখন-বাবুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ট্রেন ঠিক হইতে কত বিলম্ব হইতে পারে ?

মাখনবাবু বলিলেন, খবর তো দিয়েছি আমরা। এখন প্রভুরা দয়া করবেন, তবে না সব ঠিক হবে।—বলিয়া মাখনবাবু হাসিয়া আমার দিকে চাহিলেন। আর একটু অগ্রসর হইয়া দেখিলাম একদল মুসলমান গোল হইয়া বসিয়া আহারে প্রবৃত্ত হইয়াছে। তাহাদের সঙ্গে পাঁচ-ছয় বছরের একটি মেয়েকে দেখিয়া বেশ লাগিল। ফুট-ফুটে সুন্দর মুখখানি, ডাগর চোখ দুইটিতে সুর্মা লাগানো—মাথায় লম্বা বেণী, পরনে কমলা-রঙের ঢিলা পায়জামা, গায়ে ঘন-নীল রঙের আঙরাখা। সর্বদাই ছটফট করিতেছে। আমাকে দেখিয়া অকারণে মুখ-বিকৃতি করিয়া জিভটা বাহির করিয়া মুখ অন্য দিকে ফিরাইয়া লইল।

একটি কুচকুচে কালো ভারতীয় ক্রিশ্চান সাহেব তাঁহার সুসজ্জিতা মেমসাহেব সহ একটু দূরে তফাতে দাঁড়াইয়া ছিলেন। মেমসাহেবটির বর্ণও মর্মান্তিক। তাঁহাদের ভাবগতিক দেখিয়া মনে হইল, যেন তাঁহারা স্পর্শদোষ বাঁচাইয়া এই দূষিত জনতার মধ্যে কোনক্রমে দয়া করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন। সাহেবটির হাতে একটি অর্ধদগ্ধ বর্মা-চুরট, মেম-সাহেবের হাতে একটি ভ্যানিটি-ব্যাগ। মেমসাহেব মুখে প্রচুর পাউডার মাখিয়াছিলেন। এই দারুণ গ্রীষ্মকালে ঘর্মাক্ত কালো মুখে পাউডারের প্রাচুর্য দেখিয়া একটা উপমা হঠাৎ মনে উদয় হয়, যেন মাগুরমাছকে কুটিবার পূর্বে ছাই মাখানো হইয়াছে।

সাহেব একটু আগাইয়া আসিয়া মাখনবাবুকে প্রশ্ন করিলেন, I say, how long are we to wait in this hell of a station ?

নির্বিকারচিত্তে মাখনবাবু বলিলেন, can't say.

সাহেব একটু রাগতস্বরে উত্তর দিলেন, If I cannot reach my place to-day, I shall sue the Railway Company.

মাখনবাবু এ কথার কোন উত্তর দিলেন না। খানিক দূর আগাইয়া গিয়া কেবল নিম্নস্বরে বলিলেন, ব্যাটাচ্ছেলে! এবং আমার দিকে চাহিয়া একটু হাসিলেন।

আরও একটু অগ্রসর হইয়া দেখা গেল, কয়েকটি যুবক এক জায়গায় জমায়েত হইয়া হাস্য-পরিহাসে বেশ মশগুল হইয়া উঠিয়াছে। যুবকগুলির চেহারা বেশবাস কথাবার্তা বৈচিত্র্যময়। কাহারও পরিধানে ঢিলা পায়জামা, কেহ কাপড়টাকে কায়দা করিয়া পায়জামার মত করিয়া পরিয়াছে, জুলফি গোঁফ ও দাড়িতেও অতি-আধুনিকতার উগ্রতা। এসবের কোন অভাব নাই, অভাব দেখিলাম ভব্যতার। একটি ট্যারা-গোছের ছোকরা কোমরে হাত দিয়া দুলিয়া দুলিয়া হো-হো করিয়া হাসিতেছিল।

ইহাদের এত আনন্দের উৎস কি, তাহাও পরক্ষণেই আবিষ্কার করিলাম। নিকটেই দেখিলাম, একটি কমবয়সী মেয়ে একেবারে একাকিনী একটি সুটকেসের উপর বসিয়া আছে। কাছাকাছি তাহার কোন আত্মীয়স্বজন আছে বলিয়া মনে হইল না। মেয়েটি গম্ভীরভাবে দূরে মাঠের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছে। তাহার পাশেই, খুব সম্ভবত তাহাকে কেন্দ্র করিয়াই, যেসব চটুল আলোচনা চলিতেছিল, তাহা যে তাহার কানে যাইতেছে মুখ দেখিয়া তাহা বোঝা গেল না। তথাপি আমার মনে হইল, মেয়েটির চোখে যেন একটা বিরক্ত বিপন্ন ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে। একবার মনে হইল, তাহাকে জিজ্ঞাসা করি যে, তাহার কোন সাহায্য আমি করিতে পারি কি না : কিন্তু সঙ্কোচ হইল, পারিলাম না।

একটু দূরে দুম-দুম করিয়া কয়েকটা বন্দুকের আওয়াজ শোনা গেল।

জিজ্ঞাসা করিলাম, বন্দুকের শব্দ কেন মাখনবাবু?

মাখনবাবু বলিলেন, গোটা দুই সাহেব ছিল মশাই ফার্স্টক্লাসে। তারা ট্রেন ছাড়বার কোন উপক্রম না দেখে বন্দুক ঘাড়ে করে বেরিয়ে পড়ল। আস্পর্ধা দেখুন না মশাই, যাবার সময় মাস্টার মশাইকে বলে গেল যে, তারা না আসা পর্যন্ত যেন ট্রেন ছাড়া না হয়। তারা কাছাকাছিই থাকবে, ট্রেন ঠিক হলে তাদের যেন খবর পাঠানো হয়।

লবাবপুত্তুর সব। মাস্টার মশাইকে আমি চোখ টিপছিলুম, যেন তিনি ওসব কথা গ্রাহ্য না করেন। কিন্তু মাস্টার মশাই আমাদের সাহেব দেখলেই একেবারে গলে যান। সেলাম করে হাত কচলে বলে দিলেন, ইয়েস সার—ইয়েস সার। যত সব—

মাখনবাবুর কোয়ার্টারের সম্মুখীন হইয়াছিলাম। মাখনবাবু বাহির হইতেই চীৎকার করিলেন, কই বিনু, চা রেডি তো? আমার সেই বন্ধুটিকে ধরে এনেছি। চা দাও।

বিনু ওরফে বিনোদিনীর কোন সাড়া পাওয়া গেল না। মাখনবাবু তখন আমাকে দাঁড়াইতে বলিয়া ভিতরে গেলেন। মাখনবাবুর কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম, সে কি! চায়ের জল এখনও চড়াওনি?

আমার তো পাঁচটা হাত নয়। বাসন মেজে, ঘর ধুয়ে এই তো সবে কাপড়টি ছেড়েছি। বন্ধু আবার কে?

শুনিয়া একটু অস্বস্তি বোধ করিতে লাগিলাম। মাখনবাবু বাহিরে আসিয়া সহাস্যমুখে আমাকে বলিলেন, আসুন আসুন, ভেতরে আসুন—আগেকার চা-টা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, বিনু সেটা আর দিতে চায় না। ফ্রেশ জল চড়াচ্ছে। আসুন।

গেলাম।

ভিতরে একটি মাত্র ঘর।

সেইটিই বসিবার ও শুইবার ঘর বলিয়া মনে হইল। আরও দুই-একটি ছোটখাটো ঘর আছে। সেগুলি বোধ হয় রান্না-ভাঁড়ারের কাজে নিয়োজিত। সঙ্কীর্ণ উঠানে একটা ধূমায়িত কয়লার উনানের সামনে বসিয়া বিনু প্রাণপণে হাওয়া করিয়া চলিয়াছেন। পরণে একখানি আধময়লা শাড়ি। হাতে কয়েকগাছি সবুজ রঙের কাচের চুড়ি ঝুনঝুন করিয়া বাজিতেছে।

চতুর্দিক ধূমাচ্ছন্ন।

মাখনবাবুর জবরদস্ত আতিথেয়তা যে এই বধূটিকে বিব্রত

করিতেছে, তাহা মনে মনে বুঝিতেছিলাম। কিন্তু কি করিয়া ভদ্রভাবে উদ্ধার পাই, কিছুতেই মাথায় আসিতেছিল না।

মাখনবাবু খুব আন্তরিকতার সহিত বলিলেন, আসুন, আসুন। যা আমাদের ঘর-দোর! পায়রার খোপ বললেও চলে। এঃ, বড্ড ধোঁয়া হল যে!—বলিয়া তিনি কপাটটা বন্ধ করিয়া দিলেন। কপাটটা বন্ধ করিয়া দেওয়াতে আমার যেন দম বন্ধ হইবার উপক্রম হইল। আমি বলিলাম, কপাটটা খুলে দিন।

আরও ধোঁয়া ঢুকবে যে মশাই। এ ধোঁয়া এখুনি বেরিয়ে যাবে—দাঁড়ান না, জানলাটা খুলে দিই বেশ করে। ঘরটার এই একটা সুবিধে আছে, দক্ষিণ দিকটা বেশ খোলা।—বলিয়া তিনি জানালাটা খুলিয়া দিলেন। তাহার পর বলিলেন, একটু কি অসুবিধে জানেন—জানলাটা খুলে দিলে একটু বে-আবরু হয়ে পড়ে। দাঁড়ান, দেখি, চায়ের জলটা কতদূর!—বলিয়া তিনি আবার কপাটটা খুলিয়া বাহিরে গেলেন। এই ধূমাচ্ছন্ন ঘরটা হইতে মুক্তি পাইলে যেন বাঁচি। অথচ মাখনবাবুর মনে কষ্ট দিতেও সঙ্কোচ হইতেছে। মাখনবাবু বাহিরে তাঁহার স্ত্রীকে নিম্নস্বরে কি সব বলিতেছেন, শুনিতে পাইলাম না। মাখনবাবু ঘরে ঢুকিতেই একটা বুদ্ধি মাথায় খেলিয়া গেল।

ওয়েটিং-রূমে সেই বিধবাটিকে জল দিয়ে আসতে হবে—ভুলে গেলেন বুঝি? বাঃ! দিন একটু জল, দিয়ে আসি।

হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক তো। তা আপনি যাবেন কেন? আপনি বসুন না। আমি গিয়ে দিয়ে আসছি।

না না, আমিই দিয়ে আসি। জুতো পায়ে দিয়ে গেলে হবে না আবার।

মাখনবাবু হাসিয়া বলিলেন, কেন, আমি খালি পায়ে যেতে পারি না নাকি? চিরটা কাল খালি পায়েই কেটেছে মশাই, ম্যাট্রিক ক্লাসে ওঠবার পর তবে জুতো পায়ে দিয়েছি।

আমি বলিলাম, না, শুধু জুতোর কথা নয়, আপনার হাতে যদি

খাবার না খান। আপনি তো ব্রাহ্মণ নন। বিধবাটি একটু বেশি নিষ্ঠাবতী বলে মনে হল।

মাখনবাবু পরাস্ত হইয়া বলিলেন, তা হলে তো নাচার মশাই। আচ্ছা, আপনিই যান তা হলে—চট করে যান, বেশি দেরি করবেন না যেন সেখানে। চা হয়ে গেল বলে। বিনু, হাউ ফার?—বলিয়া মাখনবাবু বাহিরে গেলেন এবং বলিলেন, আগে এক ঘটি জল দাও তো। ঘটিটা মাজা আছে তো?

বিনু উত্তর দিলেন, ঘটি আবার মাজলাম কখন?

কখন মেজেছ, তা জিজ্ঞেস করি নি। মাজা আছে কি না?

কাল মেজেছিলাম সকালে।

আচ্ছা, ওতেই হবে। এক ঘটি জল দাও। ঘরে খাবার-টাবার কিছু আছে? স্রেফ ছোলা-গুড়? বেশি নেই? আরে, যা আছে তাই দাও না—তুমি বেশি কথা বাড়িও না।

এক ঘটি জল ও একটি পাথর-বাটিতে কিছু ছোলা-ভিজানো ও গুড় লইয়া নগ্নপদে ওয়েটিং-রুম অভিমুখে রওনা হইয়া গেলাম। কোথাকার কে অচেনা বিধবা, তাহার জন্য জল বহিয়া লইয়া যাইতেছি! পারিপার্শ্বিক ঘটনার এমন সমাবেশ হইয়াছে যে, কিছুই অসঙ্গত মনে হইতেছে না। বরং না করিলেই যেন অশোভন হইত।

স্টেশন-প্ল্যাটফর্মে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, সেই কমবয়সী মেয়েটি সুটকেসের উপর তেমনই ভাবে বসিয়া আছে এবং তাহার নিকটে নানা ছাঁদের সেই যুবকগুচ্ছ তেমনই হাসাহাসি করিতেছে।

৩

নিষ্ঠাবতী বিধবাকে তৃষ্ণার জল দান করিয়া পুণ্য সঞ্চয় করা আমার ভাগ্যে ছিল না। গিয়া দেখিলাম, তিনি একাদশীর পারণ শেষ করিয়াছেন। ভৃত্য ছট্টু খবরটি দিল। বৃদ্ধ ভদ্রলোক দেখিলাম ওয়েটিং-রুমের এক কোণে বসিয়া আহ্নিক করিতেছেন। ভদ্রলোকের

ধপধপে সাদা গায়ের রঙ। নগ্নগাত্রে শুভ্র উপবীত শোভা পাইতেছে। দৃশ্যটা বেশ ভাল লাগিল। বিধবাটিকে উদ্দেশ করিয়া অনুচ্চকণ্ঠে কহিলাম, এগুলো তা হলে ফিরে রেখে আসি ?

ভদ্রমহিলা কোন উত্তর না দিয়া মাথার ঘোমটাটা একটু টানিয়া সরিয়া বসিলেন। আমার সহিত বাক্যালাপ করিতে অনিচ্ছুক বুঝিলাম। ফিরিবার উপক্রম করিতেছি, এমন সময় ভৃত্য ছট্টু আসিয়া বলিল যে, বাবুর পূজা এখনই হইয়া যাইবে, মাইজী আপনাকে একটু অপেক্ষা করিতে বলিতেছেন।

অপেক্ষা করিয়া রহিলাম।

মানুষ চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে পারে না।

বসিয়া বসিয়া বিধবাটিকেই লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। অল্প বয়স। কুড়ির বেশি বলিয়া মনে হয় না। ইহারই মধ্যে জীবনের আনন্দ-দীপটি নিবিয়া গিয়াছে। থান-কাপড়, আভরণহীন অঙ্গ, মুখখানি বিষাদ-মাখানো। আজিও আমাদের সমাজে অসহায়া বিধবার সংখ্যা অগণিত। দ্বিতীয়বার বিবাহ করাটা আজও আমাদের হিন্দু বিধবাদের সংস্কারে বাধে। এখনও তাঁহারা ইহাকে পাপ বলিয়াই মনে করেন। আমার নিজেরও বিধবা বোন আছে—বালবিধবা। বাবা আবার তাহার বিবাহ দিতে চাহিয়াছিলেন। সে কিছুতেই বিবাহ করিতে রাজি হয় নাই। কৃচ্ছ্রসাধন করিয়া সে এই জীবনটাকে নিষ্পিষ্ট করিয়া ফেলিতে চায়।

ও, এই যে আপনি এসেছেন দেখছি ! বসুন, বসুন।

আমি উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিলাম। ভদ্রলোক চশমা পরিধান করিতে করিতে বলিলেন, এসব কি এনেছেন আপনি ?

মাখনবাবু পাঠিয়ে দিয়েছেন আপনাদের জন্যে।

মাখনবাবুটি বুঝি সেই ভদ্রলোক, যিনি তখন আপনাকে ডেকে নিয়ে গেলেন ? আরে বাঃ, ছোলা-গুড় এনেছেন দেখছি—দুষ্প্রাপ্য জিনিস আজকাল। মিণ্টু, খাবি ?

মিণ্টু মাথা নাড়িয়া অসম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। আচ্ছা, আমিই চারটি খাই তা হলে।

ছোলা চিবাইতে চিবাইতে ভদ্রলোক বলিতে লাগিলেন, বুড়ো হয়েছি, কিন্তু ছোলা এখনও বেশ চিবুতে পারি। সিক্রেট কি জানেন? নিমের দাঁতন।—বলিয়া সহাস্যমুখে চিবাইতে লাগিলেন।

ট্রেনটা কখন ছাড়বে বলতে পারেন মশাই?

শুনছি তো সন্ধ্যের আগে নয়।

তাই নাকি? আপনি কোথা যাবেন?

কলকাতা।

তা হলে তো আপনার আরও ঢের দেরি। আমাদের গাড়ি না ছাড়লে তো আপনার গাড়ি আসবে না। কি মুশকিল।

একটু থামিয়া ভদ্রলোক আবার বলিলেন, এইটুকু শুধু ভগবানের দয়া যে, কারও কোন আঘাত লাগে নি।

আজ্ঞে হ্যাঁ।

ভদ্রলোকের স্নিগ্ধ গম্ভীর মূর্তি দেখিয়া কেমন যেন সম্ভ্রম হইতে লাগিল। খানিকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বৃদ্ধ আবার বলিলেন, বড় খুশি হলাম আপনাকে দেখে। কলকাতায় কি করেন আপনি?

পড়ি।

পড়েন? কোন্ কলেজে?

মেডিকেল—

আরে বাঃ। কোন্ ইয়ার হল?

সিক্‌স্‌থ ইয়ার চলছে।

আরে বাঃ! তা হলে তো ডাক্তার হয়েই গেছ তুমি—আই মীন আপনি।

সসঙ্কোচে বলিলাম, আমাকে তুমিই বলুন।

ভদ্রলোক হঠাৎ গম্ভীর হইয়া গেলেন। কিছুক্ষণ চুপচাপ। উঠি উঠি করিতেছি, এমন সময় তিনি বলিলেন, বিনোদ বলে কাউকে

চিনতে—বিনোদবিহারী মৈত্র? তোমার চেয়ে কিছু সিনিয়র—বছর চারেকের।

বলিলাম, না, চিনি না। কেন?

ভদ্রলোক একটু থামিয়া বলিলেন, সে আমার ছেলে।

কোথায় প্র্যাকটিস করছেন? চাকরি পেয়েছেন নাকি?

পাগল হয়ে গেছে সে। এখন পাগলা-গারদে আছে।

নিদারুণ সংবাদটা যেন বুলেটের মত আসিয়া বিঁধিল। ভদ্রলোকও কিছু বলিলেন না। আমিও বলিবার কথা কিছু খুঁজিয়া পাইতেছিলাম না। মনে হইল, বিধবা যুবতীটি একদৃষ্টে যেন আমার দিকে চাহিয়া আছেন। ফিরিয়া দেখিলাম, সত্যই তাই। আমাকে মনোযোগী দেখিয়া তিনি আবার সসঙ্কোচে মাথায় কাপড়টা টানিয়া সরিয়া বসিলেন।

উঠিয়া পড়িলাম।

চললাম এখন। মাখনবাবু চা খাওয়ার নেমন্তন্ন করেছেন। দেরি হয়ে যাবে।

ভদ্রলোক অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাই বলিলেন, মাখনবাবু কে?

যে ভদ্রলোক আপনাদের এই ছোলা-গুড় পাঠিয়ে দিয়েছেন।

ও, হ্যাঁ হ্যাঁ, আরে বাঃ, ভুলেই গেছলাম। তাঁকে আমার ধন্যবাদ দিও।

ভদ্রলোকের মনের মেঘটা যেন কাটিয়া গেল। আমি নমস্কার করিয়া চলিয়া আসিতেছিলাম। ভদ্রলোক বলিলেন, তুমি বাবা, চা-টা খেয়ে এস আবার। এখানে কতক্ষণ থাকতে হবে বলা তো যায় না। ঐকটু গল্প-সল্প করা যাবে।

আচ্ছা।

প্ল্যাটফর্মের উপর দিয়া অন্যমনস্ক হইয়া চলিয়াছিলাম।

বাবুজী! এ বাবুজী!

ফিরিয়া দেখিলাম, ডাকিতেছে সেই বেণী-দোলানো মুসলমানের মেয়েটি। আমি ফিরিতেই মুখটি ছুঁচলো করিয়া টুকটুকে লাল জিভটি বাহির করিয়াই ছুট দিল।

দুষ্টু মেয়ে!

একটু দূরে গিয়াই সেই বেঁটে ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা।

নমস্কার দারোগাবাবু।

কি আশ্চর্য, ভদ্রলোক সত্যই যে আমাকে দারোগা ঠাওরাইয়াছেন! ভদ্রলোকের ভুলটা ভাঙাইতে ইচ্ছা করিল না। স্মিতমুখে প্রতি-নমস্কার করিলাম।

তিনি বলিলেন, ওই হালুয়াই ব্যাটাকে একটু শাসিয়ে দিতে পারেন আপনি? লুচির সের এক টাকায় চড়িয়ে দিয়েছে। এ কি মগের মুলুক নাকি মশায়? আমরা না হয় নিরুপায় হয়ে পড়েছি, তাই বলে গলায় ছুরি দেবে ও?

কোন হালুয়াই?

ওই যে ইস্টিশানের ওপারে আছে এক ব্যাটা। কোন কালে এক পয়সার বিক্রি হত না, আজ ব্যাটার মরসুম পড়ে গেছে।

আমার শাসন কি শুনবে ও?

নিশ্চয় শুনবে। পুলিসের গুঁতোয় বড় বড় চোর শায়েস্তা হয়ে যায়, ও ব্যাটা তো সামান্য হালুয়াই।

আগাইয়া গেলাম।

সেই শীর্ণকান্তি ভদ্রলোক—যিনি কলের কাছে চীৎকার জুড়িয়াছিলেন—দেখিলাম, স্নান সমাপন করিয়াছেন। একটি লাল গামছা পরিয়া মন্ত্রোচ্চারণ করিতেছেন। ভদ্রলোকের বাহুমূলে প্রকাণ্ড মাদুলি ও রুদ্রাক্ষ, গলদেশেও তাবিজ-জাতীয় কি একটা দুলিতেছে। তিনি নগ্নগাত্রে গামছা পরিয়া বোধ হয় সূর্যস্তব পাঠ করিতেছিলেন।

তাঁহার কাছে একটি পাঁচ-ছয় বৎসরের বালক আবদার জুড়িয়া নাকে কাঁদিতেছে।

খিদে পেয়েছে দাদু, ওরা সবাই লুচি-জিলিপি খাচ্ছে, আমিও খাব। হুঁ হুঁ দাদু—

ভদ্রলোক মন্ত্র ভুলিয়া খ্যাঁকাইয়া উঠিলেন।

আরে, জ্বালিয়ে খেলে তো দেখছি এটা! তোকে লুচি-জিলিপি খাওয়াব বলে পয়সা সঙ্গে করে এনেছি নাকি? মাত্র ট্রেন-ভাড়াটি নিয়ে তো বেরিয়েছিলাম। তখন কি জানি, এমন হবে? চুপ কর।—বলিয়া আবার তিনি মন্ত্রে মন দিলেন।

হিং—হিং লিজিয়ে বাবু—আচ্ছা হিং—

কাবুলিওয়ালাটি তাহার জোব্বাজাব্বা পরিধান করিয়া ব্যবসায় শুরু করিয়া দিয়াছে। আমাকে দেখিয়া সেলাম করিয়া কাছে আসিল।

হাসিমুখে বলিল, হিং—হিং—বালা হিং। চাক্কু—বালা চাক্কু—আসলি জার্মানি—বড়িয়া চাক্কু—লিজিয়ে বাবুসাব—

আমার প্রয়োজন ছিল না। অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়া আগাইয়া গেলাম।

এক স্থানে একটা গামছাওয়ালাকে ঘিরিয়া দেখিলাম অনেক যাত্রী গামছাই খরিদ করিতেছে। একজন দুগ্ধবিক্রেতা হঠাৎ কোথা হইতে আসিয়া গরম দুধ ফেরি করিয়া বেড়াইতেছে। সেই মাড়োয়ারীটি মনে হইল এইমাত্র দুগ্ধপান শেষ করিয়াছেন, কারণ তাঁহার হাতে গেলাস এবং গোঁফে দুধ। মাড়োয়ারী ভদ্রলোক গোঁফে-লাগা দুধটুকুও অপচয় করিতে চান না। ঠোঁট ও জিভকে নানা প্রকারে বাঁকাইয়া গোঁফটিকে আয়ত্ত করিবার চেষ্টা করিতেছেন দেখিলাম।

স্যুটকেসের উপর যে মেয়েটি বসিয়াছিল এবং যাহাকে কেন্দ্র করিয়া এক দল ছোকরা ঘুরঘুর করিতেছিল, সেই মেয়েটি দেখিলাম উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে এবং কুলির মাথায় স্যুটকেস চাপাইয়া দিয়াছে। আমাকে দেখিয়া বলিল, দয়া করে আপনি বলে দিতে পারেন, মেয়েদের বসবার আলাদা জায়গা এখানে আছে কি না ?

অযাচিতভাবে একটি ছোকরা বলিল, আপনার তো আর সেকেণ্ড ক্লাস টিকিট নেই। এখানে তা ছাড়া যে ফিমেল ওয়েটিং-রুম আছে, তাতে তিল-ধারণের স্থান নেই। বেশ তো বসে আছেন আপনি, থাকুন না।

বুঝিলাম, মেয়েটি একটু বিপন্ন হইয়াছে। বলিলাম, আচ্ছা, আসুন আমার সঙ্গে। 'আসুন' বলিয়া আহ্বান তো করিলাম, কিন্তু কোথায় লইয়া গিয়া তাহাকে যে স্থান দিব, তাহা জানি না। মাখনবাবুই ভরসা। দেখি, কতদূর কি করিতে পারি! ঘাড় ফিরাইয়া দেখিলাম, দুই-তিনটি ছোকরা আমার দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া আছে। তাহাদের দৃষ্টির অর্থ সুপরিষ্কার—কোথা হইতে এ লোকটা আসিয়া জুটিল!

মাখনবাবুর বাড়িতে আসিয়া দেখি, মাখনবাবু নাই। তাঁহার স্ত্রী একটি ময়লা গামছায় করিয়া চা ছাঁকিতেছেন। আমাকে দেখিয়া ভদ্রমহিলা শশব্যস্ত হইয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং মাথার ঘোমটাটা টানিয়া দিলেন।

জিজ্ঞাসা করিলাম, মাখনবাবু কোথায় গেলেন? প্রথমে কোন উত্তরই তিনি দিলেন না। তখন আমি বলিলাম, এই মেয়েটিকে একটু বসান তো আপনার কাছে। দেখি আমি, মাখনবাবু কোথায় গেলেন।

কুলিটা এবং তাহার পিছু পিছু মেয়েটিও আসিয়া ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়াছিল। কুলি স্যুটকেসটা নামাইয়া রাখিল, এবং মেয়েটি আগাইয়া বিনুর কাছে গেল দেখিয়া আমি বলিলাম, আপনি একটু বসুন এখানে। আমি দেখি, মাখনবাবু কোথা গেলেন।

এইবার ফিসফিস করিয়া বিমু সেই মেয়েটিকে বলিলেন, উনি গেছেন দোকানে খাবার আনতে।

আচ্ছা, দেখি আমি।

হালুয়াইয়ের দোকানে সত্যই ভীষণ ভিড়।

প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে রামায়ণ পাঠ করিতে করিতে সে যে-রাবণকে অকুণ্ঠিতচিত্তে গালি দিত, আজ যদি কোন মন্ত্রবলে একদিনের জন্যও সে সেই রাবণ হইতে পারিত, অন্তত সেই রাবণের দশটা মুণ্ড ও বিশটা হাত আয়ত্ত করিতে পারিত, তাহা হইলে বেচারী বাঁচিয়া যাইত। দুই হাতে সে কত লুচিই ভাজিবে এবং একটা মুখে কত লোকের সহিতই বা কথা কহিবে! অথচ দুই মাইলের মধ্যে তাহার এই একখানি দোকান এবং অকস্মাৎ এতগুলি বুভুক্ষিত লোকের জন্য তাহা প্রস্তুত ছিল না।

ওটা তোমার ছানচা, না, ছোরা হে? এক টাকা সের লুচির দাম! বল কি তুমি? ওরে, চ চ, আর লুচি খেতে হবে না তোকে।

হুঁ হুঁ, দাদু—

সেই শীর্ণকান্তি ভদ্রলোক ও তাহার নাতি আসিয়া জুটিয়াছেন। নাতির হাত ধবিয়া তিনি হিড়হিড় করিয়া টানিয়া লইয়া গেলেন।

এই, আমাকে এক-পো লুচি আর একটু তরকারি দাও তো।

এই, শুনতা হ্যায়, এক সের পুরি, আউর আধা সের জিলেবি, গরম গরম ভাজকে দেও।

পানতোয়া আছে—পানতোয়া?

এই, এই, আরে মলো, ব্যাটা কথাই কয় না যে! ওহে, শুনছ, দু-সের লুচি আর আলুর দম—বাসী নাকি ওটা?

এই প্রকার নানা কণ্ঠের নানা চীৎকারকে অগ্রাহ্য করিয়া বনশি হালুয়াই দ্রুতবেগে লুচি ভাজিয়া চলিয়াছে। অন্য কোন দিকে মন

দিবার মত বাড়তি ফুরসুৎ তাহার এখন নাই। তুই বৎসর পূর্বে প্রদত্ত এক সন্ন্যাসীর তাবিজের ফল বুঝি ফলিতেছে। দৈবানুগৃহীত এই তুর্ঘটনা। ইহার অন্তরালে যে মঙ্গল এবং শনির পূর্ণ প্রভাব বিদ্যমান, তাহা আর কেহ না বুঝুক, বনশি হালুয়াই বুঝিতেছিল।

বনশি ভাজিতেছে এবং তাহার ভাই ধাড়ি বিক্রয় করিতেছে। চাকর বুলাকি লুচি বেলিতেছে এবং দরকারমত পাশের কড়াইতে-চড়ানো তরকারিটাতে খুন্তি চালাইতেছে। চতুর্দিকে চাহিয়া দেখিলাম, মাখনবাবুর পাত্তা নাই। সেই মাড়োয়ারী ভদ্রলোক দেখিলাম একটু দূরে এক স্থানে দাঁড়াইয়া এই জনতা লক্ষ্য করিতেছেন। গোঁফ পরিষ্কার, তুধের চিহ্নটুকুও আর সেখানে নাই। আমাকে দেখিয়া তিনি অকারণে আবার সেলাম করিলেন। আমিও প্রতি-নমস্কার করিয়া ভিড়ের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলাম। মাখনবাবুকে খুঁজিয়া বাহির করা শক্ত দেখিতেছি। ভদ্রলোক গেলেন কোথায় ?

অনেক কষ্টে ভিড় ঠেলিয়া বনশি হালুয়াইয়ের সান্নিধ্যলাভ করিলাম।

তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, মাখনবাবু কোথায় জান ? বনশি উত্তর দিল না। সে তখন একসঙ্গে দশখানা লুচি কড়াইতে ছাড়িয়াছে এবং ছানচা সঞ্চালন করিয়া চেষ্টা করিতেছে ঘি বেশি না পোড়ে। বনশি লোকটি বেঁটে, রঙ কালো, তুই-চারিগাছা গোঁফ আছে কি না-আছে, মাথার সামনের দিকে চুল নাই বলিলেই চলে। চক্ষু তুইটি হইতে একটা চাপা চতুরতা উঁকি মারিতেছে। পেটটি প্রকাণ্ড। দেহের মধ্যে ওই অবয়বটি সর্বাগ্রে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ফতুয়া সেটিকে আবৃত করিতে পারে নাই, বস্ত্র লাঞ্ছিত হইয়া সরিয়া গিয়াছে। নাভির বহু নিম্নে নীবিবন্ধন। সমস্ত উদরদেশ উন্মুক্ত আলোকে প্রকৃষ্টরূপে প্রকাশিত। বনশির সে জন্য লেশমাত্র সঙ্কোচ নাই। সে পার্শ্ববর্তী বুলাকিকে মাঝে মাঝে অস্ফুটস্বরে কি যেন বলিতেছে এবং একাগ্রমনে লুচি ভাজিয়া

চলিয়াছে। অন্য দিকে খেয়াল দিবার মত অবসর তাহার নাই।

আমি আর একবার চেষ্টা করিলাম।—মাখনবাবু কোথায় জান?

এবার বেশ একটু চীৎকার করিয়াই বলিলাম। সম্ভবত আমার উচ্চ কণ্ঠস্বরে আকৃষ্ট হইয়াই বনশি বলিল, মাখনবাবু? ভিতোরে আসেন। 'আসেন' মানে অবশ্য 'আছেন'—ঢুকিয়া পড়িলাম ভিতরে।

কোথা মাখনবাবু?

বনশি অঙ্গুলিসঙ্কেতে একটি ক্ষুদ্র দ্বারের দিকে দেখাইয়া দিল। মাখনবাবু বনশির অন্তঃপুরে ঢুকিয়াছেন নাকি? গেলাম আমিও। গিয়া দেখি, মাখনবাবু উবু হইয়া বসিয়া একটি কুলি-জাতীয় লোকের দ্বারায় কি যেন করাইতেছেন। আমাকে দেখিয়া সোল্লাসে বলিয়া উঠিলেন, ওয়েলকাম ওয়েলকাম সার, নিমকি করাচ্ছি। তাহার পর একটু থামিয়া বলিলেন, অন্য দিন হলে বনশি নিজেই করে দিত। আজ ব্যাটার ফুরসৎ নেই। আমাকে হাতজোড় করে বললে, হুজুর, রামদীনকে দিয়ে বানিয়া নেন, আমি ভেজে দিচ্ছি। নিমকি জিনিসটা আবার ব্যাগার-সারা করে করলে হয় না কিনা! ডল, ডল, আর একটু ডল। বেলতে আর কতক্ষণ যাবে? ময়দা মাখাটাই আসল।

রামদীন সঙ্গে সঙ্গে হাঁটু গাড়িয়া চক্ষু বুজিয়া ময়দার তালটার উপর ঘুষি চালাইতে শুরু করিল। আমার ভয় হইতে লাগিল, থালাটা না ভাঙিয়া যায়। মাখনবাবুরও দেখিলাম সে ভয় হইয়াছে। কারণ তিনিও বলিলেন, আস্তে, আস্তে।

হঠাৎ বাহিরের কলরবটা যেন বাড়িয়া উঠিল, মারো, ভাগা দেও শালেকো—

বনশির কণ্ঠস্বর শুনিলাম।

ব্যাপার কি দেখিবার জন্য বাহিরে আসিলাম। আসিয়াও

কিন্তু সহসা কিছু বুঝিতে পারিলাম না। ভিড়ের মধ্যে একটা আবর্ত সৃষ্টি হইয়াছে, এইটুকু মাত্র বুঝা গেল।

বনশিকে জিজ্ঞাসা করাতে সে বাংলা ভাষায় বলিল, ও কুস্থু নেই আসে বাবু, এক শালা লৌণ্ডা জিলেবি চোরাথা থা।

এমন সময় ভিড়ের ভিতর হইতে একটা আর্ত শিশুকণ্ঠ কাঁদিয়া উঠিল, কে যেন তাহাকে মারিতেছে! বাহির হইয়া আসিলাম। ছোট ছেলেকে কেহ মারিতেছে নাকি? ভিড়ের ভিতরে ঢুকিয়া পড়িলাম। অনেক ঠেলাঠেলি গুঁতাগুঁতির পর ঘটনাস্থলে পৌঁছিয়া দেখিলাম, ছোট ছেলেই বটে। কে যেন তাহার গালে একটা চড় মারিয়াছে, বেশ জোরেই মারিয়াছে, পাঁচটা আঙুলের দাগ বসিয়া গিয়াছে। ছেলেটি সেই শীর্ণকান্তি ভদ্রলোকের নাতি। সত্যই সে জিলাপি চুরি করিয়াছিল। শীর্ণকান্তি ভদ্রলোককে আশেপাশে কোথাও দেখিতে পাইলাম না। এক ঠোঙা জিলাপি কিনিয়া ছেলেটির হাতে দিলাম এবং তাহাকে ভিড় হইতে টানিয়া বাহিরে লইয়া আসিলাম।

তোমার দাদু কোথা?

জিলাপিতে কামড় দিতে দিতে সে বলিল, টেশনে।

একটু হিতোপদেশ দিবার ইচ্ছা হইল।

বলিলাম, ছি ছি, তুমি চুরি করেছিলে! ছি!

আমার খিদে লেগেছে যে! দাদুকে বললাম কত, দাদু দিলে না কিনে।

ইহার উপর আর কোন কথা চলে না।

এখন ছেলেটাকে তাহার দাদুর জিম্মা করিয়া দিতে পারিলে বাঁচি। এই ভিড়ে ছাড়িয়া দিলে হারাইয়া যাইতে পারে।

তাহাকে প্লাটফর্মের দিকেই লইয়া চলিলাম। একটু দূর গিয়াই সেই শীর্ণকান্তি ভদ্রলোকের দেখা মিলিল। তিনিও নাতির খোঁজে আসিতেছিলেন। সমস্ত বিবরণ তাঁহাকে বলিলাম।

শুনিয়া তিনি একেবারে রুখিয়া উঠিলেন। হতভাগা, পাজী ছোঁড়া! শালটীর চৌধুরী-বংশের ছেলে তুমি, তুমি গিয়েছ জিলিপি চুরি করতে! এত বড় নোলা তোমার! মেরেই ফেলব আজ, খুন করে ফেলব আজ হারামজাদাকে।

আমি ছেলেটাকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইলাম। শাস্তি ওর যথেষ্ট হয়ে গেছে মশাই, আর কিছু বলবেন না। ছেলেমানুষ—

কিন্তু শালটীর চৌধুরী-বংশের মহিমা ক্ষুণ্ণ হইয়াছে। শীর্ণকান্তি ভদ্রলোক কোন কথাই শুনিতে চাহেন না। বলব না! বলেন কি আপনি! কেটে পুঁতে ফেলব ওকে আমি। ঝাড়ু মারি আমি অমন বংশধরের মুখে। নচ্ছার, কুলাঙ্গার—

উচ্চৈঃস্বরে এতগুলি সংস্কৃত শব্দ একসঙ্গে উচ্চারিত হইতে লোক জমিয়া গেল।

কি হয়েছে মশাই!

ব্যাপার কি?

চুরি গেল নাকি কিছু?

ত্বইজন বেহারী নিম্নস্বরে বলাবলি করিতে লাগিল, বাবু বাউরা মালুম হোতা হ্যায়।

কোথা গেলেন সার?—মাখনবাবুর কণ্ঠস্বর শুনিতে পাইলাম। ভিড় ঠেলিয়া বাহির হইয়া আসিবার পূর্বে শীর্ণকান্তি ভদ্রলোককে অনুরোধ করিয়া আসিলাম, তিনি যেন আর মারধর না করেন। তথাপি তিনি ছাড়িলেন না, তাড়া করিলেন। নাতি জিলাপির ঠোঙা ফেলিয়া দৌড় দিল। ঠোঙা মাটিতে পড়িতে না পড়িতেই একদল কুকুর হুমড়ি খাইয়া আসিয়া তাহার উপর পড়িল। ছেলেটি সেই যা একটি খাইয়াছিল, বাকিগুলি কুকুরের পেটে গেল।

৫

গরম গরম নিমকি লইয়া মাখনবাবু ও আমি বাসায় ফিরিতে-ছিলাম। পিছনে পিছনে আসিতেছিল রামদীন। মাখনবাবু আমার দিকে চাহিয়া বাম চক্ষুটা ঈষৎ কুঁচকাইয়া বলিলেন, দেখেছেন তো মহাপ্রভুকে? এঁরই কীর্তি।

বুঝিলাম, রামদীনের কথাই বলিতেছেন।

একে বাঁচাবেন বলছিলেন না? কি উপায়ে?

আমার কথা শেষ করিতে না দিয়া বাম হাতের তর্জনী ঠোঁটের উপর চাপিয়া মাখনবাবু তর্জন করিয়া উঠিলেন, আস্তে মশাই, উচ্চারণ করবেন না ও-কথা, জানাজানি হয়ে গেলেই সর্বনাশ।

তাহার পর এদিক-ওদিক চাহিয়া নিম্নস্বরে বলিলেন, বেশ করে চা-টা খেয়ে মাথা ঠাণ্ডা করে একটা পরামর্শ করতে হবে। মাস্টার মশাইকে ডেকে আনা যাবে। আপনার মত পাকা মাথা একটা পাওয়া গেছে, ব্যাটার কপাল ভাল।

আমি এ বিষয়ে আর কি পরামর্শ দেব আপনাদের?

বাঃ, আপনি বয়সে ছোট হলেও শিক্ষিত লোক, আপনার বুদ্ধির দামই আলাদা। আমার নিজের বিদ্যে ম্যাট্রিক অবধি। আর মাস্টার মশাইয়ের পেটেও—প্রাইভেটলি বলছি, এক পিলে ছাড়া আর কিছু নেই; কোন রকমে 'ইয়েস সার', 'নো সার', 'ভেরি গুড সার'—। আপনি এসে গেছেন, এ ব্যাটার পরম সৌভাগ্য।

মিনিট-খানেক নীরব থাকিয়া বলিলাম, আপনার বাসায় আর একজন অতিথি এনে জুটিয়েছি। আপনার স্ত্রীর কাছে তাঁকে বসিয়ে এসেছি।

মাখনবাবু চলিতে চলিতে থামিয়া পড়িলেন।

হোয়াট? আবার কে অতিথি মশাই? আগে বললে নিমকি কিছু বেশি নিতাম যে!

ওতেই যথেষ্ট হবে, চলুন।

চলিতে চলিতে মাখনবাবু বলিলেন, লোকটি কে?

একটি স্ত্রীলোক।

আবার মাখনবাবু দাঁড়াইয়া পড়িলেন।

স্ত্রীলোক! ডোবালেন দেখছি। কে? সেই ওয়েটিংরুমের বিধবা নাকি? আচ্ছা লোক আপনি! ওর জন্যে আপনার অত মাথাব্যাথা কেন? ছোলা-টোলা তো সব দিয়ে এলেন।

না না, এ সে নয়, আর একজন।

আর একজন? উঃ, আপনাকে নিয়ে আর পারা গেল না! আচ্ছা লোক তো আপনি! ওসব টেন্‌ডেন্সি ছাড়ুন মশাই এই ভিড়ের মধ্যে। কি মুশকিল!—বলিয়া সস্মিতমুখে আমার মুখের দিকে চাহিলেন। একটু থামিয়া আবার বলিলেন, কে ইনি? আগে চিনতেন নাকি?

না।

সাংঘাতিক লোক আপনি মশাই।

মাখনবাবুর বাসার সমীপবর্তী হইয়াছিলাম। দেখিলাম, জানালায় বিনু দাঁড়াইয়া ছিলেন, আমাদের দেখিয়া সরিয়া গেলেন।

শুনিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম, মাখনবাবু রামদীনকে বলিতেছেন, ওরে, তুই মাস্টার মশায়ের বাড়ি থেকে একখানা চেয়ার বোঁ করে নিয়ে আয় তো। বাইরেই বসা যাক। আমার চেয়ারটাও বার করি। ভেতরে একে জায়গা কম, তার ওপর আপনি—। বলিয়া আমার দিকে চাহিয়া একটু হাসিলেন। আমিও তাড়াতাড়ি বলিলাম, হ্যাঁ, সেই ভাল, বাইরেই বেশ হবে।

রামদীন ঊর্ধ্বশ্বাসে একখানা চেয়ার লইয়া আসিল। মাখনবাবুও একখানা ছোট চেয়ার এবং তাহার পর একটা ছোট টেবিলও বাহির

করিয়া আনিলেন। টেবিলটা নামাইয়া দিয়া মাখনবাবু এদিক-ওদিক চাহিতে লাগিলেন, যেন কি খুঁজিতেছেন।

কি খুঁজছেন? পয়সা-টয়সা পড়ে গেল নাকি?

না, পয়সা নয়। খুঁজছি একটা সাইজ মাফিক ইট।

ইট?

হ্যাঁ, টেবিলটা একটু ইয়ে কিনা, মানে পায়া চারটে সমান নয়। একটা পায়ার তলায় একটা ছোট্ট ইট না দিলে—এই যে পেয়েছি।

টেবিলটাকে ঠিকমত বসাইয়া মাখনবাবু বলিলেন, এইবার অল রাইট। দেখি, চায়ের কতদূর কি হল!—বলিয়া তিনি ভিতরে চলিয়া গেলেন।

গরুড়-পক্ষীটির মত হাতজোড় করিয়া রামদীন নিকটে দাঁড়াইয়া ছিল। তাহাকে লক্ষ্য করিতে লাগিলাম। আঁটসাঁট গড়নের লোকটি। পরনে রেলের জামা ও পাগড়ি। মুখের দিকে চাইলেই প্রথমে চোখে পড়ে লাল চক্ষু দুইটি এবং কপালের ও রগের স্ফীত শিরাসমূহ।

জিজ্ঞাসা করিলাম, তোমার নাম রামদীন?

হাঁ, হুজুর। যেন হাঁড়ির ভিতর হইতে শব্দ হইল। এমন সময় মাখনবাবু ফিরিয়া আসিলেন। হাসিয়া হাত দুইটি উলটাইয়া বলিলেন, এগেন কোল্ড সার। ফের জল চড়িয়েছে, ফাইভ মিনিটস মোর। ততক্ষণ আমি মাস্টার মশাইকে ডাকি একটু, আপনার সঙ্গে আলাপটা হয়ে যাক। হ্যাঁ, বাই দি বাই, ওই মেয়েটি তো কিচ্ছু খেতে চাইছে না মশাই। বলছে, শুধু বসে থাকতে পেলেই ওর যথেষ্ট। স্ট্রেঞ্জ ক্যারেকটার! সাধারণত লোকে বসতে পেলেই শুতে চায়। এ একেবারে ঠায় বসে আছে, নট নড়নচড়ন নট কিছু। বিনু বললে, স্পিকটি নট, মুখ বুজে চুপচাপ বসে আছে। আপনি একটু বলে কয়ে দেখুন না, যদি একটু চা খাওয়াতে পারেন।

আমি হাসিয়া বলিলাম, দরকার কি জোর-জবরদস্তি করবার?

খেতে বলেছেন ওই যথেষ্ট। তা ছাড়া আমিও তো ওঁকে চিনি না যে, গিয়ে অনুরোধ করব। আমার সম্পূর্ণ অচেনা। প্ল্যাটফর্মে কতকগুলো ছোঁড়া ওঁকে বিরক্ত করছিল, তাই আমাকে উনি বললেন, ফিমেল ওয়েটিং-রুমটা দেখিয়ে দিতে। আমি আপনার বাসাতেই নিয়ে এলাম।

বেশ আছেন আপনি!—বলিয়া হাসিয়া মাখনবাবু মাস্টার মশাইকে ডাকিতে গেলেন।

স্টেশন-মাস্টারের বাসা নিকটেই।

একটু পরেই স্টেশন-মাস্টার মহাশয় আসিলেন। ভদ্রলোকের হাঁপানি আছে, লক্ষ্য করিলাম। তাঁহার গায়েও রেলের জামা। গলায় একটা বেমানান গোছের সবুজ মাফলার। কাঁচা-পাকা, দাড়ি-গোঁফে মুখমণ্ডল সমাচ্ছন্ন। চোখের তারা দুইটি সর্বদাই যেন কুঞ্চিত ভ্রূযুগলে কিছু দেখিবার চেষ্টা করিতেছে, অথচ আবার মাঝে মাঝে সম্মুখের দিকে চট করিয়া চাহিয়া দেখিতেছে। আমার দিকে চকিতে চাহিয়া আবার ঊর্ধ্বনেত্র হইলেন। আমি নমস্কার করাতে একবার ক্ষণিকের জন্য আমার দিকে চাহিয়া প্রতি-নমস্কার করিলেন।

মাখনবাবু বলিলেন, এঁরই কথা বলছিলাম।

ও।—বলিয়া মাস্টার মহাশয় নিকটস্থ চেয়ারটাতে বসিয়া হাঁপাইতে লাগিলেন।

রামদীন চা ও নিমকি লইয়া আসিল।

মাস্টার মহাশয় ও আমার সম্মুখে এক পেয়ালা করিয়া চা ও প্রচুর নিমকি আগাইয়া দিয়া মাখনবাবু বলিলেন, খেতে খেতে আলাপটা হোক সার।

মাস্টার মহাশয় হাত নাড়িয়া অতি কষ্টে বলিলেন, খাবার-টাবার খাব না, ওসব চলবে না। খেলেই হাঁপানি বাড়ে। চা বরং চলতে পারে একটু। এ সময় আমি খাইও এক কাপ।—বলিয়া

তিনি একটা পেয়ালা নিজের দিকে টানিয়া লইয়া পকেটে কি যেন খুঁজিতে লাগিলেন। দুইটি পকেটই খুঁজিলেন, কিন্তু ঈপ্সিত বস্তু পাওয়া গেল না। মাখনবাবু হাসিয়া বলিলেন, লেফট বিহাইণ্ড বুঝি? ওরে রামদীন!

রামদীন বাড়ির ভিতরে ছিল। দৌড়াইয়া বাহির হইয়া আসিল। রামদীন আসিতেই মাখনবাবু বলিলেন, ওরে, দৌড়ে গিয়ে বাবুর আপিঙের কৌটোটা নিয়ে আয় তো।

রামদীন দৌড়িল।

মাস্টার মশাই ঊর্ধ্বনেত্র হইয়া চক্ষু মিটমিট করিতে করিতে বলিলেন, বালিশের নীচে আছে বলে দিন।

মাখনবাবু আবার চীৎকার করিয়া উঠিলেন, ওরে রামদীন, শোন, বালিশের নীচে আছে, বুঝলি?

হাঁ, হুজুর।

রামদীন চলিয়া গেল।

রামদীন না আসা পর্যন্ত আমরা সকলেই রামদীনের পথপানে চাহিয়া রহিলাম। আপিঙের কৌটা না আসা পর্যন্ত জমিবে না। যদিও বেশি দেরী হয় নাই, মাখনবাবু তথাপি অধীর হইয়া উঠিলেন, এ ব্যাটা গাঁজাখোঁরকে নিয়ে আর পারা যায় না! এমন সময় রামদীনকে দেখা গেল, বেচারা দৌড়াইয়া আসিতেছে।

এক গুলি অহিফেন গলাধঃকরণ করিয়া এবং তৎপরে চায়ের পেয়ালায় একটা চুমুক দিয়া মাস্টার মশাই বলিলেন, ব্যাপার যা দাঁড়িয়েছে, চাকরি বোধ হয় আর থাকে না। আচ্ছা মাখনবাবু, আমি ভাবছি, এ ভদ্রলোককে আমাদের এসব ব্যাপারে জড়ানো কি ঠিক হবে?

মাখনবাবু নড়বড়ে টেবিলটি চাপড়াইয়া বলিলেন, সারটেনলি—নিশ্চয়ই। আমাদের এখন কারুরই মাথার ঠিক নেই। আপনারও নেই, আমারও নেই। অর্থাৎ কি ভাবে দোষটা অপরের ঘাড়ে চাপানো যায়, সেই পরামর্শ টা—

মাস্টার মহাশয়ের ভ্রূ-সন্ধানী নয়নযুগল ঘন ঘন মিটমিট করিতে লাগিল। তিনি গভীর চিন্তামগ্নভাবে আর এক চুমুক চা পান করিলেন। আমার সহিত এই সব গোপনীয় অথচ প্রয়োজনীয় বিষয়ে আলোচনা করিতে মাস্টার মহাশয়ের মন সরিতেছিল না।

আমার নিজেরও মনোগত অভিপ্রায় ছিল না এই সব ব্যাপারে নিজেকে জড়াইয়া ফেলিতে। কিন্তু মাখনবাবু নাছোড়। তিনি কনুই দিয়া আমার পিঠে একটা খোঁচা দিয়া বলিলেন, বলুন না মশাই, কার ঘাড়ে দোষটা চাপানো যায়?—বলিয়াই তিনি ঘাড় ফিরাইয়া একবার চতুর্দিক দেখিয়া লইলেন, অপর কেহ আমাদের কথাবার্তা শুনিতেছে কি না! এক রামদীন ছাড়া কাছে-পিঠে আর কেহ ছিল না।

মাখনবাবু বলিলেন, এই রামদীন, সিগ্রেট লে আও। রামদীন চলিয়া গেলে আমি বলিলাম, রামদীনকে বাঁচাতে হলে হয় ড্রাইভারের দোষ দিতে হয়, না হয় ইঞ্জিনের দোষ দিতে হয়, না হয় রেল-লাইনের দোষ দিতে হয়। এর মধ্যে কোনটা সম্ভবপর হতে পারে, ভেবে দেখুন আপনারা। মাস্টার মহাশয় নিমেষের জন্য আমার পানে চাহিয়া আবার ঊর্ধ্বনেত্র হইলেন। তাঁহার 'চোখের পাতা খুব ঘন ঘন ওঠা-নামা করিতে লাগিল।

মাখনবাবু আমার চিন্তাপ্রণালী দেখিয়া মুগ্ধ সস্মিত দৃষ্টিতে মাস্টার মহাশয়ের দিকে চাহিয়া রহিলেন। ভাবটা যেন, দেখিলেন তো, কেমন গুছাইয়া জিনিসটাকে বলিলেন ইনি? মাস্টার মহাশয় ঊর্ধ্ব-দৃষ্টি হইয়া হাঁপাইতেছিলেন, তিনি মাখনবাবুর এই পুলকিত মুখচ্ছবি দেখিতে পাইলেন না। বুঝিলাম, তাঁহার পক্ষে বেশি কথা বলা কষ্টকর।

মাখনবাবুকে আমি আবার বললাম, তা ছাড়া আমার আর একটা কথা মনে হচ্ছে এখন। বললাম বটে, ইঞ্জিন আর রেল-লাইনের দোষ দেওয়া যায়, কিন্তু ভেবে দেখছি, ও দুটো বোধ হয় খাটবে না।

কেন? হোয়াই?—বিজ্ঞভাবে মাখনবাবু বলিলেন। মাস্টার মহাশয় হাঁপাইতে হাঁপাইতে মনোযোগ সহকারেই আমাদের কথাবার্তা শুনিতেছিলেন। তাঁহার চিন্তাগ্রস্ত মুখে ও দ্রুত নড়নশীল চোখের পাতায় তাহা প্রতীয়মান হইতেছিল।

আমি বলিলাম, ইঞ্জিন আর রেল-লাইন যে ঠিক আছে, তা তো যে কোন ইঞ্জিনিয়ার এসেই ধরে ফেলবে। রামদীনকে বাঁচাতে হলে ড্রাইভারের নামে দোষ চাপানো ছাড়া আর কোন বুদ্ধি তো মাথায় আসছে না।

মাখনবাবু সোৎসাহে বলিয়া উঠিলেন, তা তো ঠিক। কিন্তু হাউ? কেমন করে?

সেটা ভেবে দেখতে হবে। বলতে পারেন, ড্রাইভার মাতাল অবস্থায় এই কাণ্ড করেছে, কিংবা ওই রকম একটা কিছু—

মাস্টার মহাশয়ের নয়নযুগল অল্পক্ষণের জন্য আমার মুখপানে নিবদ্ধ হইয়া আবার উর্ধ্বগামী হইল। মুখমণ্ডলে ক্ষণিকের জন্য যেন একটা আনন্দের আলো ফুটিয়া উঠিল। তিনি একটু থামিয়া থামিয়া বলিলেন, আমিও রিপোর্ট করেছি তাই। ড্রাইভার ফাউণ্ড ড্রাঙ্ক। এখন কথা হচ্ছে—। বলিয়া তিনি চায়ের বাটিতে আর একটা চুমুক দিলেন।

মাখনবাবু বলিলেন, আপনি রিপোর্ট করে দিয়েছেন, অলরেডি?

হ্যাঁ হ্যাঁ। আরে, এই সামান্য বুদ্ধিটা কি আর আমার ঘটে নেই, অ্যাদ্দিন চাকরি করছি, হ্যাঃ! কি মনে কর তুমি আমাকে?

মাখনবাবু হাসিয়া বলিলেন, গ্রেট মেন থিঙ্ক অ্যালাইক। মাস্টার মহাশয় কিছু না বলিয়া হাঁপাইতে লাগিলেন। এই উত্তেজনাটুকুতে তাঁহার হাঁপানিটা যেন বাড়িয়া গেল। চাটুকু নিঃশেষ করিয়া মাস্টার মশাই উঠিয়া গেলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন, আপনারা তুজনে ভেবে-চিন্তে দেখুন জিনিসটাকে। 'ড্রাঙ্ক' বললেই তো হবে না। প্রমাণের ওপর সেটাকে দাঁড় করাতে হবে তো?

নিমকিতে একটা কামড় দিয়া মাখনবাবু বলিলেন, সারটেনলি—নিশ্চয়ই।

রামদীন এক প্যাকেট সিগারেট লইয়া আসিল। একটা সিগারেট ধরাইতে ধরাইতে আমি বলিলাম, যাই, প্ল্যাটফর্মটায় একবার ঘুরে-ফিরে আসি।

মাখনবাবু বলিলেন, বেশি দেরি করবেন না যেন। রান্না প্রায় শেষ হয়ে গেল। আপনি আমার এখানে খাবেন, সে কথা অবশ্য বলাই বাহুল্য। রান্না প্রায় হয়ে এল। আর হ্যাঁ, আপনি ওই মেয়েটিকে বলে-কয়ে দেখুন না, যদি একটু কিছু খাওয়াতে পারেন।

আমি বাধা দিয়া বলিলাম, আপনার স্ত্রী সেসব ঠিক করবেন এখন। আমার এ রকম ভাবে বলাটা কি ভাল দেখায়? ভেবে দেখুন না!

মাখনবাবু চায়ের বাটিতে চুমুক দিতেছিলেন। বাটিটা নামাইয়া বলিলেন, হ্যাঁ, বিনু ওসব বিষয়ে খুব ওস্তাদ আছে। পরকে এমন আপন করতে পারে! গিয়ে হয়তো দেখব, দুজনে হরিহর-আত্মা হয়ে বসে আছে। কিছু বলা যায় না। —বলিয়া মাখনবাবু এতদূর হইতে অনর্থক উঁকিঝুঁকি দিয়া অন্তঃপুরের অবস্থাটা পর্যবেক্ষণ করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

আমি বলিলাম, একটু ঘুরে আসি তা হলে।

যান, বেশি দেরি করবেন না। তাহার পর হাসিয়া বলিলেন, আর কাউকে জোটাবেন না যেন।

চলিয়া যাইতেছিলাম। মাখনবাবু আবার পিছু ডাকিলেন।

দিস ফেলোর কথাটাও একটু ভাববেন। শক্ত সমস্যা। ড্রাঙ্ক বললেই তো হবে না, প্রমাণ করতে হবে।

আমি হাসিয়া বলিলাম, রামদীনকে বলুন না, ড্রাইভারটাকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে যদি সত্যিই একটু মদ খাওয়াতে পারে। বিনা পয়সায় পেলে হয়তো খেতেও পারে—

মাখনবাবুর মুখ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল তিনি বলিলেন, দেখি, মন্দ বুদ্ধি নয় এটা। মাথা বটে আপনার !

৬

প্ল্যাটফর্মের ভিতর দিয়া চলিতেছিলাম।

হঠাৎ নজরে পড়িল, সেই বেণী-দোলানো মেয়েটি রেল-লাইনের বেড়া-দেওয়া তারের উপর দাঁড়াইয়া লাফাইয়া লাফাইয়া দুলিতেছে। আমাকে দেখিতে পাইল না। পাইলে তাহার টুকটুকে-লাল জিভটুকু বাহির করিয়া মুখভঙ্গী সহকারে ঠিক অভ্যর্থনা করিত। একবার মনে করিলাম, ডাকি মেয়েটিকে।

কিন্তু তাহা আর ঘটিয়া উঠিল না। নিকটেই একটা গোলমাল উঠিল। একদল লোক তালগোল পাকাইয়া একটা কোলাহলের সৃষ্টি করিয়াছে। নিকটে গিয়া দেখি, সেই কাবুলিওয়ালা একটি যুবকের হাত চাপিয়া ধরিয়াছে এবং মার্জার-কবলিত মূষিকের ন্যায় যুবকটি চিঁচিঁ করিতেছে। কৌতূহল হইল। ভিড় ঠেলিয়া ভিতরে গেলাম। কাবুলী আমাকে দেখিয়া বলিল, উজুর, আপ দেখিয়ে, আপ বালা আদমি, ইনসাফ কর দিজিয়ে।—বলিয়া সে যাহা বলিল, তাহার মর্মার্থ এই যে, এই যুবকটি কাবুলীটির নিকট ছুরি কিনিবে বলিয়া একটি ছুরি চাহিয়া লয় এবং ছুরির ধার আছে কি না তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য নিজের হাতের নখগুলি কাটিতে থাকে। দুইটি হাতের সমস্ত নখ নিপুণভাবে কাটিয়া এখন ছোকরা ছুরিটি এই অজুহাতে ফিরাইয়া দিতে চায় যে, ছুরিটি আশানুরূপ তীক্ষ্ণ নহে। তদুত্তরে কাবুলিওয়ালা বলিতেছে যে, ছুরির ধার আছে কি না, তাহা সে এখনই সর্বসমক্ষে প্রমাণ করিয়া দিবে এই বেইমানের নাসিকা ছেদন করিয়া। যুবকটির দিকে চাহিয়া তাহাকে চিনিতে পারিলাম। সেই ট্যারা ছোকরা। একাকিনী ভদ্রমহিলাটির সম্মুখে একটু আগেই দাঁত বাহির করিয়া হাসিতেছিল।

তাহাকে বলিলাম, আপনি ছুরি যখন নেবেন না, তখন মিছি-মিছি কেন ওর ছুরি দিয়ে নখ কাটলেন ?

ধার নেই মশাই ওর ছুরিতে।

ধার নেই তো দশটা আঙুলের নখ অমন সুন্দরভাবে কাটলেন কি করে ?

জুট বাত মৎ বোল্‌না।—কাবুলী গর্জন করিয়া উঠিল।

ট্যারা ছোকরাটি বলিল, তা ছাড়া অত দাম দিয়ে ছুরি কে নেবে মশাই, দাম বলছে, আড়াই টাকা।

আচ্ছা, দো রূপেয়ামে দেগা, নাফা ছোড় দিয়া।

আমি বলিলাম, কাজটা ঠিক হয় নি আপনার। এর সঙ্গে যখন দরদস্তুর করেছেন, হাতের নখ কেটেছেন, তখন নেওয়া উচিত আপনার ছুরিটা।

আমার কাছে অত পয়সা এখন নেই তো।

আপনার বন্ধুবান্ধবদের কাছে দেখুন। আপনারা তো এক দল ছিলেন।

আপনি যখন বলছেন, তাই দেখি। এই, হাত ছোড়ো।

কাবুলী হাত ছাড়িয়া দিল।

কাবুলীকে বলিলাম, বেচারার নিকট পয়সা নাই। বন্ধুবান্ধবদের নিকট হইতে যোগাড় করিয়া আনিতেছে। কাবুলিওয়ালা ছোকরার পিছু পিছু গেল। আমি এদিক-ওদিক চাহিয়া দেখিলাম, ছোকরার বন্ধুবান্ধবদের কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না। সব সরিয়া পড়িয়াছে।

আর একটু আগাইয়া যাইতেই সেই মাড়োয়ারী ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হইল। তিনি এবারও আমাকে সেলাম করিলেন। শুধু সেলাম করিয়াই এবার ক্ষান্ত রহিলেন না, নিকটে আসিয়া সসম্ভ্রমে বলিলেন যে, আমার সহিত তাঁহার গোপন একটা পরামর্শ আছে, আমি যদি অনুমতি করি। বিস্মিত হইলাম। আমার সহিত কি গোপন পরামর্শ থাকিতে পারে ?

একটু ইতস্তত করিয়া বলিলাম, বেশ তো, বলুন। তিনি বলিলেন যে, এখানে অনেক লোকজন রহিয়াছে, পরামর্শটা প্ল্যাট-ফর্মের বাহিরে হওয়াটাই সমীচীন। আমি তখন বলিলাম যে, ওয়েটিং-রুমে এক ভদ্রলোকের সহিত দেখা করিতে যাইতেছি, সেটা না সারিয়া এখন আমি প্ল্যাটফর্মের বাহিরে যাইব না। তিনি কি অপেক্ষা করিবেন ?

বহুত খুব।

আমি ওয়েটিং-রুমে ঢুকিয়া পড়িলাম। মাড়োয়ারীটি চঞ্চল-ভাবে প্ল্যাটফর্মে পায়চারি করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

ওয়েটিং-রুমে ঢুকিয়া দেখিলাম, বৃদ্ধ বিছানা বিছাইয়া বেশ জমিয়া বসিয়া একটি বই পড়িতেছেন। তাঁহার বিধবা কন্যাটি পট্টবস্ত্র পরিধান করিয়া ঘরের এক কোণে স্টোভে রান্না চড়াইয়া দিয়াছেন।

এস এস, আরে বাঃ, চা-টা খাওয়া হয়ে গেল ? বস, বস, এই বিছানাতেই বস না তুমি !

ভদ্রলোক মহা উৎসাহে আমাকে আপ্যায়িত করিয়া বসাইলেন।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কি বই পড়ছেন ওটা ?

ভদ্রলোক বইখানা লুকাইবার চেষ্টা করিয়া বলিলেন, ও একটা বাজে বই বলে মনে হবে তোমার। আমার কিন্তু বেশ লাগে।

বিধবা মেয়েটি দেখিলাম মুচকি মুচকি হাসিতেছেন। আমি আবার বলিলাম, কি বই ?

আমার এই বয়সে 'পিলগ্রিমস প্রগ্রেস' বা গীতা বা ওই রকম কিছু একটা পড়া উচিত ; কিন্তু খুব ভাল লাগে আমার এই বইখানা। —বলিয়া বইটা আমার হাতে দিলেন।

দেখিলাম, 'অ্যালিস ইন ওয়ানডারল্যাণ্ড'। বলা বাহুল্য, আশ্চর্য হইয়া গেলাম। আরও দুই-তিনখানা বই কাছে পড়িয়া আছে দেখিলাম। বলিলাম, বইটা তো খুব ভাল বই। ছোট ছেলেমেয়েদের এমন বই আর হয় নি।

ম্লান হাসিয়া ভদ্রলোক বলিলেন, ভেবেছিলাম, নাতি-নাতনীদের নিয়ে বুড়ো বয়সে এই বইগুলো আবার বেশ জমিয়ে পড়ব, কিন্তু আমার কপালে সে সুখ তো আর লেখেন নি। তাই একা একাই পড়ি।

চুপ করিয়া রহিলাম।

একটু পরে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনারা খুব গোঁড়া হিন্দু, না?

তিনি হাসিয়া বলিলেন, না, মোটেই না। তবে আমার মেয়ে কিছুদিন থেকে—। বলিয়া তিনি চকিতে একবার কন্যার প্রতি চাহিয়া দেখিলেন।—ও কিছুদিন থেকে ভয়ানক গোঁড়া হয়ে উঠেছে।

আমি বলিলাম, কিছুদিন থেকে মানে? আগে গোঁড়া ছিলেন না?

না, মোটেই না। কলেজে-পড়া মেয়ে কি সহজে গোঁড়া হয়! ও বি. এ. পাস করেছে আজ বছর চারেক হল। তাই না মিণ্টু?

মিণ্টু কিন্তু দেখিলাম আমাদের দিকে পিছন ফিরিয়া বসিয়া আলু ছাড়াইতেছেন। বৃদ্ধের কথায় একটু মাথা নীচু করিলেন মাত্র।

হ্যাঁ, চার বছরই।—বলিয়া বৃদ্ধ চুপ করিয়া গেলেন।

মিণ্টু নীরবে তরকারি কুটিতে লাগিলেন। আমি 'অ্যালিস ইন ওয়ানডারল্যাণ্ডে'র পাতাগুলা উল্টাইয়া ছবি দেখিতে লাগিলাম। নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বৃদ্ধ আবার বলিলেন, বরাত, বরাত, সবই অদৃষ্ট। অদৃষ্ট ছাড়া পথ নেই। বুঝলে বাবা? বিধাতার বিধানকে মেনে নেবার মত মনের শক্তি থাকা দরকার। আমার ওইটের অভাব ছিল বলেই এত কষ্ট পেলাম।—বলিয়া বৃদ্ধ একটু হাসিলেন।

একটু চুপ করিয়া আবার শুরু করিলেন, বিধাতার বিধানকে মেনে নেওয়াই উচিত। বিনোদ পাগল হয়ে গেছে, পাগলা-গারদে পাঠিয়ে দিয়ে নিশ্চিন্ত হয়েছি তো। মিণ্টু বিধবা হয়েছিল, সেটাকেও এমনই ভাবে মেনে নিলেই চুকে যেত। কিন্তু আমি গেলাম বিধাতার ওপর টেক্কা দিতে। বিধাতা সে কথা শুনবে কেন? আরে বাঃ!—বলিয়া আবার একটু হাসিলেন।

হঠাৎ মিণ্টু বৃদ্ধের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, আচ্ছা বাবা, নিজেদের দুর্ভাগ্যের কথা বাইরের পাঁচজনকে শুনিয়ে লাভ কি? এসব কি বলে বেড়াবার মত কথা?

আমি বলিলাম, থাক, দরকার কি ওসব কথার? এবার আমাকে উঠতেও হবে।—বলিয়া উঠিবার উপক্রম করিলাম।

বৃদ্ধ একটু অপ্রতিভ হইয়াছিলেন। বলিলেন, এরই মধ্যে উঠবে কোথায়? ট্রেনের তো এখনো ঢের দেরি। আমাদের এইখানেই যখন রান্না হচ্ছে, তখন এইখানে চারটি খাও না।

আমার আপত্তি নেই তাতে। কিন্তু মাখনবাবুর বাড়িতে আমার জন্যে রান্না হচ্ছে, শুনলাম।

ও, আচ্ছা, সেইখানেই খেও তা হলে। তবু বস একটু। এর মধ্যেই রান্না নিশ্চয়ই হয়ে যায় নি।

না, তা বোধ হয় নি।, আচ্ছা বসছি একটু।—বলিয়া আবার বসিয়া পড়িলাম।

কিন্তু স্বচ্ছন্দ ভাবটা যেন আর ফিরিয়া পাইলাম না। বৃদ্ধ উচ্ছ্বসিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, হ্যাঁ, বস বস, কোথায় যাবে এখন? মেডিকেল কলেজের ছেলে দেখলেই আমার বিনোদকে মনে পড়ে। এর মধ্যে হয়তো কোন যুক্তি নেই, কিন্তু মেডিকেল কলেজের ছাত্র শুনলেই তাকে নিজের লোক বলে মনে হয়। অর্থাৎ—

কথা অসমাপ্ত রাখিয়াই ভদ্রলোক থামিয়া গেলেন।

খানিকক্ষণ নীরবেই কাটিল।

আমি কেমন যেন একটু অস্বস্তি বোধ করিতেছিলাম। কোন ছুতায় উঠিয়া পড়িতে পারিলে বাঁচি। এমন সময় বৃদ্ধ আবার বলিয়া উঠিলেন, মিণ্টু, তুই রাগ করলি, কিন্তু তুই ভেবে দেখ দিকি, এসব কথা চেপে রাখা উচিত কি? শিক্ষিত লোক মাত্রকেই সমাজের গলদের কথাটা বলা উচিত, কারণ হয়তো ওঁরা এর প্রতিকার করতে

পারবেন। আমার মনে হয়, খবরের কাগজে লেখালেখি করে সকলের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া দরকার। সম্ভব হলে এসব লোককে পুলিসের হাতে দেওয়া কর্তব্য। শরীরের কোথাও যদি ঘা হয়ে পচে যায়, সেটাকে লুকিয়ে রাখতে হবে? আরে বাঃ! তাঁহার চশমার পুরু লেন্স দুইটি আলোকপাতে অত্যন্ত চকচক করিতে লাগিল। তিনি উত্তেজিত স্বরে বলিতে লাগিলেন, না না, শোন তুমি। তোমার শোনা উচিত। প্রত্যেক শিক্ষিত লোকের জানা উচিত, কি রকম পাজী সমাজে আমরা বাস করি। মিণ্টু বিধবা হবার পর আমি তার আবার বিয়ে দিয়েছিলাম, সে এক রকম জোর করে। মিণ্টুকে অনেক কষ্টে রাজি করালাম। মিণ্টু যদি রাজি হল, আত্মীয়-স্বজনেরা ঘোরতর আপত্তি করলেন। আমি দেখলাম, আরে বাঃ, আত্মীয়-স্বজনদের মন রাখতে গেলে নিজের বিবেককেই অগ্রাহ্য করতে হয়। লেখাপড়া শিখেছি তা হলে কিসের জন্যে? পাত্রের জন্যে খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দিলাম।

বলিয়া ভদ্রলোক একটু চুপ করিয়াই আবার আরম্ভ করিলেন একদিন সকালবেলা বসে আছি, একটি নিরীহ গোছের লোক এসে দেখা করলেন। বললেন, আমার বিজ্ঞাপন তিনি দেখেছেন এবং আমার মেয়েকে বিয়েও করতে রাজি আছেন। তিনিই পাত্র, বুঝলে? বিধবা-বিবাহ নিয়ে বেশ খানিকক্ষণ আলোচনা হল, ছেলেটির কথাবার্তা শুনে আমার বেশ ভাল লাগল। ছেলেটি দেখতেও বেশ ভদ্র নিরীহ। তারপর ছেলেটি বললে যে, বিধবা-বিবাহ করলে কিন্তু আত্মীয়-স্বজন সবাই তাকে ত্যাগ করবে। এক রকম নিঃসম্বল নিঃসহায় হয়ে পড়তে হবে তাকে। সুতরাং কিছু পণ চাই। অন্তত পাঁচ হাজার টাকা না পেলে তার পক্ষে এ বিবাহের দায়িত্ব নেওয়া সম্ভবপর নয়। আমি ভেবে দেখলাম, কথাটা ঠিকই, সমাজকে তো চিনি। রাজি হয়ে গেলাম।

বৃদ্ধ আবার চুপ করিলেন।

মিণ্টুর দিকে ফিরিয়া দেখিলাম, একমনে তরকারিই কুটিতেছেন। বৃদ্ধ আবার বলিয়া উঠিলেন, উঃ, সবই বরাত! আমার রোখ চড়ে গিয়েছিল। ছোকরাটি বললে, সে গোপনেই বিয়ে করতে চায়। তাতেও রাজি হয়ে গেলাম। বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ে হয়ে যাবার মাস খানেক পরেই ছোকরা একদিন নিরুদ্দেশ। কোন পাত্তা নেই। তারপর শুনলাম এবং খোঁজ-খবর করে জানলাম যে, কথাটা সত্যি, ছোকরার আরও দু-দুবার বিয়ে হয়েছে, পত্নী দুটিও জীবিতা। ভেবে দেখ একবার। মিণ্টু তারপর থেকে যে নিষ্ঠা শুরু করেছে, তা প্রায় আত্মহত্যারই সামিল, অর্থাৎ এই দারুণ গ্রীষ্মে নিরম্বু উপবাসটা—কিন্তু করবেই তো, মানে, ওর মনের অবস্থাটা—করবে না? আরে বাঃ!

বৃদ্ধ অত্যন্ত উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিলেন।

আমি বলিলাম, আমি বুঝেছি সব। আপনি একটু স্থির হন।

স্থির হব বইকি! আমরা অতি ধীর স্থির বিচক্ষণ জাতি যে, আরে বাঃ, অস্থির হওয়া আমাদের ধাতেই নেই। একটু অস্থির প্রকৃতির হলে ওই জুয়াচোরটা এতদিন খুন হয়ে যেত, আর আমি এতদিন ফাঁসি যেতাম। কিন্তু আমরা রাজা-উজির মারি মুখে। সত্যি সত্যি মারি মশা আর ছারপোকা, ময়লা বিছানায় বসে বসে। আসল কাজ কিছু করতে পারি না। ইংলণ্ডের মেয়েরা কত অসতী তারই হিসেব করতে আমরা ব্যস্ত, আমরা—

এমন সময়ে ফেন উথলাইয়া জ্বলন্ত স্টোভটা হঠাৎ নিবিয়া গেল। মিণ্টু উঠিয়া সেই দিকে গেলেন।

বৃদ্ধ ভদ্রলোক সেদিকে একবার চাহিয়া আবার শুরু করিতে-ছিলেন। আমি কিন্তু উঠিয়া পড়িলাম।

মাখনবাবুদের রান্না বোধ হয় হয়ে গেছে, এইবার আমি যাই।

বাহির হইয়া আসিলাম। আসিবার সময় মিণ্টুর পানে একবার চাহিয়া দেখিলাম, কিছু দেখা গেল না। নির্বাপিত স্টোভটার সম্মুখে আমাদের দিকে পিছন করিয়া বসিয়া আছেন।

বাহিরে আসিতেই মাড়োয়ারী ভদ্রলোকটির সহিত দেখা হইল। তিনি আমার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন।

৭

অতিশয় সসঙ্কোচে এবং অত্যন্ত বিনয়ে মাড়োয়ারী ভদ্রলোক যে কথাটি আমাকে বলিলেন, তাহাতে শুধু বিস্মিতই নয়, চলচ্ছক্তিরহিত হইয়া পড়িলাম। চলিতেছিলাম, দাঁড়াইয়া পড়িতে হইল।

মাড়োয়ারীও দাঁড়াইলেন, এবং উভয় হস্ত নাড়িয়া এদিক-ওদিক চাহিতে চাহিতে যে কথা আমাকে বুঝাইতে লাগিলেন, তাহার মর্মার্থ গ্রহণ করা আমার পক্ষে অসম্ভব না হইলেও তদনুসারে কার্য করা সম্ভবপর ছিল না। সে কথা তাঁহাকে বলিতেই তিনি তৎক্ষণাৎ প্রস্তাব করিলেন যে, আমাকে মাখনবাবুকে এবং মাস্টার মহাশয়কে পান খাইবার জন্য কিছু দিতে তিনি প্রস্তুত আছেন, কার্যটি কিন্তু করাইয়া দিতে হইবে।

ব্যাপার নিম্নলিখিতরূপ—

বনশি হালুয়াই মাড়োয়ারীটির পূর্বপরিচিত। সহসা এতগুলি লোকের ক্ষুধা মিটাইবার সঙ্গতি বনশি হালুয়াইয়ের নাই। সুতরাং এই মরসুমে শেঠজীর সহিত বনশির দেখা হইয়া যাওয়াতে রামজীর কৃপাই প্রমাণিত হইতেছে। ক্যাপিটালের জন্য আর তাহাকে ভাবিতে হইবে না। প্রাক্তন বন্ধু বনশির উপকারার্থে শেঠজী শও দোশ খরচ করিতে পশ্চাদপদ নহেন, কিন্তু তৎপূর্বে তিনি আমাদের কৃপা-প্রার্থনা করিতে চাহেন। অর্থাৎ তিনি চাহেন যে, আমি মাখনবাবু এবং মাস্টার মশাই পান খাইয়া এমন একটা কাররোয়াই করি যে, ট্রেনখানা অন্তত আরও চব্বিশ ঘণ্টা যেন এখানে পড়িয়া থাকে। তাহা না থাকিলে অনর্থক এতগুলো টাকা খরচ করিয়া আটা, ঘিউ এবং তরকারির জন্য চার ক্রোশ দূরবর্তী সাধুগঞ্জের

বাজারে যাওয়ার কোনও অর্থ হয় না। কাছাকাছি যত আটা, ঘি এবং তরকারি ছিল বনশি সব কিনিয়া লইয়াছে এবং তাহাও নিঃশেষিত-প্রায়। সাধুগঞ্জে যাইবার জন্য সে শেঠজীকে পীড়াপীড়ি করিতেছে। শেঠজীরও যাইতে বিশেষ কোন আপত্তি নাই। কিন্তু তৎপূর্বে তিনি আমাদের কৃপা প্রার্থনা করেন। ইচ্ছা করিলে পান অবশ্য আমরা খাইতে পারি।

আমি জানাইলাম, আমাকে এসব কথা বলা বৃথা, কারণ আমিও একজন প্যাসেঞ্জার মাত্র। মাখনবাবু বা মাস্টার মহাশয়ের সহিত আমার ঘনিষ্ঠতা নিতান্তই আকস্মিক।

ইহা শুনিয়া তিনি মোটেই বিচলিত হইলেন না। মৃদু মৃদু মাথা নাড়িয়া অর্ধ-নিমীলিত নেত্রে তিনি যাহা বলিতে লাগিলেন, তাহার প্রতিবাদের ভাষা খুঁজিয়া পাইলাম না। তিনি এমন কোন উক্তি করিলেন না, যাহা যুক্তির দ্বারা খণ্ডন করা যায়। তিনি বলিতে লাগিলেন যে, আমার সহিত মাখনবাবু ও মাস্টার মহাশয়ের যে কোনও সম্পর্ক নাই, তাহা তিনি অবগত আছেন। সমস্ত পাক্কা খবরই তিনি সংগ্রহ করিয়াছেন, এবং ইহাই সার বুঝিয়াছেন যে, আমি যদি মাখনবাবু ও মাস্টার মহাশয়কে একটু অনুরোধ করি, তাহা হইলেই কার্যটি নিষ্পন্ন হইয়া যায়। এ কথা তিনি ভাল করিয়া জানিয়াই তবে আমার নিকট আসিয়াছেন।

সামান্য পান খাইতে আপত্তি কি?

বুঝিলাম, এখানে সত্যভাষণ নিষ্ফল। একটু কৌতুক-বোধও হইল।

বলিলাম, আচ্ছা, চেষ্টা করে দেখছি।

বলিয়া অগ্রসর হইতে লাগিলাম। একটু গিয়া দেখিলাম, তিনি পিছু পিছু আসিতেছেন। তাঁহাকে ডাকিয়া বলিলাম যে, তিনি যদি পিছু পিছু আসেন, তাহা হইলে কিন্তু কার্যসিদ্ধি হওয়া শক্ত। এ কথায় যাদুমন্ত্রের মত কাজ হইল। ভদ্রলোক তৎক্ষণাৎ আমার সঙ্গ

ছাড়িয়া দিলেন। কিন্তু যাইবার পূর্বে বলিয়া গেলেন যে, আমার দয়ার উপর ভরোসা করিয়া তিনি তাহা হইলে সাধুগঞ্জের হাট অভিমুখে যাত্রা করিতেছেন।

হাসিয়া উত্তর দিলাম, আচ্ছা।

নমস্কার।

ফিরিয়া দেখি সেই বেঁটে ভদ্রলোক। একটি লাল রঙের কোট বাহির করিয়া পরিধান করিয়াছেন। হাতেও একটি বেঁটে গোছের বর্মা-চুরুট। এত বেঁটে বর্মা-চুরুট ইতিপূর্বে দেখি নাই।

তাঁহাকে নমস্কার করিয়া আগাইয়া গেলাম।

৮

কিছুদূর গিয়াই মাখনবাবুর সহিত দেখা হইল।

তিনি আমাকে ডাকিতে আসিয়াছিলেন। দূর হইতেই তিনি চীৎকার করিয়া উঠিলেন, ভীষণ কাণ্ড মশাই, শিগগির আসুন।

কি হল ?

আরে, ওই যে মেয়েটা আপনি রেখে গেলেন, ও মুচীর মেয়ে। ভাগ্যে রান্নাঘরে ঢোকে নি, ঢুকলে তো সব হাঁড়িকুড়ি ফেলে দিতে হত। কি মুশকিল! অজ্ঞাতকুলশীলকে এইজন্যেই আশ্রয় দিতে নেই, শাস্ত্রে বলেছে। আরে, না না, আপনাকে অত কাঁচুমাচু হতে হবে না। আপনার দোষ কি? বাইরে থেকে দেখে তো কিছু বোঝবার জো নেই আজকালকার দিনে—সবাই ফিটফাট।

আমি শুনিয়া অবাক হইয়া গিয়াছিলাম।

জিজ্ঞাসা করিলাম, বুঝলেন কি করে ?

আরে, সে নিজেই বললে কিনা! এ ধারে মেয়েটি বেশ ইয়ে আছে।

নিজেই বললে ?

হ্যাঁ। বিনু খাওয়ার জন্যে খুব জিদ করতে লাগল। তখন মেয়েটি বললে যে, আমি তা হলে আপনাদের থালা-গেলাস এঁটো করব না। সব জেনে-শুনে যদি এঁটো করতে দেন, তা হলে অবশ্য আলাদা কথা। কিন্তু আমার প্রথমেই আপনাদের জানানো উচিত যে, আমি মুচীর মেয়ে। এই শুনেই তো বিনুর পিলে চমকে গেল।

বলিয়া মাখনবাবু হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। জিজ্ঞাসা করিলাম, মেয়েটি এখন আছে কোথায়? আপনাদের বাড়িতেই?

মাখনবাবু আমার পিঠ চাপড়াইয়া বলিলেন, নো নো, সার। ভয় নেই, সে নিজেই চলে গেছে।

কোথায়?

আলগোছে একখানা নিমকি খেয়ে সে ওই রাস্তাটা দিয়ে চলে গেল। বলে গেল, আমি গ্রামের ভেতরটা একটু ঘুরে আসি। জিনিসপত্র সব আমার বাসাতেই পড়ে আছে।

কি বলিব কথা খুঁজিয়া পাইতেছিলাম না।

মাখনবাবু অনর্গল বকিয়া যাইতেছিলেন।

আজ সব মাটি হয়েছিল আর একটু হলে! রামদীন ব্যাটা গ্র্যাণ্ড পাবদামাছ যোগাড় করে এনেছে, আর বিনু করেছে তার ঝাল। বিনুর হাতের ঝাল কোনদিন খান নি, খেলে আর ভুলতে পারবেন না। সিমপ্লি বিউটিফুল! ও বেটী ছুঁয়ে দিলেই সব ভেস্তে গিয়েছিল আর একটু হলে।

মাখনবাবুর বাড়ির কাছে আসিয়া পড়িয়াছিলাম।

মাখনবাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, চান করবেন তো আপনি?

ইচ্ছে তো আছে। কিন্তু এখন আবার কাপড়টা ভিজাব কি না ভাবছি।

কাপড় দিচ্ছি আমি মশাই, চান করুন। চান না করলে চলে এই গরমে?—বলিয়া মাখনবাবু ভিতরে চলিয়া গেলেন।

বাইরে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া শুনিতে পাইলাম, মাখনবাবু বলিতেছেন,

এ কি, পাবদামাছগুলো এখনও কিছু কর নি? তোমাকে বলে গেলাম ঝাল করতে—

এ বেলা থাক না আর, কালকের বাসী-মাছের টক তো আছে এক খোরা। পাবদাগুলো বরং ভেজে রাখি, ওবেলা হবে। শরীরটাও ভাল নেই, কেমন যেন জ্বর-জ্বর করছে।

না না, তা কি হয়? ভাল করে ঝাল কর মাছগুলোর। ভদ্রলোককে আমি বললাম যে, তোমার হাতের ঝাল খেলে তিনি জীবনে সে কথা ভুলতে পারবেন না।

আহা! উনুন তো নিবে গেছে। তোমার যত সব অনাছিষ্টি!

কুছপরোয়া নেই, রামদীনকে ডেকে দিচ্ছি।

আমি দেখিলাম, এ ভাবে দাঁড়াইয়া দাম্পত্যালাপ চুরি করিয়া শোনাটা ঠিক নয়। একটু সরিয়া পায়চারি করিতে লাগিলাম। মিনিট-খানেক পরেই মাখনবাবু একখানা কাপড়, গামছা এবং একটা চায়ের পেয়ালায় করিয়া খানিকটা তৈল লইয়া দর্শন দিলেন।

তেল মাখিতে মাখিতে প্রশ্ন করিলাম, কাছাকাছি পুকুর কোথাও আছে? একটা ডুব দিয়ে আসতাম তা হলে।

মাখনবাবু বলিলেন, খুব কাছাকাছি নেই। তবে একটু দূরে গেলেই, আধ মাইল-টাক, একটা ভাল পুকুর পেতে পারেন। এই যে রাস্তাটা সোজা চলে গিয়ে ওই মন্দিরটার পাশ দিয়ে বেঁকে গেছে, ওই রাস্তা। মন্দিরটার পাশ দিয়ে গিয়ে রাস্তাটা দু-দিকে ভাগ হয়ে গেছে, আপনি বাঁ-দিকেরটা ধরে সোজা চলে গেলেই পুকুর পাবেন। বেশ ভাল পুকুর। যান, তা হলে দেরি করবেন না।

মাথায় একটু তেল চাপড়াইয়া বাহির হইয়া পড়িলাম।

কিছুদূর অগ্রসর হইয়া দেখিলাম যে, রাস্তার মোড়টায় যেখান হইতে আমাকে বাঁকিয়া পুকুরের রাস্তা ধরিতে হইবে, সেইখানটায় অনেকগুলি লোক জমিয়াছে এবং একটা গোলমাল হইতেছে।

দ্রুতপদেই যাইতেছিলাম, গতিবেগ আরও একটু বাড়াইলাম।

ভিড়ের নিকটবর্তী হইয়া দেখিলাম, একটা গরুর গাড়ির একটা চাকা রাস্তার পাশের একটা গর্তে পড়িয়া গিয়াছে। শীর্ণ গরু দুইটি প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছে বটে, কিন্তু তাহাদের সাধ্যে কুলাইতেছে না।

গাড়োয়ান সে কথা শুনিবে কেন ?

তাহার হাতে লাঠি আছে, গায়ে শক্তি আছে। সে প্রাণপণে লাঠিবাজি ও গলাবাজি করিয়া লোক জমাইয়া ফেলিয়াছে। লোকও দেখিলাম জমিয়াছে অনেকগুলি, আবালবৃদ্ধবনিতা সকলেই এই পাঁজর-বাহির-করা ঘাড়ে-ঘা বলদ দুইটির বদমায়েশি সকৌতুকে নিরীক্ষণ করিতেছে। আশ্চর্য পাজি গরু! এত মার খাইতেছে, তবু জোর করিয়া টানিয়া গাড়িটাকে গর্ত হইতে তুলিবে না !

পেজোমি তোদের বের করছি, থাম।

ক্রুদ্ধ গাড়োয়ান তড়াক করিয়া লাফাইয়া পড়িল এবং গাড়ির সামনে গিয়া গরু দুইটির মুখের উপর নাকের উপর লাঠি চালাইতে লাগিল। গাড়োয়ান এবং দর্শকবৃন্দ সকলেই হিন্দু। গোজাতির উপর তাহাদের শাস্ত্রীয় অধিকার আছে। বলিবার কিছু নাই।

গাড়োয়ানের হাত ব্যথা হয় নাই। সুতরাং সে হাত চালাইতেছিল। আমি আর থাকিতে না পারিয়া বলিয়া উঠিলাম, ওহে, আর মেরো না। এস, বরং আমরা সবাই মিলে ঠেলে-ঠুলে গাড়িটাকে তুলে দিই ওপরে।

আরে, থামেন বাবু আপনি। এ গরুকে আপনি চেনেন না। দেখুন না, আমি শায়েস্তা করে তবে ছাড়ব।

বলিয়া সে আবার মার শুরু করিল।

চোড় দেও। মৎ মরো।

দেখি, সেই কাবুলিওয়ালা আসিয়া হাজির হইয়াছে।

চোড়ো।

সে তাহার বলিষ্ঠ দেহ লইয়া আগাইয়া গেল, এবং প্রথমেই গিয়া গরু দুইটাকে খুলিয়া দিল।

এই আগা সাহেব, কেয়া করতা ?—বলিয়া গাড়োয়ান প্রথমটা একটু বাধা দিবার চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু কাবুলিওয়ালার মুখে সে যে ভাব দেখিল, তাহাতে সে আর বেশি কিছু বলা নিরাপদ মনে করিল না।

তুম আদমি নেহি, জানবর হ্যায়।

বলিয়া কাবুলী গরু ছুইটিকে হাঁকাইয়া নিকটেই বাঁধিয়া রাখিয়া আসিল। এইবার সে আমাকে দেখিতে পাইল। সেলাম করিয়া সহাস্যে সে বলিল, আইয়ে বাবুসাব, থোড়া হাত লাগা দিজিয়ে।

বলিয়া সে নিজেই প্রথমে গিয়া জোয়ালে কাঁধ দিল। তাহার দেখাদেখি গাড়োয়ান এবং আরও ছুই-একজন আগাইয়া গেল। আমি এবং আর বাকি সকলে গাড়িটার পিছন হইতে ঠেলিতে লাগিলাম। অনেক ঠেলাঠেলির পর গাড়িটা পথে উঠিল। কার্য সমাধা করিয়া কাবুলিওয়ালা পস্তু ভাষায় খানিকটা কি বলিয়া গেল, বুঝিলাম না, য, ঝ এবং 'Z'-এর ঝড় বহিয়া গেল। পরিশেষে সে আমাকে আবার সেলাম করিয়া বিদায় লইল, কহিল, এ ট্রেনে সে যাইবে না, কারণ ট্রেন ছাড়িবার কোনই ঠিক নাই। উপস্থিত সে গ্রামান্তরে যাইতেছে।

কাবুলিওয়ালা চলিয়া যাইবার পর গাড়োয়ান গজর-গজর করিতে লাগিল। উঃ, শালা গোঁয়ার এসে আমার সব নয়-ছয় করে দিয়ে গেল! মাল গেছে পড়ে, একবেলা যাবে এখন কুড়োতে। এই এই, একটি দানায় কেউ হাত দিও না বলছি।

সত্যই পিছনের একটা ফাটা বস্তা হইতে কিছু ছোলা রাস্তার ধূলার উপর পড়িয়া গিয়াছিল এবং তাহার উপর হুমড়ি খাইয়া কয়েকজন পড়িয়াছিল বোধ হয় কুড়াইয়া দিবার জন্যই। কিন্তু গাড়োয়ান তাহাদের এই উপচিকীর্ষাকে আমল দিল না, দাঁত খিঁচাইয়া তাড়া করিয়া গেল।

পার্শ্ববর্তী একটি লোককে জিজ্ঞাসা করিলাম, এই আগাসাহেব এই অঞ্চলেই থাকে নাকি ?

সে বলিল যে, আগা সাহেব কোথায় যে থাকে, তাহা তাহার জানা নাই, তবে এই অঞ্চলে সে প্রায়ই ঘোরে। অনেকেই তাহার কাছে টাকা ধার লয়। অত্যন্ত চড়া সুদ। মাসিক টাকা প্রতি দুই আনা। তাহার পর নিম্নস্বরে সে জানাইয়া দিল যে, এই মঙ্গল গাড়োয়ানই তাহার নিকট টাকা ধারে। তাই তাহার কার্যে বাধা দিতে সাহস পাইল না। তাহা না হইলে—

আমার আর বেশি শুনিবার আগ্রহ ছিল না। মাখনবাবুর নির্দেশমত বাম দিকের রাস্তাটা ধরিয়া মাঠের দিকে অগ্রসর হইয়া গেলাম। কিছুদূর গিয়াই সম্মুখে একটা প্রকাণ্ড মাঠ। মাঠের বুক চিরিয়া একটি পায়ে-চলা সরু পথ বিসর্পিত রেখায় দিগন্তে মিলাইয়া গিয়াছে। কাছে দূরে কতকগুলি গরু চরিতেছে। পাশেই কয়েকটি রাখাল-বালক ডাং-গুলি খেলিতেছে। তাহাদেরই একজনকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, পুকুরটা কোন দিকে ? তাহারা বলিল যে, সোজা কিছুদূর গেলেই পাওয়া যাইবে।

উদার বিস্তীর্ণ মাঠে চলিতে চলিতে মনটা কেমন যেন উদাস হইয়া গেল। চাহিয়া দেখিলাম, মেঘলেশহীন নীলাম্বর খর-রৌদ্রে পুড়িয়া যাইতেছে। বহু ঊর্ধ্বে চক্রাকারে কতকগুলি শকুনি উড়িয়া বেড়াইতেছে। একটা গরুর পিঠে একটা কাক বসিয়া তাহার পুরাতন ক্ষতটাকে ঠোকরাইয়া রক্তাক্ত করিয়া তুলিয়াছে। আরও একটু দূরে গিয়া দেখিলাম, বিস্ফারিত-চঞ্চু শালিক-দম্পতি আমাকে দেখিয়া উড়িয়া গেল।

রৌদ্র-দগ্ধ ধূসর মাঠের উপর দিয়া হাঁটিয়া চলিয়াছি।

পুষ্করিণী কতদূরে আছে, কে জানে!

॥ ৯ ॥

স্নান সমাপন করিয়া উঠিয়াছি, এমন সময় মনে হইল, পুকুরের ওপারে সেই মেয়েটি যেন একা একা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। আমাকে

বোধ হয় দেখিতে পায় নাই। ওপারে একটা গাছের তলায় হেঁট হইয়া একমনে কি যেন কুড়াইতেছে। একটা কি যেন গাছ রহিয়াছে ওপারে।

সিক্ত কাপড়টি কাচিয়া গামছায় বাঁধিয়া ওপারের দিকে অগ্রসর হওয়া গেল। একটু দূরে গিয়াই বুঝিলাম, সেই মেয়েটিই বটে।

কাছাকাছি হইতেই মেয়েটি আমার দিকে ফিরিয়া চাহিল। আমি নমস্কার করিলাম। মেয়েটি প্রতি-নমস্কার করিয়া নীরব হইয়া রহিল। নীরবতা আমাকেই ভঙ্গ করিতে হইল। মেয়েটির বয়স কম, তাহাকে 'তুমি' বলিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু তাহার মুখে চোখে এমন কি-একটা আছে যে, বলিতে বাধে। বলিলাম, এখানে একা একা কি করছেন ?

মেয়েটি হাসিয়া বলিল, জাম কুড়োচ্ছি। কেমন সুন্দর জাম দেখুন তো !

সত্যই বেশ সুন্দর বড় বড় জাম। অনেকগুলিই সংগ্রহ করিয়াছে দেখিলাম।

খাবেন ? নিন না !

না, এখন আর খাব না। আমাকে ভাত খেতে হবে এখুনি গিয়ে। চান করতে এসেছিলাম।

মেয়েটি মুচকি মুচকি হাসিয়া বলিতে লাগিল, আমার জাতের কথা টের পেয়ে গেছেন বুঝি ? ফলের বেলায় তো দোষ নেই শুনেছি। আমার মা ঝুড়ি করে জাম, বৈঁচি, কুল ফেরি করে বেড়াতেন।

না না, সে জন্যে নয়। আমার নিজের ওসব কোন সংস্কার নেই। আচ্ছা দিন দু-চারটে, তা না হলে আপনার বিশ্বাস হবে না।

জাম চিবাইতে চিবাইতে বলিলাম, এখানে একা একা কি করবেন ? চলুন, স্টেশনের দিকেই যাওয়া যাক।

মেয়েটি চুপ করিয়া রহিল।

বাঃ, ওই দিকে একটা কি সুন্দর জাম পড়ে রয়েছে, দেখুন! থামুন, আনি ওটাকে।

পাশেই একটা কাঁটা-ঝোপের ভিতর একটা পাকা পুষ্ট জাম পড়িয়া ছিল। মেয়েটি অতি সন্তর্পণে ঝুঁকিয়া হাত বাড়াইয়া সেটিকে হস্তগত করিল।

বলিলাম, এইবার চলুন তা হলে।

আপনি যান। আমি এখন যাব না, একটু পরে আসছি।

ইহার পর আমার চলিয়া আসাই উচিত ছিল। কিন্তু মাখন-বাবুর বাড়ি হইতে মেয়েটির অকস্মাৎ অন্তর্ধানে মনে আঘাত পাইয়াছিলাম। অপ্রত্যাশিতভাবে ইহাকে আবার এখানে পাইয়া ছাড়িয়া যাইতে ইচ্ছা করিল না।

মুচীর মেয়ে? মুচীর ঘরে এমন মেয়ে হয়, তাহা আমার জানা ছিল না। মেয়েটির চোখে, মুখে এমন একটা বুদ্ধির জ্যোতি রহিয়াছে, যাহা ভদ্র মেয়েদের মুখেও খুব বেশি দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। একটু ইতস্তত করিয়া আবার বলিলাম, মাখনবাবুর স্ত্রী আপনাকে ঠিক কি বলেছেন জানি না, কিন্তু আমাদের সাধারণ হিন্দু-ঘরের প্রচলিত সংস্কার কাটিয়ে ওঠা সকলের পক্ষে সহজ নয়। এটা আপনার বোঝা উচিত।

মেয়েটি তাড়াতাড়ি প্রতিবাদের সুরে বলিল, না না, মাখন-বাবুর স্ত্রী আমাকে তেমন কিছু তো বলেন নি। বললেই বা কি করতুম? মুচীর মেয়ে হয়ে এ দেশে এর চেয়ে আর বেশি কি সম্মান আশা করতে পারি, বলুন?

আমি বলিয়া ফেলিলাম, আপনাকে দেখে সত্যি কিন্তু মুচীর মেয়ে বলে মনে হয় না। সত্যি বলছি। মেয়েটি গাছের ও-পাশটায় সরিয়া গিয়া ঝুঁকিয়া পড়িয়া বোধ হয় আর একটা জাম কুড়াইতে গেল। তাহার মুখ দেখিতে পাইতেছিলাম না। রঙিন কাপড়ের প্রান্তটুকু শুধু দেখা যাইতেছিল। আমিও ঘুরিয়া গাছের

ও-পাশটায় গেলাম। গিয়া বলিলাম, চলুন চলুন, এখানে একা নির্জন মাঠের মাঝে থাকা ঠিক নয়।

নির্জন জায়গাই আমাদের পক্ষে নিরাপদ। কেন আপনি আমাকে শুধু শুধু বিপদের মধ্যে ডেকে নিয়ে যেতে চাইছেন? প্ল্যাটফর্মের ওপর অসভ্য এক দল ছেলে বিরক্ত করছিল, তাই দেখে আপনি নিয়ে গেলেন এক ভদ্রলোকের বাসায়। সেখান থেকেও ফিরে আসতে হল। তার চেয়ে আমি এইখানে বেশ তো আছি।

আপনি বেশ আছেন তা তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু আপনাকে এখানে এ রকম ভাবে ফেলে রেখে যেতে আমার কেমন ইচ্ছে হচ্ছে না।

না না, ও কিছু নয় আপনি যান। আমার জন্যে এতটা কষ্ট স্বীকার করছেন, এর জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ।

বেশ তো, ধন্যবাদ আপনার গ্রহণ করলাম; কিন্তু এবারে চলুন। আপনাকে এই মাঠের মাঝখানে একা ফেলে রেখে আমি যাব না। আপনি যদি না যান, এই আমিও বসলাম।

বলিয়া নিকটস্থ একটি প্রস্তরখণ্ডের উপর বসিয়া পড়িলাম।

একটি জাম মুখের মধ্যে ফেলিয়া দিয়া মেয়েটি হাসিয়া বলিল, আচ্ছা একগুঁয়ে লোক তো আপনি! আমার জন্যে এতখানি কষ্ট স্বীকার আপনি কেন করছেন বলুন দেখি? হাড়ী-মুচীর কত মেয়ে রাস্তায় ঘাটে কত ভাবে তো রোজ অপমানিত হচ্ছে, সকলের জন্যে আপনি তো এতটা ব্যস্ত হন না! আমার জন্যেই বা এতটা ব্যস্ত হতে আমি দেব কেন আপনাকে? একজন নীচজাতীয়ার জন্যে ব্যস্ত হবার কারণই বা কি থাকতে পারে?

জাত আপনার যাই হোক, তাতে কিছু এসে যায় না। আপনাকে নিজেদের সমশ্রেণীর বলে মনে হচ্ছে, তার প্রধান কারণ বোধ হয় আপনি ফরসা জামা-কাপড় পরে রয়েছেন।

আর কোন কারণ নেই তো?

প্রশ্নটা শুনিয়া মনে মনে একটু লজ্জা পাইয়া গেলাম। মুখে বলিলাম, কারণ হয়তো অনেকগুলিই আছে। সবগুলো না-ই শুনলেন।

কিছুক্ষণ নীরবে কাটিল।

নিতান্তই ছাড়বেন না যখন, চলুন তবে।

চলুন।

নির্জন মাঠের ভিতর দিয়া খর-রৌদ্রে দুইজনে হাঁটিয়া চলিয়াছি। দুইজনেই নির্বাক।

নীরবতাই ভাষাময় হইয়া উঠিয়াছে।

হঠাৎ মেয়েটি আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি করেন কি ?

আমি পড়ি।

কি পড়েন ? কোথায় ?

কলকাতায়, মেডিকেল কলেজে ডাক্তারি পড়ি।

ও, সেই জন্যেই ঠিক ডায়াগনোসিস করেছেন।

মেয়েটির মুখে ইংরেজী কথা শুনিয়া চমকাইয়া উঠিলাম।

কিসের ডায়াগনোসিস ?

থাক, ও কিছু নয়।

বলিয়া একটু হাসিয়া মেয়েটি চুপ করিয়া গেল।

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটিল। কাহারও মুখে কথা নাই।

একটু পরে মেয়েটিই আবার কথা কহিল।

আপনাকে একটা কথা বলছি। কাউকে বলবেন না কিন্তু। আপনি ঠিকই ধরেছেন, আমি মুচীর মেয়ে নই, আমি কায়স্থের মেয়ে।

দাঁড়াইয়া পড়িলাম।

কায়স্থের মেয়ে ? তবে আপনি নিজেকে মুচীর মেয়ে বলে পরিচয় দিলেন কেন ?

শুনিয়া মেয়েটি একটু হাসিয়া বলিল, আপনি মহাভারত নিশ্চয়ই

পড়েছেন। কুন্তীপুত্র কর্ণ চিরকাল নিজেকে অধিরথ-সূত বলে পরিচয় দিতেন, তা জানেন তো? আমারও অবস্থা অনেকটা তাই।

কি রকম?

দাঁড়িয়ে পড়লেন কেন? চলুন না, যেতে যেতে সব বলছি।

চলিতে লাগিলাম।

মেয়েটিও বলিতে লাগিল, আমার বাপ-মায়ের নাম আমি বলব না। কোথায় আমাদের বাড়ি, তাও আপনার জানবার দরকার নেই। এইটুকু শুধু জেনে রাখুন যে, ভদ্র কায়স্থ-ঘরে আমি জন্ম-গ্রহণ করেছিলাম। আমার মা উপর্যুপরি দশটি মেয়ে প্রসব করার পর আমাকে প্রসব করেছিলেন। আমাকে প্রসব করার সঙ্গে সঙ্গেই মা অজ্ঞান হয়ে যান। সেই সুযোগে আমার ঠাকুমা তখন নাকি আঁতুড়-ঘরেই আমাকে বিলিয়ে দেন—সেই ধাত্রী হাড়িনীকে। বাবারও নাকি তাতে মত ছিল। মায়ের জ্ঞান হবার পর মাকে জানানো হয় যে, একটা মরা মেয়ে হয়েছিল এবং তা ফেলে দেওয়া হয়েছে।

বলিয়া মেয়েটি হঠাৎ চুপ করিয়া গেল।

তারপর?

তারপর আর কি! আমিই সেই একাদশ কন্যা।

এ রকম অসম্ভব কথা জীবনে কখনও শুনি নাই।

মেয়েটি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, বিশ্বাস হচ্ছে না বুঝি? না হবারই কথা। এর একটি বর্ণ কিন্তু মিথ্যে নয়। খবরের কাগজেও বেরিয়েছিল।

বলিবার কিছু ছিল না। মনে হইতেছিল, এসব প্রসঙ্গ না তুললেই বোধ হয় ভাল হইত। মনে হইতেছিল, মেয়েটিকে অবিশ্বাস করিতে পারিলে যেন বাঁচিয়া যাইতাম। কিন্তু অবিশ্বাস করিবার কোন হেতু খুঁজিয়া পাইতেছিলাম না। সমাজকে তো চিনি।

জিজ্ঞাসা করিলাম, হাড়ী আর মুচী এক নাকি? আপনি পরিচয় দিচ্ছেন মুচীর মেয়ে বলে, অথচ বলছেন আপনার ঠাকুমা হাড়িনীকে—

মেয়েটি মৃদু হাসিয়া উত্তর দিল, আপনি ভুল লাইন ধরেছেন। ডাক্তার না হয়ে উকিল হলে আপনার বেশি পশার হত। ঠাকুমা বিলিয়ে দিয়েছিলেন হাড়িনীকে, হাড়িনী আবার আমাকে বিক্রি করে দেয় এক মুচীকে। মুচীর বাড়িতেই আমি মানুষ হয়েছি, মুচী মায়ের দুধ খেয়েই আমার এই দেহ পুষ্ট।

আমার কিন্তু একটা বিষয়ে খুব আশ্চর্য লাগছে, মুচীর বাড়িতে আপনি এ রকম শিক্ষা পেলেন কি করে ?

কেন, মুচীরা মানুষ নয় নাকি ?

মেয়েটির চোখে একটা ক্রূর ব্যঙ্গ যেন ক্ষণিকের জন্য মূর্ত হইয়া উঠিল।

মানুষ নয়, তা আমি বলছি না।

এই সব মুচী-মেথররা আধমরা ভদ্রলোকদের চেয়ে ঢের বেশি জীবন্ত, তা জানেন ? তবে এটা ঠিক, মুচীর ঘরে বরাবর থাকলে আমি লেখাপড়াও শিখতে পারতাম না, কিছুই না। ভাগ্যে ক্রিশ্চান মিশনারিরা এ দেশে এসেছিল, তাই আমাদের গতি হয়েছে।

আপনি ক্রিশ্চান নাকি ?

হ্যাঁ, আমি ক্রিশ্চান। মিস মার্থা দাস এখন আমার নাম। আমি কিন্তু মুচীর মেয়ে বলেই নিজের পরিচয় দিতে ভালবাসি—বিশেষত হিন্দু-সমাজে।

মেয়েটির চোখের দৃষ্টিতে ক্ষণিকের জন্য একটা ব্যঙ্গের বিদ্যুৎ যেন চকমক করিয়া উঠিল।

আপনার বাপ-মা এখনও বেঁচে আছেন ?

না, তাঁরা মারা গেছেন শুনেছি। অন্যান্য আত্মীয়স্বজন কে কোথায় আছেন জানি না, খোঁজ নিতে প্রবৃত্তিও হয় না। ক্রিশ্চান মিশনারিদের কাছেই আমি মানুষ। তাদেরই আশ্রয়ে ছেলেবেলাটা আমার মাদ্রাজ অঞ্চলে কেটেছে, শুধু ছেলেবেলা কেন, এ দেশে আমি অল্প কয়েক দিনই হল এসেছি।

বাংলা ভুলে যান নি তো ?

আমাদের এক মিশনারি মেম সুন্দর বাংলা জানতেন। তিনিই আমাকে বাংলা পড়িয়েছিলেন খুব যত্ন করে। তিনি বলতেন, আমি বাঙালীর মেয়ে, বাংলাটা আমার ভাল করে শেখা উচিত। তাঁর কাছে আমি বাইবেলও যেমন পড়েছিলাম, রামায়ণ-মহাভারতও পড়েছিলাম। তাঁর আগ্রহ ও উৎসাহ না থাকলে আমার বাঙালীত্ব এত দিন লোপ পেয়ে যেত।

জিজ্ঞাসা করিলাম, এ দেশে আপনি ফিরে এসেছেন আবার কি সূত্রে ?

একটু দরকার আছে।

বলিয়া মেয়েটি একটু লজ্জিত হইল।

আমি আবার প্রশ্ন করিলাম, আপনি এ দেশের মেয়ে হয়ে মাদ্রাজে চলে গেলেন কি করে ?

সে অনেক কথা। আমার মুচী বাবা আর মুচী মা এ দেশে অন্ন-সংস্থান না করতে পেরে মাদ্রাজের দিকে চলে যান একটা চাকরি পেয়ে। আমার বাবা জুতোর খুব ভাল কারিগর ছিলেন। সেখানেও কিন্তু তারা সুখে থাকতে পারেন নি। আমার বাবা অত্যন্ত মাতাল ছিলেন। সে অনেক কথা। ক্রমে তাঁর চাকরিটি গেল। মহাকষ্ট। শেষকালে এক পাদ্রীর অনুগ্রহে শেষ-জীবনটা তাঁরা একটু শান্তি পেয়েছিলেন। সেই সময়েই আমরা সবাই ক্রিশ্চান হয়ে যাই।

স্টেশনের নিকটবর্তী হইয়াছিলাম।

মেয়েটি বলিল, এলাম তো আপনার সঙ্গে, এখন যাই কোথায় বলুন তো ? সকলের ব্যবহার দেখে বড় কষ্ট পাই, সত্যি বলছি। নিজেকে বাঙালী বলে পরিচয় দিতে লজ্জা করে।

আমি বলিলাম, আপনি মাখনবাবুর বাসাতেই আসুন না। তাতে কি হয়েছে ?

না না, মাপ করবেন, আমি এখন ওখানে যাব না। বিশেষত এখন আপনাদের খাওয়া-দাওয়ার সময়।

মেয়েটি সোজা প্ল্যাটফর্মের দিকেই আগাইয়া গেল। আমি মাখনবাবুর বাড়ির দিকে গেলাম। সেখানে গিয়া দেখি, মাখনবাবু নিজেই রান্না করিতে লাগিয়া গিয়াছেন। আমার সাড়া পাইয়া বাহির হইয়া আসিলেন। ধোঁয়ায় দুই চক্ষু লাল, জল পড়িতেছে। কোমরে গামছা বাঁধা, কাপড়ে হলুদের ছোপ, হাতে হাতা। আমাকে দেখিয়া বলিলেন, আপনার দেরি দেখে একটু পায়েস চড়িয়ে দিলাম। হয়ে গেল বলে, আর দেরি নেই, টেন মিনিটস।

বলিয়া আবার তিনি ধূমাচ্ছন্ন রান্নাঘরে ঢুকিয়া পড়িলেন। রান্নাঘর হইতেই চীৎকার করিয়া বলিলেন, আমার ঘরে টেবিলের ওপর আয়না-চিরুনি আছে।

ঘরে ঢুকিতেই মাখনবাবুর স্ত্রী ঘর হইতে বাহির হইয়া গেলেন। মনে হইল, তিনি যেন শুইয়া ছিলেন। শুনিলাম, তাঁহার শরীর খারাপ।

১০

আহারাদির পর দেখা গেল, বেলা তিনটা বাজিয়াছে। পাবদা-মাছের ঝাল সত্যিই ভাল হইয়াছিল। পান চিবাইতে চিবাইতে মাখনবাবু বলিলেন, আপনি একটু বসুন সার, আমি দেখে আসি, রামদীন ব্যাটা কতদূর কি করলে। আপনি শুয়ে পড়ুন না ততক্ষণ।

আমি একটু ইতস্তত করিয়া বলিলাম, আপনার স্ত্রীর খাওয়া হয়ে গেছে কি? তাঁর শরীরটা ভাল নয়, শুনলাম।

হ্যাঁ, শরীরটা তেমন সুবিধে নেই, বলছিল। মুড়ি দিয়ে তো পাশের ঘরটায় শুয়েছে। জ্বর-টর এসেছে বোধ হয়। ম্যালেরিয়ায় তো প্রায়ই ভোগে। আচ্ছা, দেখি, দাঁড়ান।—বলিয়া মাখনবাবু পাশের ঘরে চলিয়া গেলেন।

একটু পরে পাশের ঘর হইতেই আমাকে ডাকিলেন, শুনে যান।

গেলাম। গিয়া দেখি, মাখনবাবুর স্ত্রী জ্বরে অচৈতন্য হইয়া পড়িয়াছেন। কপালে হাত দিয়া দেখিলাম, গা পুড়িয়া যাইতেছে।

মাথায় জলপটি দিয়া হাওয়া করিতে বলিলাম। শশব্যস্ত হইয়া মাখনবাবু বলিলেন, সিরিয়াস বুঝছেন নাকি কিছু ?

না, জ্বরটা একটু বেশি হয়েছে কিনা, তাই ওই রকম করে রয়েছেন। কুইনিন পাওয়া যাবে এখানে ?

ছিল তো আমার কাছেই কয়েকটা গুলি। দেখি, দাঁড়ান। ও-ঘরে র‍্যাকটায় ছিল, মনে হচ্ছে।

আপনি আগে মাথায় জল দিয়ে ভাল করে বাতাস করুন। আমি দেখছি র‍্যাকটা খুঁজে। ফিরিয়া আসিয়া র‍্যাকটা খুঁজিয়া দেখিলাম। একটি খালি কুইনিনের টিউব রহিয়াছে। কুইনিন নাই।

মাখনবাবু এই শুনিয়া ও-ঘর হইতেই চীৎকার করিয়া বলিলেন, মাস্টার মশায়ের বাসায় পাওয়া সম্ভব। মাস্টার মশায়ের বাসাতে গেলাম। পাশের বাড়ি। সেখানে গিয়া দেখি, মাস্টার মশায় বাসায় নাই, স্টেশনে গিয়াছেন। একটি দশ বছরের ছেলে বাসা হইতে বাহির হইয়া এই খবরটি দিল। তাহাকে বলিলাম যে, মাখনবাবুর স্ত্রীর খুব জ্বর হয়েছে, বাড়িতে যদি কুইনিন থাকে একটু চাই। খোকা বাড়ির ভিতরে চলিয়া গেল এবং একটু পরেই কুইনিন-পিল কয়েকটা লইয়া হাজির হইল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দেখিলাম, একটি আধময়লা-কাপড়পরা আধঘোমটা-দেওয়া মহিলাও বাহির হইলেন এবং একটু দূরে আমার পিছু পিছু আসিতে লাগিলেন।

মাস্টার মশায়ের স্ত্রী বোধ হয়।

ফিরিয়া দেখি, মাথায় জল দেওয়াতে বিনুর জ্ঞান হইয়াছে। মাখনবাবু প্রাণপণ শক্তিতে হাওয়া করিয়া চলিয়াছেন।

পেলেন কুইনিন সার ?

হ্যাঁ, পেয়েছি।

মাস্টার মশায়ের হল লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, এই যে স্বয়ং লক্ষ্মীও এসে হাজির হয়ে গেছেন দেখছি। আসুন বউদি, চাঙ্গা করে তুলুন। এসব আমার কর্ম নয়।—বলিয়া মাখনবাবু উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং মাস্টার মশায়ের স্ত্রী বিনুর শিয়রে গিয়া বসিলেন।

বাস নিশ্চিন্দি। এইবার দেখা যাক, রামদীন ব্যাটা কতদূর কি করলে! হ্যাঁ, কুইনিনটা কি এখনই দিয়ে দিতে হবে?

দিলেই ভাল হয়, ছুটো পিল দিন।

আমার হাত হইতে কুইনিনের পিলগুলি লইয়া মাস্টার মশায়ের স্ত্রীর হাতে সেগুলি দিয়া মাখনবাবু বলিলেন, শুনলেন তো? ছুটো পিল দিয়ে দিন এখুনি, জাস্ট নাউ। বুঝলেন?

মাস্টার মশায়ের স্ত্রী ঘাড় কাত করিয়া জানাইলেন যে, তিনি বুঝিয়াছেন; এবং ফিসফিস করিয়া বলিলেন যে, আমরা বাহিরে গেলেই তিনি পিল ছুইটি খাওয়াইয়া দিবেন।

মাখনবাবু আমাকে বলিলেন, চলুন সার, তবে বাইরে যাই। বউদি এসে গেছেন যখন, তখন আর কিছু দেখবার দরকার নেই। কিছুক্ষণ পরে চাই কি উনি চা-ও খাইয়ে দেবেন আমাদের।

ফিসফিস করিয়া বউদি আবার বলিলেন, ও-বাড়িতে যান না, চায়ের জল বসানোই আছে। খোকনকে বললেই সে সব ঠিক করে দেবে।

সস্মিত দৃষ্টিতে মাখনবাবু আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, শুনলেন তো?

চলুন আমরা বাইরে যাই।—বলিয়া আমি মাখনবাবুকে টানিয়া বাহিরে লইয়া আসিলাম। মাখনবাবু বলিলেন, রামদীন ব্যাটা কতদূর কি করলে, একবার দেখতে হচ্ছে। ব্যাটাকে একটা টাকা দিয়েছি তো অনেকক্ষণ হল।

কেন?

ড্রাইভার ব্যাটাকে যদি ফুসলে-ফাসলে মদ খাওয়াতে পারে।

হঠাৎ আমার মনের ভিতরটাতে কে যেন একটা মোচড় দিয়া গেল। এই চক্রান্তে সত্যই যদি ড্রাইভারের চাকরিটা যায়! আমি অনর্থক ইহার মধ্যে নিজেকে জড়াইলাম কেন? নিতান্ত নিরীহ একটা লোককে ষড়যন্ত্র করিয়া এমন ভাবে—

কি ভাবছেন সার?

কিছু না।

এমন সময় দূরে দেখা গেল, সেই মাড়োয়ারী ভদ্রলোক দাঁড়াইয়া আছেন। আমাদের দেখিয়া আবার সেলাম করিলেন। ইঁহার কথা ভুলিয়া গিয়াছিলাম। সব মনে পড়িয়া গেল। মাখনবাবুকে বলিলাম, আবার এক ফ্যাসাদে পড়েছি মশাই।

কি ফ্যাসাদ?

আনুপূর্বিক সমস্ত ঘটনা মাখনবাবুকে বলিলাম। মাখনবাবু নির্বিকারচিত্তে বলিলেন, কত টাকা দিতে চায়?

সে দরদস্তুর তো করি নি। টাকা নেবেন নাকি সত্যি?

সারটেনলি। টাকা পেলে ছাড়তে আছে?

বলিয়া মাখনবাবু হাতছানি দিয়া তাঁহাকে ডাকিলেন। মাড়োয়ারী ভদ্রলোকও ইহারই জন্য ওৎ পাতিয়া ছিলেন বলিয়া মনে হইল। আমি বলিলাম, আপনারা তা হলে কথাবার্তা চালান। আমি প্ল্যাটফর্মটার খবর নিয়ে আসি একবার। সেই মেয়েটি আবার ফিরে এসেছে, জানেন তো?

কোন্ মেয়েটি? সেই মুচীর মেয়ে?

হ্যাঁ।

কেমন করে জানলেন আপনি?

পুকুর-ধারে ছিল। আমার সঙ্গেই ফিরে এসেছে, প্ল্যাটফর্মের দিকে গেছে। খবর নিয়ে আসি একবার।

মুচীর মেয়েকে নিয়ে আর অত বেশি মাখামাখি করবেন না। ওসব টেনডেনসি ছাড়ুন। মরুকগে ও।

না, মাখামাখি করব কেন? আপনি শেঠজীর সঙ্গে ততক্ষণ আলাপ করুন না। আমি এখনই ফিরে আসছি।

শেঠজী আসিয়া পড়িয়াছিলেন। মাখনবাবু তাঁহার সঙ্গে কথাবার্তা কহিতে লাগিলেন। আমি প্ল্যাটফর্মের উদ্দেশ্যে বাহির হইয়া পড়িলাম।

প্ল্যাটফর্মে ঢুকিয়া একটা হাসির হররা শুনিতে পাইলাম। দেখিলাম, সেই ছোকরার দল হাসিতেছে। হাসির উপকরণ এবারে তাহারা নিজেরাই সংগ্রহ করিয়াছে। তাহাদের নিজেদের মধ্যেই একজন দেখিলাম ঘোমটা দিয়া বউ সাজিয়া বসিয়া আছে। তাহার সম্মুখে একটি ছোকরা অঙ্গভঙ্গী সহকারে গাহিতেছে—

কাদের কূলের বউ গো তুমি,
কাদের কূলের বউ?

বাকি সকলে হো-হো করিয়া হাসিতেছে।

একটু দূরে একটা গাছতলায় দেখিলাম, সেই ইণ্ডিয়ান ক্রিশ্চান দম্পতি বেশ গুছাইয়া বসিয়াছেন। একটা বেতের বাক্স হইতে খাদ্যদ্রব্যাদি বাহির হইয়াছে। পাউরুটি, মাখন এবং একটা জ্যামের শিশি—দূর হইতেই বেশ দেখা যাইতেছে। লাল চোঙওয়ালা একটা সস্তা গ্রামোফোনে একটা বিলাতী প্রচলিত গৎ বাজাইয়া তাঁহারা ভোজন-ব্যাপারে ইউরোপীয় আবহাওয়া সৃষ্টিরও প্রয়াস পাইয়াছেন দেখিলাম। কতকগুলি অর্ধনগ্ন গ্রাম্যবালক-বালিকা কিছুদূরে দলবদ্ধভাবে দাঁড়াইয়া এই ক্রিশ্চান দম্পতির সঙ্গীতময় ভোজনবিলাস সবিস্ময়ে নিরীক্ষণ করিতেছে।

সেই মেয়েটিও সেখানে গিয়া হাজির হইয়াছে দেখিলাম। ধর্মগত মিল থাকাতে আলাপ-পরিচয়ে বেশ একটা হৃদ্যতা ফুটিয়া উঠিয়াছে বলিয়া মনে হইল।

উহাদের নিকট যাওয়া সঙ্গত হইবে কি না চিন্তা করিতেছি,

এমন সময় মাখনবাবু উর্ধ্বশ্বাসে আসিয়া বলিলেন, একটু তাড়াতাড়ি আসুন সার্। বড় বিপদে পড়েছি, রামদীন ব্যাটাকে পাওয়া যাচ্ছে না। অথচ আমাদের এনকোয়ারিং-অফিসার এখুনি আসছেন ট্রলি করে। ড্রাইভারটারও পাত্তা নেই।

আমি তার কি করব?

আহা, আসুন না আমার সঙ্গে। ওদিকে চা-ও হয়ে গেছে। নিন, একটা সিগ্রেট নিন। মাথা ঠিক রাখুন এ সময়ে। আপনি ঘাবড়ালেই তো গেছি আমরা।—বলিয়া তিনি ফস করিয়া একটা দিয়াশলাই জ্বালাইয়া ধরিলেন, আসুন সার্, চলুন, নো টাইম টু লুজ।

মহা বিপদে পড়িয়াছি এ ভদ্রলোককে লইয়া। অথচ এড়াইবারও উপায় নাই।

গেলাম সঙ্গে।

বাহিরে আসিতেই কনুই দিয়া আমাকে একটা খোঁচা দিয়া মাখনবাবু সহাস্যে বলিলেন, টোপ গিলিতং।

তার মানে?

তার মানে শ্রীমান ড্রাইভারচন্দ্র খুব টেনে বেহুঁস হয়ে পড়ে আছেন ওই ওদিককার গুমটির ধারে। আপনার প্ল্যান কোয়াইট সাকসেসফুল।

রামদীন কোথায়?

চা করছে, আসুন।

আপনার স্ত্রী কেমন আছেন?

বিল্কু অল রাইট। বললাম তো, বউদি যখন গেছেন, তখন নো ফিয়ার।

নিজেকে আবার কেমন যেন অপরাধী মনে হইতে লাগিল। ড্রাইভারটার যদি চাকরি যায়! এ কি ষড়যন্ত্রের মধ্যে নিজেকে অনর্থক জড়াইলাম!

ওদিকে নয় সার্, এদিকে আসুন। চা হচ্ছে মাস্টারমশায়ের বাসায়।

উভয়ে মাস্টার মহাশয়ের বাসাতে প্রবেশ করিলাম।

১১

প্ল্যাটফর্মের কোলাহলটা যেন হঠাৎ বাড়িয়া উঠিল।

সায়েব এল বোধ হয়।

মাখনবাবু উদ্বিগ্ন মুখে উঠিয়া পড়িলেন।

মাস্টার মহাশয় উর্ধ্বনেত্র হইয়া চক্ষু মিটমিট করিতে লাগিলেন।

আমি বলিলাম, আপনারা বসুন। আমি দেখে আসি চট করে, ব্যাপারটা কি?

মাখনবাবু বলিলেন, যাবার সময় আপনি রামদীনটাকে একটু পাঠিয়ে দিয়ে যান তো। একটু শিখিয়ে-পড়িয়ে রাখা দরকার ব্যাটাকে।

আমি বাহিরে আসিয়া দেখিলাম, রামদীন দাঁড়াইয়া আছে। তাহাকে ভিতরে যাইতে বলিয়া সোজা প্ল্যাটফর্মের দিকে অগ্রসর হইয়া গেলাম। প্ল্যাটফর্মে গিয়া যাহা দেখিলাম, তাহাতে আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটিল।

দেখিলাম, সেই ক্রিশ্চান মেয়েটিকে ঘিরিয়া আবার সেই অশিষ্ট যুবকদল মহাকলরব শুরু করিয়াছে। আমি আগাইয়া আসিয়া বলিলাম, আবার আপনারা ওঁকে অপমান করছেন?

সেই ট্যারা ছোকরাটি ছিল।

সে আগাইয়া আসিয়া বলিল, কিছু অপমান করি নি মশাই। ভিড়ে যেতে যেতে ওঁর গায়ে আমার একটু গা ঠেকে গিয়েছিল। উনি হঠাৎ আমাকে গালাগালি দিয়ে বলিলেন, ইডিয়ট! আমি বরং ভালভাবে বললাম, দয়াময়ী, রাগ করছ কেন, দয়া কর, দয়া পরম ধর্ম।

বলিয়া ছোকরা ফিক করিয়া একটু হাসিয়া ফেলিল। ছোকরার মুখের হাসির উপরই একটি প্রচণ্ড চড় বসাইয়া দিলাম। আর একটি ছোকরা প্রতিবাদ করিতে যাইতেছিল, তাহাকেও এক ঘা দিলাম।

ছি-ছি, মারামারি করবেন না ওসব ছোটলোকদের সঙ্গে। আসুন, বাইরে আসুন।

আমার রুদ্রমূর্তি দেখিয়া ভীরুর দল ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িয়াছিল। আরও নানা লোক আসিয়া ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া নানারূপ প্রশ্নে আমাকে বিব্রত করিয়া তুলিল। আমি এদিক-ওদিক চাহিয়া মেয়েটিকে দেখিতে পাইলাম না। একটু দূরে দেখিলাম, লাল কোট পরিয়া সেই বেঁটে ভদ্রলোকটি আমার দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া আরও দুই-তিনজন লোককে কি যেন বলিতেছেন।

আমার সহিত চোখাচোখি হইতেই তিনি চুপ করিয়া গেলেন এবং মুখে একটা হাসি টানিয়া আনিয়া বলিলেন, নমস্কার দারোগাবাবু। এবং সরিয়া দাঁড়াইলেন।

মেয়েটি কোন দিকে গেল দেখেছেন ?

তিনি অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া দেখাইয়া দিলেন যে, মেয়েটি গেট দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে, এবং তাহার পর আমার দিকে পিছন ফিরিয়া বিপরীত দিকে অগ্রসর হইয়া গেলেন।

পুলিসের লোকের সহিত বেশি বাক্যালাপ করাটা তিনি নিরাপদ বিবেচনা করিলেন না বোধ হয়।

বাহিরে গেলাম।

বাহিরে গিয়াই মাখনবাবুর সঙ্গে দেখা।

সাহেব এল নাকি ?

না। সেই মেয়েটি কোথা গেল, দেখেছেন ?

হ্যাঁ, সে তো আমার বাসায় গিয়ে ঢুকল ফের। আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম মশাই, কিছু বলতে পারলাম না। মহা মুশকিল হল দেখছি, জাত-জন্ম কিছু রইল না।

এমন সময় হঠাৎ তিনজন সাহেব আসিয়া হাজির। একজনের কাঁধে রক্তাক্ত একটা বুড়ী।

এ কি কাণ্ড!

সাহেবেরা প্রথমেই আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, নিকটে কোন ডাক্তার আছে কি না? কাছাকাছি হাসপাতালই বা কতদূর?

মাখনবাবু শশব্যস্ত হইয়া মাস্টার মহাশয়কে ডাকিয়া দিলেন। সাহেবের নাম শুনিয়া মাস্টার মহাশয় তাড়াতাড়ি টুপিটা মাথায় দিয়া হাত কচলাইতে কচলাইতে আসিয়া হাজির হইলেন। আমি একটু দূরে দাঁড়াইয়া ইঁহাদের কথাবার্তা শুনিতে লাগিলাম।

সাহেবেরা তিনজন সেই ফার্স্ট ক্লাসের যাত্রী। নিকটবর্তী ঝিলে পক্ষী-শিকার করিতে গিয়াছিলেন। এই ঘুঁটে-কুড়ানী বুড়িটা ঝিলের ধারে গোবর কুড়াইয়া বেড়াইতেছিল। এক সাহেবের গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া বুড়ীর গায়ে লাগিয়াছে।

সাহেবেরা মহা ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছেন।

স্টেশন-মাস্টারকে বলিতেছেন শুনিলাম, যত টাকাই খরচ হউক না কেন, বুড়ীকে বাঁচাইবার চেষ্টা করিতে হইবে।

হাসপাতাল কতদূরে?

মাস্টার মহাশয় জানাইলেন, প্রায় মাইল চারেক দূরে একটি সরকারী হাসপাতাল আছে।

সাহেবেরা আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, কাছাকাছি আর কোন মেডিকেল হেলপ পাওয়া সম্ভব কি না? আর কোন ডাক্তার নাই?

মাখনবাবু হঠাৎ আগাইয়া আসিয়া বলিলেন, হিয়ার ইজ ওয়ান মেডিকেল কলেজ স্টুডেণ্ট সার্, ভেরি এক্সপার্ট।

আমাকে আগাইয়া আসিতে হইল।

বুড়ীকে পরীক্ষা করিয়া বুঝিলাম যে, যদিও আঘাত গুরুতর, কিন্তু হাসপাতালে লইয়া গিয়া উপযুক্ত চিকিৎসাদি করিলে বাঁচিয়া

যাওয়াও অসম্ভব নহে। বাহিরে ইহার চিকিৎসা হইতে পারে না, বিশেষত এ স্থানে।

এই কথা শুনিবামাত্র একটি কুলিকে সঙ্গে লইয়া সাহেব তিনজন চার মাইল দূরবর্তী হাসপাতাল অভিমুখে পদব্রজে রওনা হইয়া গেলেন। পালকি কিংবা ডুলি না পাওয়া যাওয়াতে বুড়ীকে কাঁধে করিয়াই তুলিয়া লইয়া গেলেন।

তাঁহারা চলিয়া গেলে মাখনবাবু বলিলেন, দেখলেন শালার ব্যাটাদের কাণ্ড!

মাস্টার মহাশয় ঊর্ধ্বনেত্র মিটমিট করিয়া বলিলেন, পুলিশ-কেস হলে আবার সাক্ষী-ফাক্ষি দিতে না হয়! এ এক ভারি হাঙ্গামায় পড়া গেল দেখছি।

এমন সময় স্টেশন-প্ল্যাটফর্মে আবার একটা কলরব শোনা গেল। রামদীন ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া আসিয়া খবর দিল যে, ট্রলি করিয়া দুইজন সাহেব আসিয়াছেন।

মাস্টার মহাশয়ের টুপি পরাই ছিল। তিনি সোজা চলিয়া গেলেন।

মাখনবাবুও পিছু পিছু গেলেন।

আমিও গেলাম।

একজন খাঁটি শ্বেতাঙ্গ, আর একজন ব্রাউন রঙের। তবে ব্রাউন রঙের হইলেও তিনি একজন পদস্থ অফিসার, তাহা মাস্টার মহাশয় ও মাখনবাবুর ব্যবহারে বোঝা গেল।

মাস্টার মহাশয় দেখিলাম হাত কচলাইতেছেন ও ভুল ইংরেজীতে বলিতেছেন যে, দোষ ড্রাইভারের। সে লোকটা মাতাল অবস্থায় সিগন্যাল অগ্রাহ্য করিয়া ফুল-ফোর্সে স্টেশনে ট্রেন ইন করাইয়াছিল।

শ্বেতাঙ্গ সাহেবটি মুখ হইতে পাইপ নামাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন যাত্রী জখম হইয়াছে কি না? হয় নাই শুনিয়া নিশ্চিন্ত মনে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, ড্রাইভার কোথায়?

মাখনবাবু বলিলেন, সে মত্ত অবস্থায় গুমটির ধারের রাস্তায় শুইয়া আছে। ট্রেন ডিরেল্ড হইবার পর সে ক্রমাগত মদ খাইতেছে।

সাহেব বলিলেন, লেট আস সি হিম।

সকলে অগ্রসর হইলাম।

গেট হইতে বাহির হইয়া কিছুদূর অগ্রসর হইয়াছি, এমন সময়ে মাখনবাবুর বাসা হইতে সেই ক্রিশ্চান মেয়েটি বাহির হইয়া সানন্দে বলিয়া উঠিল, হ্যালো পল, ইউ আর হিয়ার! বাই গড! হ্যাভ ইউ বিন ট্র্যান্সফারড?

মার্থা! হোয়াট ব্রিংস ইউ হিয়ার?

আই ওয়াজ অন মাই ওয়ে টু ইউ।

ব্রাউন রঙের সাহেবটি সবিস্ময়ে দাঁড়াইয়া পড়িলেন।

মার্থা তখন আসিয়া সোচ্ছ্বাসে বর্ণনা করিতে লাগিল যে, তাঁহাকে আশ্চর্য করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে কোন খবর না দিয়াই তাঁহার কাছে যাইতেছিল। হঠাৎ পথে এই বিপদ।

তাহার পর তাহারা গল্প করিতে করিতে আগাইয়া গেল। তাহাদের কথাবার্তা আর শুনিতে পাইলাম না। শ্বেতাঙ্গ সাহেবটিও দেখিলাম সহাস্য মুখে হ্যাটটা একটু খুলিয়া মার্থাকে অভিবাদন করিলেন।

মাখনবাবু চুপি চুপি আমার কানে কানে বলিলেন, সারলে দেখছি সার্! ওই সাহেব হচ্ছে পি. ডব্লিউ. আই.। এ মেয়েটার সঙ্গে বেশ ভাব আছে দেখছি। মাগী আমাদের নামে না লাগায়!

আমি কোন উত্তর দিলাম না। আমার কিছু ভাল লাগিতেছিল না।

গুমটির নিকট পৌঁছিয়া দেখা গেল, ড্রাইভার রাস্তার ধারে শুইয়া আছে। পাশে একটা মদের বোতলও রহিয়াছে। তাহার একজন অর্ধমত্ত সঙ্গী তাহার নিকট বসিয়া তাহাকে উঠাইবার বৃথা চেষ্টা করিতেছে। ড্রাইভার কিন্তু বেহুঁশ। শুধু বিড়বিড় করিয়া কি বকিতেছে।

কাছেই একটা ঝোপের ধারে দেখলাম, সেই ফুটফুটে বেণীদোলানো মেয়েটি সন্তর্পণে পা বাড়াইয়া একটা প্রজাপতি ধরিবার চেষ্টা করিতেছে। সহসা এতগুলি লোকের সমাগমে সে অন্যমনস্ক হইয়া গেল, প্রজাপতি উড়িয়া গেল।

সাহেবেরা গিয়া ড্রাইভারকে দেখিতে লাগিলেন। ভাঙা হিন্দীতে শ্বেতাঙ্গ সাহেবটি ড্রাইভারের সঙ্গীটিকে প্রশ্ন করিলেন, ড্রাইভার কখন হইতে মদ খাইতেছে? সে সত্য কথাই বলিল। সে বলিল, এখানে ট্রেন ডিরেল্ড হইবার পর তবে তাহারা মদ খাইয়াছে। স্টেশনের পয়েণ্টসম্যান রামদীন সাক্ষী আছে।

স্টেশন-মাস্টার চক্ষু মিটমিট করিয়া ইংরেজীতে বলিলেন, অল ফলস।

অবিশ্বাস করিবার কিছু ছিল না।

হঠাৎ সেই ব্রাউন রঙের সাহেবটি মাখনবাবু ও আমার দিকে ফিরিয়া ইংরেজীতে বলিলেন, এই বিপদে আমরা তাঁহার বাগদত্তা পত্নীর প্রতি যে সদ্ব্যবহার করিয়াছি, তাহার জন্য তিনি আমাদের নিকট কৃতজ্ঞ।

ওই মেয়েটি ইঁহার বাগদত্তা পত্নী!

মাখনবাবুর চক্ষু কপালে উঠিল।

তিনি ও মাস্টার মহাশয় উভয়েই নত হইয়া এখন তাহাকে সেলাম করিলেন।

সাহেবেরা কার্য শেষ করিয়া আবার স্টেশনের দিকে ফিরিলেন। আমার আর স্টেশনে ফিরিতে ইচ্ছা করিতেছিল না। সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছিল। মাখনবাবুকে বলিলাম, আমি একটু বেড়িয়ে আসি। আপনারা যান।

সকলে চলিয়া গেলে আমি ড্রাইভারের সেই মুসলমান সঙ্গীটিকে জিজ্ঞাসা করিলাম, ওই সবুজ ওড়না-পড়া মেয়েটি কাহার? মেয়েটি দেখিলাম, একটু দূরে আবার প্রজাপতি ধরিবার চেষ্টা করিতেছে।

লোকটি বলিল, মেয়েটি এই ড্রাইভারের মা-মরা মেয়ে। বাপ যখন যেখানে যায়, প্রায়ই মেয়েটিকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যায়।

সংবাদটা শুনিয়া কেমন যেন হইয়া গেলাম। অজ্ঞাতসারে ইহার কি সর্বনাশটাই করিয়াছি! একবার ভাবিলাম, সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া দিই। কিন্তু মাখনবাবুর কথা স্মরণ করিয়া তাহা পারিলাম না।

অন্যমনস্কভাবে মাঠের দিকে অগ্রসর হইলাম।

১২

কতক্ষণ হাঁটিয়াছিলাম, খেয়াল ছিল না। সন্ধ্যা অনেকক্ষণ উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। হঠাৎ এক নিস্তব্ধ প্রান্তরের মধ্যে আসিয়া পড়িলাম। জটিল শাখা-প্রশাখাময় বিরাট কি একটা গাছ দূরে দাঁড়াইয়াছিল। কৃষ্ণপক্ষের চন্দ্র তাহার আড়ালে উঠিতেছে, দেখিতে পাইলাম। কোথাও একটু বসিতে পাইলে যেন বাঁচিতাম।

পা দুইটা ব্যথা করিতেছিল।

ধীরে ধীরে গাছটার দিকেই অগ্রসর হইলাম। গাছের নিকটবর্তী হইতেই তীক্ষ্ণ তীব্র স্বরে অন্ধকারকে চিরিয়া একটা শকুনি ডাকিয়া উঠিল। ডানার ঝটপট শুনিয়া বুঝিলাম, এই গাছেই বোধ হয় শকুনিদের বাসা আছে।

দূরে কোথায় একটা ফেউ ডাকিতে লাগিল। গাছটার ও-পাশে গিয়া দেখি, একটা উঁচুমত ঢিবি রহিয়াছে। তাহাতেই উঠিয়া বসিলাম। উঠিয়া বসিয়া পূর্ব দিগন্তে চাহিয়া রহিলাম। চাঁদ উঠিতেছে। আকাশে মেঘের চিহ্ন নাই। ফাঁকা মাঠে ঝিরঝির করিয়া সুন্দর বাতাস বহিতেছে।

একটু ভয়-ভয় করিতেছিল। তবু কিন্তু ভালই লাগিতেছিল। চাঁদ আর একটু উঠিলে দেখিতে পাইলাম, একটু দূরে একটা ছোট নদীও রহিয়াছে। ঢিবি হইতে নামিয়া সেই দিকেই গেলাম। শীর্ণ-

স্রোতা নদীটির উপর ক্ষীণ জ্যোৎস্না পড়িয়া সেই নির্জন প্রান্তরে এমন একটা শোভার সৃষ্টি হইয়াছিল, যাহা দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়া গেলাম।

সেই নদীর ধারেই একটি ফাঁকা জায়গা বাছিয়া বসিলাম। হঠাৎ সমস্ত আকাশ উদ্ভাসিত করিয়া প্রকাণ্ড উল্কাপাত হইয়া গেল। সমস্ত মাঠটা আলোকিত হইয়া উঠিল।

সমস্ত দিনের অবসাদে শরীর-মন ক্লান্ত। মাঠের মাঝে হাওয়াটুকু বেশ মিষ্ট লাগিতেছিল। লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িলাম।

ভাবিলাম, একটু বিশ্রাম করিয়া স্টেশনের দিকে যাওয়া যাইবে।

নিদ্রাভঙ্গ হইলে চাহিয়া দেখি, একটু দূরে দাউদাউ করিয়া আগুন জ্বলিতেছে। কাছেই কতকগুলি লোক বসিয়া আছে।

তাড়াতাড়ি উঠিয়া পড়িলাম।

লোকগুলির নিকটে গেলাম।

ইহারা মড়া পোড়াইতেছে। যাহা জ্বলিতেছে, তাহা চিতা। আমি এতক্ষণ শ্মশানে শুইয়াছিলাম।

রাত্রি কত হইয়াছে?

একজন বলিল, বারোটা হবে।

বারোটা?

স্টেশনের দিকে তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইলাম।

স্টেশনে পৌঁছিয়া দেখি, চারিদিকে নিস্তব্ধ। মাখনবাবু বসিয়া টেলিগ্রাফ-যন্ত্রে টক্কা-টরে করিতেছেন। সমস্ত যাত্রীদের লইয়া ট্রেন চলিয়া গিয়াছে।

একজনও নাই।

আমি নির্বাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। যাহাদের লইয়া সমস্ত দিন এত উৎসাহে এত আগ্রহে এত সত্যমিথ্যার জাল বুনিতেছিলাম, তাহারা অতর্কিতে এমন করিয়া ফেলিয়া গেল। আর জীবনে দেখা হইবে না।

ধীরে ধীরে মাখনবাবুর কাছে গেলাম।

মাখনবাবু বলিলেন, অনেকক্ষণ আপনি বেড়ালেন তো সার্। আপনারও ট্রেন এল বলে। সিগন্যাল দিয়েছে। আপনার জন্য রুটি করিয়ে রেখেছি। খাবেন কি? সময় কিন্তু নেই।

থাক, দরকার নেই।

আচ্ছা, ওয়েট এ মিনিট, আপনার সঙ্গে খাবারগুলো বেঁধে দিই না হয়।

শশব্যস্ত হইয়া মাখনবাবু চলিয়া গেলেন। আমি এক নির্জন প্ল্যাটফর্মে সিগন্যালটার দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম।

ওই ট্রেন আসিতেছে। একটু পরেই আমিও আর এখানে থাকিব না।

বৈতরণী-তীরে

উৎসর্গ

পূজনীয়
পিতৃদেবের শ্রীচরণে

ইহা শুধু ভূতের গল্প নহে—বর্তমানেরও গল্প, এবং খুব সম্ভব ভবিষ্যতেরও

ভাগলপুর
১৪ই অগ্রহায়ণ, ১৩৪৩

"বনফুল"

মড়া কথা কহিতেছে।

আশেপাশে মড়া ঘুরিতেছে।

বই হাতে করিয়া একা জাগিয়া আছি। কিছুতেই ঘুমাইতে পারি না। আমি নিজে ডাক্তার, ঘুমের কোন ঔষধ বাকি রাখি নাই। নরম বিছানা শক্ত বিছানা নানা রকম করিয়া দেখিয়াছি, কিছুতেই কিছু হয় না। ঘর অন্ধকার করিয়া রাখিলেও যাহা ফল, আলো জ্বালিয়া রাখিলেও তাহাই। আলোর রঙ বদলাইয়াও দেখিয়াছি, পয়সা খরচ হয় মাত্র, ঘুম হয় না। চোখ বুজিয়া কতদিন এক হইতে এক হাজার পর্যন্ত গণনা করিয়াছি, কল্পনা করিয়াছি, পাহাড় বাহিয়া মেঘের পাল নামিতেছে—এক, দুই, তিন, চার···দশ··· বিশ···শত···সহস্র। ঘুম আসে না। কিছুতেই ঘুমাইতে পারি না।

অন্ধকার দুর্যোগের রাত্রে বই হাতে করিয়া জাগিয়া আছি। আশেপাশে মড়া ঘুরিতেছে। ইহাদের এককালে আমি চিনিতাম, প্রত্যেককে আমি চিরিয়াছি। সরকারী চাকুরির দৈনন্দিন কর্তব্য, রোজ মড়া চিরিতে হয়। অনেক চিরিয়াছি। তাহাদেরই কয়েকজন আজ আমার চতুর্দিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে, কথা কহিতেছে। সকলেই নিজের কাহিনী শুনাইতে ব্যগ্র।

"তুমি তো জান, আমি আফিং খেয়ে মরেছিলাম। আমার পেট চিরে সে খবর তুমি বার করেছিলে—ছুরি দিয়ে চিরে। উঃ, কি ধারালো তোমাদের ছুরিগুলো—কি চকচকে! কিন্তু একটা খবর তুমি পাও নি ডাক্তারবাবু। আফিং খাওয়ার আগেই আমি মরে-ছিলাম। সে খবর আমার পেটে ছিল না—মনে ছিল। মনকে তো আর ছুরি দিয়ে চেরা যায় না। যতই ধারালো হোক না কেন তোমাদের ছুরি।"

একটি উদ্ভিন্নযৌবনা ষোড়শী সুন্দরী। মুখখানি এখনও কোমল। অমন সুন্দর ধপধপে গায়ের রঙ অহিফেনের বিষে নীলবর্ণ হইয়া গিয়াছে। মনে হইতেছে, যেন একটি অর্ধবিকশিত নীলপদ্ম। একটু থামিয়া মেয়েটি আবার বলিতে লাগিল—"হ্যাঁ, আমি আগেই মরেছিলাম। মৃত্যু কত রকম হয় জান? তোমরা তো মরণ নিয়ে দিনরাত কারবার কর। আত্মা অমর বলে জান তো? সেটা মিছে কথা। আত্মাও মরে। তোমাদের চারপাশে কত যে জীবন্ত শব রোজ ঘুরে বেড়ায়, তা যদি টের পেতে! কেউ হয়তো তোমার অন্তরঙ্গ বন্ধু, কেউ হয়তো পিতা, কেউ স্ত্রী। অনেকের আত্মা মরে যায়, তোমরা বুঝতে পার না। তাদের মৃত আত্মার দুর্গন্ধ তাদের কথায় ব্যবহারে চিন্তায় সকলকে অতিষ্ঠ করে তোলে, তবু তোমরা বুঝতে পার না যে, তারা মড়া। তবু তাদের তোমরা পুড়িয়ে ফেল না। আমারও আত্মা মরে গিয়েছিল।"

বলিয়া একটু হাসিয়া মেয়েটি বলিল—"তুমি ভাবছ, প্রেমের গল্প সুরু হল এবার। প্রেমের নয়—মৃত্যুর। সে প্রণয়ী নয়, যম। কিন্তু কি মনোহর সে! তার দোষও ছিল না তত। আমিই তাকে ফাঁদ পেতে ধরেছিলাম। নিজের মৃত্যুকে নিজে ডেকে এনেছিলাম। সাপুড়ে যেমন সাপকে নিয়ে খেলা করে, আমিও ঠিক তাকে তেমনিই খেলিয়েছি। আমার বাঁশীর তানে মুগ্ধ হয়ে সেই চিক্কণ চিত্রিত বিষধর কত খেলাই না খেলেছে ফণা বিস্তার করে! নিজের কৃতিত্বে নিজেই মুগ্ধ হয়ে যেতাম। কিন্তু একদিন সে দংশন করলে—করাল সে দংশন। মারা গেলাম।" বলিয়া সে চুপ করিল।

আমার টেবিল-ল্যাম্পটাকে প্রদক্ষিণ করিয়া ছোট বড় নানা রঙের পোকা ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল। হঠাৎ একটা বড় রঙিন ফড়িং আসিয়া ডানা ঝটপট করিয়া বাতিটার কাচের উপর আছড়াইয়া পড়িল। দুইজনে নীরবে সেই দিকে চাহিয়া রহিলাম।

আবার সে ধীরে ধীরে বলিল—"আমার সে মৃত্যুর খবর তুমি পাও নি ডাক্তারবাবু। সে শোচনীয় মৃত্যু। জননী হয়ে সন্তান-হত্যা করেছিলাম। হেসো না। আমি একা হত্যা করি নি। সমাজ শিশুটার পা ধরেছিল, শাস্ত্র হাত ধরেছিল, আমি তার টুঁটি চেপে ধরেছিলাম। রুদ্ধ আর্তনাদ করে সে মরে গেল। আর সেই সঙ্গে আমিও মরে গেলাম। আমার আত্মা, আমার ইহলোক-পরলোক সমস্ত একসঙ্গে মরে গেল—শোচনীয় সে মৃত্যু। সমাজ কিন্তু এখনও মরে নি, শাস্ত্র এখনও বেঁচে আছে। আমার এ মৃত্যুর খবর তুমি জানতে ?"

"না।"

"আমার কথা বিশ্বাস হচ্ছে তোমার ?"

"আমি কিছু বিশ্বাস করি না।"

"বিশ্বাস হচ্ছে না আমার কথা ?"

"না।"

মেয়েটি-উৎসুক নয়নে আমার দিকে চাহিয়া আছে। দৃষ্টি হইতে একটা অব্যক্ত বেদনা ঝরিয়া পড়িতেছে। মিনতি করিয়া সে আবার বলিল—"আমি মিছে কথা বলি নি ডাক্তারবাবু। বেঁচে থাকতে অনেক মিছে কথা বলেছিলাম, এখন যা বলছি সব সত্যি। আফিং খেয়ে মরেছে আমার দেহটা, আমি মরেছি তার পূর্বে। আমার সে শব-জীবন বয়ে বেড়াতে পারলাম না। আফিং খেয়েছিলাম বাঁচবার আশায়। আমি আবার বাঁচতে চাই—সর্বান্তঃকরণ দিয়ে বাঁচতে চাই—বিশ্বাস কর—"

তাহাকে থামাইয়া দিয়া একটি যুবক আগাইয়া আসিল। তাহার মাথার খুলিটা ফাটিয়া চৌচির হইয়া গিয়াছে। একটা ফাটল দিয়া খানিকটা মস্তিষ্ক বাহির হইয়া পড়িয়াছে। মুখময় খোঁচা-খোঁচা গোঁফ-দাড়ি—যেন কয়েক দিন কামানো হয় নাই।

যুবকটি বলিতে লাগিল—"দেখ, পৃথিবীর মানুষের কাছে দুঃখের

কথা জানানো বৃথা। তা কি আজও বোঝ নি? এরা যতক্ষণ বেঁচে আছে, ততক্ষণ স্বার্থের কথা ছাড়া কিছু বোঝে না—বুঝতে পারে না। ওরা এক রকম সোনাই চেনে, স্বার্থের কষ্টিপাথরে যার দাগ পড়ে। পৃথিবীর বাকি সব জিনিস ওদের কাছে বাজে।"

লোকটি আগাইয়া আসিয়া আমার টেবিল-ল্যাম্পটার কাছে ঝুকিয়া পড়িয়া পোকাগুলা দেখিতে লাগিল। বিচিত্রবর্ণ ফড়িংটার দিকে খানিকক্ষণ একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিয়া সে হাসিয়া বলিল—"যখন বেঁচে ছিলাম, এদের নিয়ে কবিতা লিখেছি। কত রকম উপমাই যে দিয়েছিলাম! নারী যেন আলোকের শিখা, পুরুষ যেন পতঙ্গ। পতঙ্গ আলোকশিখার মোহে তাতে গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে, আর পুড়ে ছাই হয়ে যায়। ভারি মুখরোচক সব উপমা!" লোকটি আবার খানিকক্ষণ সেই আলোক-লুব্ধ পতঙ্গটির দিকে তাকাইয়া রহিল। তাহার পর সেই মেয়েটির দিকে চাহিয়া বলিল—"পৃথিবীর মানুষ স্বার্থের কথা ছাড়া কিছু বোঝে না। নিঃস্বার্থভাবে তারা যা করে, তার মধ্যেও স্বার্থ আছে—আত্মতৃপ্তি। আমি ছিলাম কবি। কারও কোন অনিষ্ট করি নি। নিজের মনে নিজের কোণে থাকতাম। বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে খুব কমই আমার সম্বন্ধ ছিল। কিন্তু সবাই আমাকে এমন ভুল বুঝতে শুরু করল যে, সরে পড়তে বাধ্য হলাম। আমার বন্ধুবান্ধব আত্মীয়-স্বজন সকলে ঠিক করেছিল, আমি পাগল। ছন্দের পর ছন্দ গেঁথে যার বন্দনা করলাম, সে সুদ্ধ আমাকে ভুল বুঝলে, সে সুদ্ধ আমাকে—" বলিয়া ছোকরা হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল।

হাসিতে হাসিতেই বলিতে লাগিল—"এখন শুনেছি, সে নাকি অনুতাপ করে। শুনেছি, আমার মৃত্যুর পর সে-ও নাকি মরেছে। কোথা গেছে খুঁজে পাই না। এখানে যাদের দেখি, সবাই অচেনা। যদি দেখতে পাও তাকে, ডেকে দিও তো আমার কাছে।"

মেয়েটি হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"আপনি তাকে ভালবাসতেন?" কবি কোন উত্তর দিল না। তাহার সমস্ত মুখখানা সহসা রক্তবর্ণ

হইয়া আবার কেমন ফ্যাকাশে হইয়া গেল। মাথার ফাটলটা দিয়া আরও খানিকটা মস্তিষ্ক গলগল করিয়া বাহির হইয়া আসিল। কোন কথা সে বলিল না।

মেয়েটি বলিল—"উত্তর দিচ্ছেন না যে?"

"ও কথা জিজ্ঞাসা করো না। 'ভালবাসতাম' এই কথাটা এত সস্তা, এত বেশি রকম খেলো হয়ে গেছে যে, ওটা ব্যবহার করতে আমার লজ্জা হয়। মনে হয়, তাকে অপমান করা হবে। মনে আছে, একবার একটা কবিতায় লিখেছিলাম—

আমার মনের রঙিন কথাটি
মনের ভিতরে আছে,
তাহারে মূরতি দিবে বলি মোরে
কবিতা আসিয়া যাচে।
এত রঙ তার আছে কি ভাষায়?
ভয় হয় মোর খালি,
কলমের মুখে লিখিতে গিয়া সে
লাগাইয়া দিবে কালি।"

মেয়েটি আবার প্রশ্ন করিল—"কেমন দেখতে সে?"

"দেখতে? কালো রঙ। একপিঠ চুল। বড় বড় চোখ। মুখে তার হাসি লেগেই থাকত। ঠোঁটে যখন হাসি থাকত না, চোখ দুটি হাসত। আশ্চর্য তার হাসি! আমি যেদিন রাত্রে রিভলভার দিয়ে মাথার খুলিটা উড়িয়ে দিলাম, শুনেছি, ঠিক তার পরদিনই সেও পুড়ে মরেছে—গায়ে কেরোসিন তেল লাগিয়ে। কেন সে মরতে গেল? তার অমন স্বামী, অমন সংসার। তার যদি দেখা পাও—এ কি, কোথা গেলে?" সন্তান-হত্যাকারিণী নিঃশব্দে কখন মিলাইয়া গিয়াছিল, কবি জানিতেও পারে নাই। সে তখন আমার দিকে ফিরিয়া বলিল—"দেখুন তাকে যদি কখনও দেখতে পান, আমার কথা বলবেন। বলবেন আমি তাকে খুঁজছি। বলবেন, সেদিন রাত্রে

তো কিছুই বলা হয় নি, দেখা পেলে এখন বলব। সে আমাকে ভুল বুঝেছিল—তার ভুলটা ভেঙে দিতে চাই।”

যুবক বাহিরে চলিয়া গেল।

নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া আছি। আশেপাশে কাছে দূরে শবেরা ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। হঠাৎ কে যেন কথা কহিয়া উঠিল। দেখিলাম, বিচিত্রবর্ণ সেই প্রজাপতিটি বলিতেছে—

“হে মনুষ্যনির্মিত বর্তিকা, তোমাকে দেখিয়া আমার করুণা হইতেছে। হে আলোকশিখা, হে বন্দিনী, তোমার দুর্দশা দেখিয়া অনুকম্পায় আমার সমস্ত অন্তঃকরণ পরিপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছে। মানবের হস্তে ক্ষুদ্র ক্রীড়নক তুমি, বিধাতার অভিপ্রেত এই বিপুল অন্ধকারকে বিদুরিত করিবার ব্যর্থ প্রয়াসে জ্বলিয়া জ্বলিয়া মরিতেছ। অন্ধকারকে তুমি আলোকিত করিতে পার না—শুধু তাহার স্নিগ্ধতাটুকু নষ্ট করিয়াছ। তোমার এই অকিঞ্চিৎকর অস্তিত্ব যে কতদূর হাস্যকর, তাহা তুমি নিজেও বুঝিতে পার না। তোমাকে দেখিয়া আমার দয়া হইতেছে।”

কম্পিত আলোকশিখা তাহাকে সভয়ে প্রশ্ন করিল—“কে তুমি?”

“আমি? আমি আলোকের উপাসক। সুদূর আকাশচারী প্রদীপ্ত সূর্য আমার উপাস্য দেবতা। আমার এই বহুবর্ণ-বিচিত্রিত পক্ষ দুইটিতে ভর করিয়া প্রতিদিন তাঁহারই উদ্দেশ্যে আকাশযাত্রা করি। কিন্তু বেশি দূর যাইতে পারি না, দুর্বল পক্ষ ক্লান্ত হইয়া পড়ে। পৃথিবীর টানে আবার মাটিতে নামিয়া আসি। দিবাকর অস্তাচলগামী হয়—অন্ধকার আসিয়া পৃথিবী ছাইয়া ফেলে। অন্ধকারের গভীর নিবিড়তায় আমি সেই মহাজ্যোতিষ্মান সূর্যেরই ধ্যান করিতেছিলাম। তুমি আমার তপোভঙ্গ করিয়াছ। তোমাকে আমি অভিশাপ দিতাম, কিন্তু তোমাকে দেখিয়া আমার করুণা হইতেছে। হে নকল জ্যোতিষ্ক, হে ছদ্মবেশী অহঙ্কার, হে কালিমাবিতরণকারী কেরোসিন-শিখা, দিব্যজ্ঞান লাভ করিয়া তুমি নির্বাপিত হও।”

আলোকশিখা কাঁপিতে লাগিল।

"আইন বিশ্বাস কর ? একটি ছিপছিপে পাতলা যুবক আসিয়া আমাকে প্রশ্ন করিল। খড়্গের মত নাকটা। শীর্ণ মুখের কোটরগত চক্ষু দুটিতে অস্বাভাবিক দীপ্তি। জ্যোতি নয়—জ্বালা। মাথার সম্মুখ দিকটা কেশবিরল। বাকি চুলগুলি দীর্ঘ—অবিন্যস্ত। কানের কাছের দুই গোছা চুল ললাট ও কপোলের খানিকটা অংশ ঢাকিয়া দিয়াছে। মনে হইতেছে, যেন দুই টুকরা অন্ধকার পুঞ্জীভূত হইয়া আছে। শীর্ণ সুচালো চিবুকের উপর দুই-চারিগাছা রোম উদগ্র হইয়া রহিয়াছে। ঠোঁট দুইটি কাঁপিতেছে।

ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া আবার প্রশ্ন করিল—"আইন বিশ্বাস কর ? আইন ? যার জন্যে এত আদালত, এত জজ, এত কেতাব, এত উকিল—এত সব ? যে আইনকে সাহায্য করবার জন্যে তুমি দিবারাত্রি ছুরি হাতে করে বসে আছ ? বিশ্বাস কর সেই আইনে ?" তাহার চোখ দুইটি জ্বলিয়া উঠিল—চাহিয়া দেখিলাম, যেন দুইটি জ্বলন্ত অঙ্গার। তাহার নাসারন্ধ্র হইতে উষ্ণ বাষ্প বাহির হইতেছে। মুখখানা সে আমার আরও কাছে লইয়া আসিয়া একদৃষ্টে আমার দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার তপ্ত নিঃশ্বাস যেন আমার মুখে লাগিতে লাগিল। কম্পিত অধর দুইটি সহসা ফাঁক হইয়া গেল— "বিশ্বাস কর আইনে ?"

বলিলাম—"করি বই কি। আইনে বিশ্বাস না করলে বাঁচব কি করে ?"

লোকটির অধর দুইটিতে এক ঝলক বিদ্যুতের মত তীক্ষ্ণধার হাসি খেলিয়া গেল। জ্বলন্ত চক্ষু দুইটি ঈষৎ কুঞ্চিত করিয়া সে বলিতে লাগিল—"ও, ভুলে গিয়েছিলাম, তুমি যে এখনও বেঁচে আছ। তুমি তো করবেই। সমাজের জীবন্ত মানুষ তুমি। তুমি তো বিশ্বাস করবেই আইনে—তুমি তো বিশ্বাস করবেই।"

সে হঠাৎ চুপ করিয়া গেল।

তাহার পর আবার আপন মনেই বলিতে শুরু করিল—"যতক্ষণ ভাঁড়ার ঘর আছে, ততক্ষণ ইঁদুর ধরবার জন্যে কল তো পাততেই হবে। কচাকচ সেই কলে রোজ ইঁদুর পড়বেই। ইঁদুরের বিচার করবার অবসর জীবন্ত মানুষের থাকতে পারে না। 'স্ট্রাগল ফর একজিসটেন্স'—সুন্দর কথাটা বার করেছ তোমরা। ওই এক মন্ত্র আউড়ে লক্ষ কোটি বলি হচ্ছে। আইন তোমরা তো বিশ্বাস করবেই। আমিও যখন বেঁচে ছিলাম, অনেক মামলা করেছি। প্রগাঢ় ভক্তি ছিল আইনের ওপর। অনেক উকিলের অনেক পকেট আমার টাকায় ভর্তি হয়েছে। সে কি সোজা ভক্তি? বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন সবাই বলছে—'পারবে না, হেরে যাবে, ছেড়ে দাও।' আমি ছাড়ি নি। আইন-আদালতের প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি তখন আমার। ভক্তির পুরস্কারও পেয়ে গেলাম। দেশসুদ্ধ লোকের সামনে সেদিন আইনত প্রমাণ হয়ে গেল, আমার স্ত্রী সতী আর নির্মল একজন সচ্চরিত্র যুবক। 'অনারেবলি অ্যাকুইটেড'। আইন! এখন আর আইনে বিশ্বাস করি না, টাকায় বিশ্বাস করি। নির্মল ছোকরার অনেক টাকা ছিল।"

লোকটি সহসা অন্তর্হিত হইয়া গেল। আমি একা বসিয়া রহিলাম। যে বইটি পড়িতেছিলাম, তাহাই আবার তুলিয়া পড়িতে শুরু করিলাম। ল্যাপল্যাণ্ডের গল্প। একটি বিদেশী যুবককে একটি ল্যাপ-যুবতী পথ দেখাই লইয়া যাইতেছে। যুবকটি বলিতেছে—

"মেয়েটি আমার আগে আগে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। কি সুন্দর তার চেহারা আর কি অপূর্ব তার বেশ! বলগা-হরিণের চামড়া দিয়ে তৈরি তার অঙ্গচ্ছদ, মাথায় লাল উলের টুপি। কোমরে চামড়ার চওড়া বেল্ট। বেল্টে হলুদ আর নীল সুতোর কাজ করা, বেল্টের গায়ে খাঁটি রূপোর বড় বড় ডুমো ডুমো বোতাম—কোনটা চৌকনা, কোনটা গোল। বেল্টে ঝুলছে একখানা ছোরা, তামাকের

একটা থলি আর জল খাবার একটা মগ। গাছপালা কাটবার জন্যে একটা ছোট কুড়ুলও গোঁজা রয়েছে দেখলাম। তার পায়ের গোছ নরম ও সাদা বলগা-হরিণের চামড়া দিয়ে ঢাকা—লেগিং বলে তাকে। পরনে হরিণের চামড়ার ব্রিচেস। গোছের লেগিং ব্রিচেসের সঙ্গে বেশ শক্ত করে আঁটা। পায়েও হরিণের চামড়ার জুতো—নীল সুতো দিয়ে সুন্দরভাবে অলঙ্কৃত। পিঠে তার বোচকা। বোচকাটি বার্চ-গাছের ছাল দিয়ে তৈরি, আর তাতে আছে নানাবিধ প্রয়োজনীয় জিনিস। আমার কাঁধেও একটা বোচকা ছিল; কিন্তু ও বোচকাটা ডবল ভারী।

বড় বড় ঢালু পাহাড়ের ওপর দিয়ে সে দ্রুতবেগে ছুটে চলেছে। নিঃশব্দ তার গতি। সামনে গাছের গুঁড়ি বা ছোট পাহাড়ী নদী পড়লে অনায়াসে লাফিয়ে পার হয়ে যাচ্ছে। সামনে হয়তো একটা প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ড—খুব উঁচু। পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছে। মেয়েটি হরিণীর নৈপুণ্যে তার ওপর লাফিয়ে উঠে চারিদিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগল, পথ কোন দিকে! পাহাড় থেকে নেমে দেখলাম, একটা বেশ বড় স্রোতস্বিনী। বেশ চওড়া—লাফিয়ে পার হওয়া যাবে না। ভাবছি, কি করে পার হব। দেখি, মেয়েটি নিঃশঙ্কচিত্তে জলে নেমে পড়েছে। আমিও তার অনুসরণ করলাম। সেই তুহিন-শীতল বরফ-গলা ঠাণ্ডা জলে বিনা দ্বিধায় ঝাঁপিয়ে পড়লাম—"

"ওটা কি পড়ছ?" দেখিলাম, সেই আইন-পাগল লোকটা আবার আসিয়াছে। তাহার জ্বলন্ত চোখ দুইটা আমার মুখের উপর রাখিয়া সে বলিল—"ওসব গল্পের বই রাখ। আমার কথা শোন এখন। তখন কতদূর বলেছিলাম?"

"নির্মল অনারেবলি অ্যাকুইটেড হয়ে গেল।"

"হ্যাঁ, অনারেবলি অ্যাকুইটেড। খবরের কাগজে সে কি আন্দোলন! আমার একবার ইচ্ছে হয়েছিল—কি ইচ্ছা হয়েছিল বল তো?" বলিয়া আমার মুখের দিকে তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সে তাকাইয়া রহিল। তাহার পর

আমার মনের কথাটা যেন পড়িয়া লইয়া তীব্র ব্যঙ্গ হাস্যে বলিয়া উঠিল—"না না, আপীল করতে নয়, খুন করতে। হাতে কিন্তু একটি পয়সা ছিল না। খুন করব কি করে? বন্দুক না হলেও অন্তত পক্ষে একটা ছোরা চাই তো। হাতে এমন একটা পয়সা ছিল না যে, ছোরা কিনি। অস্ত্রের মধ্যে ঘরে ছিল একটা ভোঁতা জাঁতি আর তার চেয়েও ভোঁতা একটি বঁটি। আইনের মত তীক্ষ্ণ অস্ত্রও যার কাছে ব্যাহত হয়ে ফিরে এল, তাকে খুন করতে হলে খুব শানিত হাতিয়ার দরকার। অর্থাৎ খুন করতে গেলেও পয়সা চাই। নিতান্ত নিঃস্ব যে, সে কাউকে খুন করতে পারে না; বিশেষত সে যদি আমার মত দুর্বল হয়।"

হাসিতে লাগিল। বিশ্রী সে হাসি। মনে হইতে লাগিল, যেন চিতার আগুন দাউদাউ করিয়া জ্বলিতেছে।

একটু পরে সে আবার বলিল—"ভেবে দেখলাম, দুর্বলের মৃত্যু ছাড়া পথ নেই। মৃত্যুই তার একমাত্র বন্ধু, একমাত্র পথ। কিন্তু একটি কথা আমার বিশ্বাস কর—মরতে আমার বড় কষ্ট হয়েছে। মরবার ইচ্ছে ছিল না। আমি অপেক্ষা করেছিলাম—হ্যাঁ, তার জন্যে অনেক দিন অপেক্ষা করেছিলাম। সে অসতী জেনেও তাকে আমি ভালবাসতাম। এখন মনে হচ্ছে, হয়তো অসতী বলেই বেশি ভাল লাগত তাকে। তা ছাড়া ভালবাসা ভাল-মন্দ সতী-অসতী বিচার করে না। ভেবেছিলাম—আশা করেছিলাম, সে ফিরে আসবে। কিন্তু এল না।"

চুপ করিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে আবার শুরু করিল—"নির্মলের প্রকাণ্ড চকচকে মোটরখানা চড়ে সে আনন্দে ঘুরে বেড়াতে লাগল। আমার ভাঙা কুঁড়েতে সে এল না। তখন মৃত্যুরই শরণ নিলাম।

দেখলাম, উঠানের কলকেগাছটায় অনেক ফল ধরেছে—অজস্র। যত্ন করে গাছটা ছেলেবেলায় পুঁতেছিলাম, সে আমাকে স্নেহভরে ডাক দিলে। আকুল আগ্রহে ছুটে গিয়ে তার ফলগুলো কড়মড়

করে চিবিয়ে খেলাম। মৃত্যু হল বটে, কিন্তু বড় কষ্ট পেয়েছিলাম। সায়ানাইড খেলে শুনেছি কোন কষ্ট হয় না—"

"বাজে কথা।"

আর একজন আগাইয়া আসিল।

"আমি সায়ানাইড খেয়ে মরেছিলাম। ভয়ঙ্কর কষ্ট। এই ডাক্তারবাবুকে জিগ্যেস কর কত কষ্ট! কিন্তু কষ্ট পেয়েছি বলেই সুখী, আরও কষ্ট পেলে আর একটু তৃপ্তি পেতাম। প্রায়শ্চিত্তটা পুরো হয়ে যেত। ভাবছ, প্রায়শ্চিত্তের জন্যে আমি এত ব্যগ্র কেন? —এ কি, কোথা গেল!"

কলকেফুলের বিচি খাইয়া যাহার মৃত্যু হইয়াছিল, সে তখন অন্তর্ধান করিয়াছে।

চাহিয়া দেখিলাম, আগন্তুক একটি অল্পবয়স্ক যুবক। বয়স বড়জোর উনিশ কি কুড়ি। নিটোল স্বাস্থ্য, উন্নত প্রশস্ত ললাট, বিস্তৃত বক্ষ, সর্বাঙ্গের মাংসপেশীগুলি সুপুষ্ট ও সুন্দর। সুবিন্যস্ত চুল। সুন্দর ভাসা ভাসা দুইটি চোখ। দাঁতগুলি পরিস্কার ঝকঝকে। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ যুবাটিকে দেখিলেই মন স্নেহশিক্ত হইয়া উঠে। আমার দিকে ফিরিয়া বলিল—"গল্পটা শুনতে চান কি? গল্প নয়, সত্য কাহিনী। সময় আছে আপনার? আপনি ডাক্তার মানুষ। আপনার সময়ের দাম আছে তো। সংক্ষেপে বলি।"

বলিয়া ছেলেটি একটু হাসিল। পরিস্কার সুন্দর দাঁতগুলি থাকাতে হাসিটি তাহার সুন্দর।

"দেখুন, কলেজে পড়তাম। স্বপ্নের মত সেসব কথা মনে পড়ছে এখন। সে যেন একটা স্বপ্ন-জগতে বাস করতাম। প্রথম যেদিন বুঝতে পারলাম যে, আমাদের চিরপরিচিত জল দুটো গ্যাসের সম্মিলনে সৃষ্ট হয়েছে, সেদিন আমি অবাক হয়ে গেলাম।

বিস্ময় ক্রমে বেড়েই চলল। সামান্য নুনের মধ্যে কে জানত অমন একটা দারুণ গ্যাস আছে—ক্লোরিন!"

খানিকক্ষণ সে চুপ করিয়া রহিল। তাহার সে তন্ময় আত্মমগ্ন রূপ দেখিয়া মনে হইল, সে যেন কিসের ধ্যান করিতেছে। চক্ষু দুইটি চাহিয়া আছে, অথচ কিছুই দেখিতেছে না।

"ভোল্টা, গ্যালভানি, ল্যাভয়শেয়ার এদের জীবনী পড়লাম। দেখলাম, কি অদ্ভুত এদের সাধনা! সত্য আবিষ্কার করবার জন্যে কি তপস্যা! আমারও সাধ হল, আমিও ওদের মত হব। কি আকুলতা নিয়েই যে সে দিনগুলো কেটেছে! হঠাৎ একদিন সব উল্টে-পাল্টে গেল। আমাদের সংসারে—আমার জীবনে—একটা আঁধি ঝড় এল। দাদাকে পুলিসে নিয়ে গেল।"

আবার চুপ করিল।

"বিচারে তাঁর ফাঁসি হয়ে গেল। অপরাধ—রাজদ্রোহ! সঙ্গে সঙ্গে আমিও ভোল্টা, গ্যাল্‌ভানি, ল্যাভয়শেয়ার সকলের ফাঁসি দিয়ে দিলাম। মনে হল ওরা আমার কেউ নয়, সব শত্রু। দাদা রাজদ্রোহী ছিলেন কি না জানি না, আমি কিন্তু হলাম—অগ্নি-মন্ত্রের সাধক।"

বলিয়া সে একটু মৃদু হাসিল।

"আমার মত ভীরু ভাবপ্রবণ লোকের এ কাজে হাত দেওয়া উচিত ছিল না। কিন্তু মায়ের অবিশ্রান্ত কান্না, বউদিদির বিধবা-বেশ, আমাকে উদভ্রান্ত করে তুলেছিল। তখন বিচার করবার অবসর ছিল না, আমি এ কাজের উপযুক্ত কি না। তখন ভুলে গিয়েছিলাম যে, আমি ভাবের বাষ্পে স্ফীত একটা রবারের রঙিন বেলুন মাত্র। আমার গায়ে আলপিনের খোঁচাটিও সইবে না। কিন্তু বিচার করবে কে? সামান্য ফানুস যখন আবেগভরে হঠাৎ আকাশে উড়ে গিয়ে নিজেকে নক্ষত্রদের সগোত্র মনে করতে চায়, তখন সে বাধা মানবে কেন? আমিও মানলাম না। বোমার

দলে ভিড়ে গেলাম। অগ্নিমন্ত্র! সুন্দর কথাটা। অগ্নিও যে না ছিল তা নয়।"

বলিয়া সে আবার একটু হাসিল।

"ও রকম অগ্নি আমি দেখি নি। দূর থেকে মনে হয় স্বপ্ন, কাছে গেলে মনে হয় শিখা। দূর থেকে কাছে টানে—কাছে গেলে দূর করে দেয়। হেঁয়ালি ভেঙেই বলি—প্রেমে পড়লাম। আমাদেরই দলের একটি মেয়ে। 'আনন্দমঠ' পড়েছেন? মেয়ে জুটেই সব মাটি হয়ে গেল। আমাদেরও তাই হল। আমাদেরও কাজ হল, তার মনস্তুষ্টি করা। সবাই মিলে তার চারিদিকে ঘিরে দাঁড়ালাম। সেই হল আমাদের আরাধ্য দেবতা—দেশ নয়। সেই হল লক্ষ্য—দেশ উপলক্ষ্য মাত্র।

আলোটা হঠাৎ কাঁপিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে একটা গুঞ্জনধ্বনি শুনিতে পাইলাম।

প্রজাপতি আলোকশিখাকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছে—"তোমার জ্যোতি আছে, শিখা আছে, উত্তাপ আছে স্বীকার করি। কিন্তু কত ক্ষুদ্র তুমি—কত হীন তুমি! সামান্য একটা কাচের কারাগারে বন্দী হইয়া আছ! তুমি কি অগ্নি? তুমি কি সেই অনলের সগোত্র, যাহার দ্যুতি সূর্যে নক্ষত্রে বিদ্যুতে ইন্দ্রধনুতে নিত্য প্রতিভাত? দাবানলে, বাড়বানলে যাহার প্রকাশ? তাই যদি হয়, তাহা হইলে ধিক শত ধিক তোমাকে! দেবতা তুমি, সামান্য মানবের হস্তে বন্দী হইয়া সামান্য ভৃত্যের ন্যায় জীবন-যাপন করিতেছ!"

"স্বদেশ উদ্ধারের নেশা ছুটে গেল,"—যুবকটি বলিতে লাগিল—"নতুন নেশায় বিভোর হয়ে গেলাম। অদ্ভুত সে উন্মাদনা! ভোল্টা, গ্যালভানি, ল্যাভয়শেয়ার, শোকাতুরা মা, সদ্য-বিধবা বউদিদি, দেশের কাজ—সব ভেসে গেল। শুধু সে আর আমি। সে দেবী,

আমি তার পূজারী। হঠাৎ একদিন আবিষ্কার করলাম—নিজের চোখে দেখলাম, সে বরদান করেছে আমাকে নয় আর একজনকে। নিজের চোখে দেখলাম, সে আর একজনের—আমার নয়। সেই আর একজন কে জানেন? আমারই একজন অন্তরঙ্গ বন্ধু। স্ফীত রবারের বেলুনটায় এবার আলপিনের খোঁচা লাগল। নিমেষের মধ্যে চুপসে গেলাম। অ্যাপ্রুভার হয়ে তাকে ধরিয়ে দিলাম। বন্ধু? হ্যাঁ, বন্ধু ছিল বইকি—অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ বন্ধু। অমন বন্ধু জীবনে পাই নি, পাবও না। তথাপি ধরিয়ে দিলাম তাকে। আমার সমস্ত অন্তঃকরণ ঈর্ষার শরশয্যায় শুয়ে ছটফট করছিল। ধরিয়ে না দিয়ে পারলাম না। কাগজে আপনারা পড়েছেন নিশ্চয়। কাগজে যা বেরিয়েছে, তা ভুল। তাকে ধরিয়ে দেবার আসল কারণ এই। তার ফাঁসি হয়ে গেল। আমি ছাড়া পেয়ে গেলাম। সেই মেয়েটি? সে ধরাই পড়ে নি।

দেবীপূজায় সাধারণত পশু বলিদান দেওয়া হয়। আমি দেবী-পূজায় আমার বন্ধুর মত অত বড় একজন মহামানবকে বলিদান দিলাম—আমার বিবেককে বলিদান দিলাম—আমার যা কিছু প্রিয় ছিল, সব ত্যাগ করলাম। দেবী কিন্তু প্রসন্ন হল না। দেবী কি করলে, বলুন দেখি?"

বলিয়া ছেলেটি আমার দিকে চাহিয়া মুচকি মুচকি হাসিতে লাগিল।

"না না, আপনি যা ভাবছেন তা নয়। আত্মহত্যা সে করে নি—সন্ন্যাসিনীও হয়ে যায় নি। সে বিয়ে করেছে একজন বিলেত-ফেরত আই. সি. এসকে। তার জর্জেট শাড়ির এখন নিত্য নূতন রঙ। মোটর ছাড়া সে রাস্তায় বেরোয় না। নানা রঙের নানা আকারের ছোট কুকুর তার কোলে কোলে ফিরছে। হাতে অদ্ভুত রকম কাজ-করা ভ্যানিটি-ব্যাগ। সঞ্চারিণী অগ্নিশিখার মত এখনও সে ঘুরে বেড়াচ্ছে।"

যুবক চুপ করিল। দেখিলাম, তাহার ভাসা ভাসা বড় চক্ষু দুইটিতে অশ্রু টলটল করিতেছে।

"আমাকে কিন্তু সে ভোলে নি। তার সুপারিশের জোরেই তার আই. সি. এস. স্বামী আমাকে একটা চাকরি করে দেবেন বলে ভরসা দিয়েছিলেন। আমাকে মাঝে মাঝে টি-পার্টিতে নেমন্তন্নও করতেন। কিন্তু পারলাম না। সায়ানাইড সংগ্রহ করতে হল। কষ্ট হয়েছিল বইকি। কিন্তু ওঁর মুখে শুনলাম, কলকে ফুলের বিচি আরও কষ্টকর। আগে জানলে তাই খেতাম। আমার শাস্তি হওয়ার দরকার আছে। লোকে ফাঁসির পর কোথায় যায় জানেন ?"

"জাহান্নামে।"

চমকাইয়া উঠিলাম।

দেখিলাম, কুচকুচে কালো দীর্ঘাকৃতি একটা লোক আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। এত কালো লোক খুব কম দেখা যায়। মাথার চুল কোথায় শুরু হইয়াছে বোঝা যায় না—এত কালো। প্রকাণ্ড তাহার মাথাটা। ভাঁটার মত বড় বড় চোখ দুইটা অদ্ভুত রকম সাদা। ঠোঁটে ধবল কুষ্ঠ। গলদেশে ভীষণ একটা কাটা ঘা দগদগ করিতেছে।

লোকটা সেই স্বদেশী যুবকটির দিকে ফিরিয়া আবার চিৎকার করিয়া উঠিল—"জাহান্নামে গিয়ে খোঁজ কর। ও-রকম ফাঁসির আসামীরা সেইখানে যায়। তুমিও সেইখানে—জাহান্নামে যাও—সব্বাই তোমরা জাহান্নামে যাও।"

তার স্বর উত্তরোত্তর চড়িতে লাগিল।

সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত ক্ষতটা ভরিয়া রক্তের বুদ্বুদ ফেনাইয়া উঠিল। স্বদেশী যুবকটি কখন অন্তর্হিত হইয়াছিল বুঝিতে পারি নাই।

তখন সেই কৃষ্ণমূর্তি আমার দিকে আরও খানিকটা আগাইয়া আসিয়া তাহার গলাটা বাড়াইয়া দিল—"দেখ তো ডাক্তার, সেলাই-

টেলাই করে এটাকে কোনক্রমে জোড়া লাগানো যায় কি না! বড় দুঃখে বড় জোরের সঙ্গে ক্ষুরটা চালিয়েছিলাম। ভাল ক্ষুর ছিল। বেশ দাম দিয়ে কিনেছিলাম। বেইমানি করে নি। মরে এখন আফসোস্ হচ্ছে। আমার অতগুলো ছেলেমেয়ে না খেতে পেয়ে মরে যাবে যে! তিন মাসের বাড়িভাড়া বাকি ছিল—বাড়িওলা নিশ্চয়ই তাদের পথে বার করে দিয়েছে। আমার গলাটা জুড়ে দাও ডাক্তার—আমি ফিরে যাই আবার।"

বলিয়া সে তাহার গলাটা বাড়াইয়া রহিল।

"দাও না জুড়ে গলাটা।"

কি বলিব, চুপ করিয়া আছি।

"দেবে না জুড়ে?"

"ও আর জোড়া যাবে না।"

"তাই নাকি? টং টং করে নগদ ফীস গুনে দিলেও যাবে না? তোমরা তো টাকা পেলে সব পার।"

লোকটা হাসিতে লাগিল। আবার তাহার গলার ক্ষতে রক্ত ফেনাইয়া উঠিল। সমস্ত মুখে তিক্ত বিদ্রূপের হাসি।

আমি চুপ করিয়া রহিলাম।

"রাগ করলে ডাক্তারবাবু? রাগ করো না। বড় দুঃখে বলেছি কথাটা। দুনিয়ায় কেউ আমার প্রতি সুবিচার করে নি—কেউ না। জীবনে যতটুকু সুবিধে পেয়েছি, টাকা দিয়ে কিনতে হয়েছে। বেটা-ছেলে হয়ে জন্মেছিলাম বলেই বোধ হয় মা ছেলেবেলায় বিনা পয়সায় দুধ খেতে দিত—ভবিষ্যৎ-লাভের আশায়। মেয়ে হয়ে জন্মালে অশেষ দুর্গতি হত। আমার একটা বোন ছিল, আমারই মত কুৎসিত। মা তো সেটাকে দুচক্ষে দেখতে পারত না। মাই-দুধ হয়তো তাকে দিয়েছিল—মাই টনটন করত বলে, গাই-দুধ কখনও তাকে খেতে দেখি নি। বাবা মা উভয়ে এ বিষয়ে একমত ছিলেন—'মেয়েমানুষে আবার দুধ খাবে কি?' এর চেয়ে রাজপুতরা

ঢের বেশি সদাশয় ছিল—মেয়ে হলে আঁতুরঘরেই মুখে মুন দিয়ে মেরে ফেলত। আফ্রিকায় শুনেছি কচি কচি মেয়েকে বঁড়শিতে গেঁথে ওরা কুমীর ধরে। মেয়েদের চেয়ে কুমীর দামী জিনিস। একটা কুমীর ধরতে পারলে অনেক টাকা হয়। বাপ-মাই যখন টাকার অনুপাতে ছেলেমেয়েদের প্রতি কম-বেশি ভালবাসা দেখান, তখন তোমরা টাকা না পেলে—"

আমি বলিলাম—"ভুলে যাচ্ছ কেন তুমি মরে গেছ? মরা মানুষ বাঁচাতে পারি কি আমরা? টাকা পেলেও পারি না।"

লোকটি আবার হি-হি করিয়া হাসিয়া উঠিল।

"আমার বিশ্বাস টাকা পেলে মরা মানুষও বেঁচে ওঠে। দিতে পার আমাকে কিছু টাকা? এক্ষুনি দেখ বেঁচে উঠব।"

"কত টাকা চাই তোমার?"

"দেবে—দেবে? ভারি ভাল লোক তো তুমি!"

"ওই সামনের দেরাজে আছে, টেনে দেখ, যা আছে নিয়ে যাও।"

"কোথা? কোন দেরাজে?"

দেরাজটা দেখাইয়া দিলাম। লোকটা লম্বা লম্বা পা ফেলিয়া সেই দিকে চলিয়া গেল। আমি আবার পুস্তকে মনোনিবেশ করিবার চেষ্টা করিতেছি, এমন সময় সে আবার ফিরিয়া আসিয়া বলিল—

"এ কি অদ্ভুত কাণ্ড! আমি দেরাজের হাতলটা কিছুতেই ধরতে পারলাম না। কেমন যেন ফসকে ফসকে যাচ্ছে। আমার দেহটা কি হাওয়া হয়ে গেছে?"

সে বারম্বার নিজের প্রসারিত বাহু দুইটা নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। হাত দুইটা বারম্বার মুষ্টিবদ্ধ করিয়া খুলিয়া খুলিয়া দেখিতে লাগিল। তাহার সমস্ত মুখে এক বিচিত্র হাসি। খানিকক্ষণ পরে সে আবার বলিল—"তাই তো! সব বদলে গেছে দেখছি। আমাকে দেখতে পাচ্ছ তুমি?"

"হ্যাঁ।"

"আমার কথা শুনতে পাচ্ছ?"

"পাচ্ছি।"

"কিন্তু শরীরটা আশ্চর্যরকম বদলে গেছে। সব হাওয়া হয়ে গেছে মনে হচ্ছে, শক্ত আর কিছু নেই। দেরাজটা খুলতে পারলাম না। টাকা পেলে আমি বেঁচে যেতাম। কিন্তু একি হল, এখন টাকা পেয়েও যে নিতে পারছি না। আহা, বেঁচে থাকতে তোমার সঙ্গে যদি দেখা হত—হয়তো আমি মরতাম না। হয়তো আমার—"

"কেন মরেছিলে তুমি?"

"কেন? ওই যে ছোঁড়াটা এসে বক্তৃতা দিচ্ছিল—ওরাই তো আমার এই দুর্দশার কারণ। পথে ঘাটে কাগজে দেওয়ালে এক রব তুললে—'বয়কট ফরেন গুডস'। এই সব ছোকরাদের বক্তৃতার চোটে আমার দোকানখানা ডুবে গেল। আমার দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে কি সব পিকেটিং করবার ধুম! 'বয়কট ফরেন গুডস'। ওদের ওই বুলিটাই যে 'ফরেন', সে তখন ওদের বোঝাবে কে? দোকানখানা আমার ডুবিয়ে দিলে ব্যাটারা। আমাকেও ডুবিয়ে দিলে। সে দোকান থাকলে কি আমার মেয়ের বিয়ের পণের অভাব হয়?"

লোকটা হাঁফাইয়া পড়িয়াছিল। একটু থামিয়া আবার শুরু করিল—"বাজারে ধার বাড়তে লাগল। মেয়েরও বয়স বাড়তে লাগল। আমার মেয়ে, বুঝতেই পারছেন, কি রকম কালো সে। বাজার-দর যাচিয়ে দেখলাম। অন্তত পক্ষে তিনটি হাজার টাকা দরকার। সদাগরী আপিসের একটি প্রৌঢ় কেরানীর দ্বিতীয় পক্ষ করার দরকার হয়ে পড়েছিল। তিনি বললেন যে, একটি প্রতিমার মত পাত্রী তাঁর জন্যে সেজে বসে আছে দুটি হাজার টাকা নিয়ে। মিছে কথা নয়। ভেবে দেখলাম, আমার ওই মেয়ের যুবক পাত্র জোটানো আমার পক্ষে অসম্ভব। অন্তত পক্ষে কুড়িজন ছোকরাকে জলখাবার খাইয়েছি—কেউ মেয়ে পছন্দ করে নি। শেষে সদাগরী আপিসের সেই কেরানীবাবুটিকে ধরে পড়লাম আমার শালার

মারফত। আমার শালার সঙ্গে তিনি একসঙ্গে পড়েছিলেন। তিনি অবশেষে দয়া করে আমার কালো মেয়েকেই বিয়ে করতে রাজী হলেন—কিন্তু তিনটি হাজার টাকা নেই। টাকার জন্যে পাগলের মত ঘুরতে লাগলাম। কত লোকের কাছে যে হাত পেতেছি! মাঝে মাঝে চুরি করতেও ইচ্ছে হয়েছে। আহা, তখন যদি আপনার সঙ্গে দেখা হত! কিন্তু টাকার আমার আর দরকার হল না। একদিন সন্ধ্যার সময় ফিরে এসে দেখলাম, মেয়ে আমার উধাও হয়েছে। মজা দেখুন মেয়ে কালো বলে পাত্র জুটল না, কিন্তু প্রণয়ী জুটে গেল! এর মূলেও ওই হতভাগা ছোঁড়াগুলো—ওই হারামজাদা ব্যাটারা—জাহান্নামে যাক সব।"

তাহার গলার ক্ষত দিয়া দরদর করিয়া রক্ত পড়িয়া তাহার বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল। যাইবার পূর্বে সে বলিয়া গেল—

"তবু আমি মরতাম না। কিন্তু মুখরা স্ত্রীর বাক্য-যন্ত্রণা আর সহ্য করতে পারলাম না। আশ্চর্য, কিন্তু এখন তার জন্যেই মন-কেমন করছে। সত্যি বলছি, বড্ড মন-কেমন করছে।"

ছায়া-মূর্তি মিলাইয়া গেল। ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া কয়টা বাজিল, শুনিলাম না। প্রবৃত্তি নাই।

চতুর্দিক নিস্তব্ধ।

একা বসিয়া আবার সেই ল্যাপল্যাণ্ডের গল্পে মনোনিবেশ করিয়াছি।

দুইজনে বরফ-গলা শীতল জল সাঁতার দিয়া পার হইতেছে—সেই যুবক এবং যুবতী। কেহ কাহারও ভাষা বোঝে না। যুবক সুইডেনবাসী—যুবতী ল্যাপল্যাণ্ডবাসিনী।

যুবক বলিতেছে—"ওপারে গিয়ে যখন উঠলাম, তখন শরীর ঠাণ্ডায় প্রায় জমে গেছে। ওপারের তীর কিন্তু সমতল নয়—চড়াই ভেঙে উঠতে হয়। উঠতে উঠতে শরীর গরম হয়ে উঠল। মেয়েটি বিশেষ কোন কথাবার্তা বলছিল না। বললেও বিশেষ কিছু সুবিধা

হত না—তার ভাষা আমার পক্ষে দুর্বোধ্য। চড়াই ভেঙে আমরা একটু পরে ওপরে উঠলাম। ওপরে উঠে আমরা শৈবালাসনে বসে আহারে প্রবৃত্ত হলাম—যবের শুকনো রুটি, টাটকা মাখন আর পনির। ধোঁয়ায়-সেঁকা বলগা-হরিণের জিবও ছিল। মেয়েটি তার মগে করে পাহাড়ী ঝরনার ঠাণ্ডা জল নিয়ে এল। এত তৃপ্তি করে বহুকাল খাই নি। খাওয়া-দাওয়ার পর দুজনে পাইপ ধরিয়ে বসে পরস্পরের ভাষা বোঝবার চেষ্টা করতে লাগলাম।

'ওই পাখিটির নাম জান ?' তাকে জিজ্ঞাসা করলাম।

'লাহোল্।' হেসে মেয়েটি উত্তর দিলে।

পাখিটির গলার স্বর ঠিক বাঁশির মত—ভারি কোমল। ল্যাপ-ল্যাণ্ডবাসীদের নির্জনতার সহচর এই পাখিটি। কাছেই একটি ঝোপ থেকে আর একটি পাখি গান গেয়ে উঠল। আশ্চর্য তার স্বর—নীল রঙের গলাটি !

'জিলো—জিলো—' মেয়েটি হেসে বলে উঠল।

ল্যাপদের ধারণা এই নীলকণ্ঠ পাখিটির গলার ভিতরে নাকি একটি ঘণ্টা আছে আর এরা নাকি একশো রকম বিভিন্ন সঙ্গীত জানে। ঠিক আমাদের মাথার ওপর প্রকাণ্ড একটা কালো ক্রস নীল আকাশের গায়ে স্থিরনিবদ্ধ হয়ে আছে দেখলাম। পক্ষীরাজ ঈগল তার গতি-বেগকে সংহত করে নিজের নির্জন সাম্রাজ্য পরিদর্শন করছেন। দূরে পাহাড়ের হ্রদ থেকে হাঁসের বিচিত্র শব্দ ভেসে আসছে। সমস্তটা দিন ইন্দ্রজাল !

'রো—রো—রেইক্—' মেয়েটি বলতে লাগল।

এর অর্থ—'আজ দিন ভাল—আজ দিন ভাল।'

হ্রদ থেকে হাঁস উত্তর দিলে—'ভার লুক্, ভার লুক্, লুক্, লুক্।'

মানে—'বৃষ্টি হবে, বৃষ্টি হবে,—হবে হবে।'

আমি সোজা লম্বা হয়ে শুয়ে দেখতে লাগলাম, মেয়েটি তার জিনিস-পত্র গুছিয়ে রাখছে। একটি ছোট নীল উলের শাল, আর এক জোড়া

হরিণের চামড়ার সুন্দর জুতো, চার্চে পরবার জন্যে চমৎকার এমব্রয়ডারি-করা একজোড়া লাল দস্তানা, একটি বাইবেল। আমি মুগ্ধ হয়ে দেখছিলাম—কি সুন্দর তার হাত দুটি!"

"ডাক্তারবাবু, শুনুন। সেই মেয়েটি যদি আসে, সেই কালো মেয়েটি—"

দেখিলাম সেই কবি আসিয়াছে। বই বন্ধ করিয়া তাহার দিকে ফিরিয়া বসিলাম। তাহার মাথার ফাটা খুলিটা হইতে আরও খানিকটা রক্তমাখা মস্তিষ্ক বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

"দেখুন ডাক্তারবাবু, সেই মেয়েটি যদি আসে, সেই কালো মেয়েটি—তাকে বলবেন যে, তার জন্য একটা কবিতা লিখেছিলাম। তাকে শোনানো হয় নি। শোনাবার অবসর পাই নি—অবসর সে দেয় নি।"

তাহার পর একটু ইতস্তত করিয়া বলিল, "শুনবেন আপনি? আপনি ডাক্তার মানুষ, আপনার হয়তো কবিতা ভাল লাগে না। তবু—"

তাহার সমস্ত চোখে মুখে কেমন একটা করুণ মিনতি ফুটিয়া উঠিল। সেতারের তারে ঝঙ্কার দিলে তারগুলি যেমন কাঁপিতে থাকে, তাহার দৃষ্টি দেখিলাম সেইরূপ থরথর করিয়া কাঁপিতেছে।

"শুনবেন কবিতাটা? সে যদি আসে, বলবেন তাকে—"

"আচ্ছা, শোনাও।"

কবি আবৃত্তি করিতে লাগিল। বসিয়া শুনিতে লাগিলাম। শুনিতে শুনিতে আমার মনটাও সুদূর অতীতে ফিরিয়া গেল।

> "তুমি এসেছিলে।
> বহি সুখ, বহি দুঃখ, বহি জ্বালা, বহি জটিলতা
> এসেছিলে জীবনে আমার।
> ক্ষুদ্র জলাশয়
> সহসা ধরিয়াছিল সাগরের রূপ
> তব আবির্ভাবে।

রবি-শশী-গ্রহ-তারা-দীপ্ত নীলাকাশ,
পথহারা ধূমকেতু
প্রসব-বেদনাতুরা কত নীহারিকা
সন্ধ্যা, উষা, জ্যোৎস্না, অন্ধকার,
সেই সাগরের বুকে ধরেছিল মূর্তি অভিনব
বহুবর্ণ-বিচ্ছুরিত স্বপন-উৎসবে।
কোটি-উর্মি-শিহরিত সে সমুদ্র-মাঝে
কত কি যে ছিল!
কি ঐশ্বর্য—কি দারিদ্র্য তার!
সূর্যালোকহীন সেই আঁধার অতলে
মুক্তা ছিল, শঙ্খ ছিল—আছিল কত কি!
ছিল কত নামহীন অপরূপ রূপের প্রকাশ!
বাড়ব-অনল
জ্বলিয়া মরিত সেথা নীরব জ্বালায়।
অনুত্থিতা উর্বশীর অন্ধ আকুলতা
ছন্দোহীন বেদনায় মরিত কাঁদিয়া
কত সর্প, কত অজগর
বিচিত্র কুণ্ডলাকারে—ভীষণ, মোহন,
পিচ্ছিল, চিক্কণ দেহ দিত প্রসারিয়া
রক্তবর্ণ প্রবাল-পল্লবে।"

শুনিতে শুনিতে আমি মানসচক্ষে দেখিতে লাগিলাম, একটি কৃশ দরিদ্র যুবক নগ্নপদে পথ অতিবাহন করিতেছে। পেটে অন্ন নাই, মাথার চুল তৈলহীন, পরিধানে ছিন্নবাস। কিন্তু সেদিকে তাহার ভ্রূক্ষেপ নাই। চক্ষু দুইটিতে তাহার তীব্র জ্যোতি—অন্তরে অমৃতের পিপাসা। অমৃতের প্রলোভন দেখাইয়া একটি কিশোরী তাহাকে ডাকিতেছে। সে চলিয়াছে তাহারই আহ্বানে। কিশোরীর আয়ত নয়ন দুইটি কি অপূর্ব! প্রদীপ্ত দৃষ্টিতে ভাষাহীন সে কি নিবেদন!

"গহন সে জলতলে তরঙ্গ তুলিয়া
লোলুপ আগ্রহভরে প্রসারিয়া অষ্টবাহু তার

লুব্ধ মুগ্ধ
ছিল 'অক্টোপাস'।
রক্তলোভী 'শার্ক'
সু-সতর্ক সঞ্চরণে ফিরিত সতত।
গভীর সে কালো জলে
আলোড়ন তুলি
উন্মাদিনী কত ঝঞ্ঝা প্রলয়-তাণ্ডবে
বিধুনিয়া জলরাশি মহা-অট্টহাসে
সুসজ্জিত কত তরী ডুবাল অতলে।
আরও যে কত কি ছিল
দেখি নাই স্বরূপ তাদের।
চকিতে ইঙ্গিতে শুধু
পেয়েছি আভাস।
অনন্ত আভাস-ভরা সমুদ্র বিশাল।
নিত্য তারে সুরাসুর করিত মন্থন
মৃত্যুঞ্জয়ী অমৃতের লাগি।
মোর তুচ্ছ জীবনের ক্ষুদ্র জলাশয়
সহসা ধরিয়াছিল সাগরের রূপ
তব আবির্ভাবে।"

"খুলে দাও, খুলে দাও, বাঁধনটা খুলে দাও তো—"

চাপা রুদ্ধস্বরে কথা বলিতে বলিতে একটি যুবতী আগাইয়া আসিল। তাহার রক্তাক্ত চোখ দুইটা ঠিকরাইয়া বাহির হইয়া আসিয়াছে। গলার দড়িটা শক্ত করিয়া বাঁধা। দুই হাত দিয়া টানাটানি করিয়া নিজেই সে বাঁধনটা আলগা করিয়া ফেলিল। আলুলায়িত দীর্ঘ কুন্তল। পাতলা ঠোঁট দুইটিতে বিচিত্র হাসি।

"কোথায় গেলেন সেই কবি? কবিতা যে শেষকালে মৃত্যুর ফাঁসি হয়ে গলায় চেপে বসে, এ খবর কি উনি জানেন? উঃ, কত কবিতাই জীবনে শুনলাম! এই রূপের কত ব্যাখ্যা!

যেখানেই যাই, সহস্র চক্ষু আমার দিকে সাগ্রহে তাকিয়ে থাকে—যেন গিলে খাবে। হিন্দু, মুসলমান, জৈন, খ্রীস্টান, বালক, বৃদ্ধ, যুবা—সকলেরই চোখে সেই এক ক্ষুধিত দৃষ্টি। কবি কবিতা লিখেছে, ধনী টাকা দেখিয়েছে, বলী বলপ্রকাশ করেছে, যার কিছু নেই—নিতান্ত দুর্ভাগ্য যে, সে মিনতি করেছে। অসহ্য!"

মেয়েটি তাহার পর আমার আর একটু কাছে সরিয়া আসিয়া বলিল—"আচ্ছা ডাক্তারবাবু, একটা কথা বলতে পারেন আমাকে? ছাপা কেতাবে যে সব প্রেমের গল্প লেখা থাকে, সে সব কি সত্যি? ও-রকম কি হয়? আমার জীবনে আমি তো দেখেছি, পুরুষগুলো আমাকে নিয়ে লোফালুফি করেছে খালি। আমি যেন একটা ফুটবল, আর ওরা যেন সুদক্ষ একদল খেলোয়াড়। সবারই লোলুপ দৃষ্টি আমার ওপর। কিন্তু আমাকে কাছে পাওয়া মাত্র লাথি মেরে তারা দূর করে দিয়েছে। দূর করে দিয়ে আবার ছুটেছে আমার পেছনে আমাকে ধরবে বলে।' এ কি আশ্চর্য ব্যাপার বলুন তো!"

মেয়েটি আগাইয়া আসিয়া বাতিটার কাছে দাঁড়াইয়া আলোর পোকাগুলি দেখিতে লাগিল। কতকগুলি মরিয়া গিয়াছে, কতকগুলি মৃতপ্রায়—কতকগুলি এখনও বাঁচিয়া আছে। রঙিন প্রজাপতিটি এখনও সমানে আলোক-শিখাকে প্রদক্ষিণ করিয়া চলিয়াছে।

"ডাক্তারবাবু, তখন তো বললেন না আমাকে—মানুষ ফাঁসি হলে কোথায় যায়? বলুন না!"

সেই স্বদেশী যুবকটি আসিয়াছে।

"বলুন না!"

"আমি ঠিক জানি না।"

"জানেন না?"

"না।"

"আচ্ছা, ভোল্টা, গ্যালভ্যানি, ল্যাভয়শেয়ার, পাস্তুর, গ্যালিলিও

—এঁরা কেউ আসেন আপনার কাছে? এঁদের আমি অপমান করেছি—ক্ষমা চাইব। কেউ আসেন এঁরা?"

"না।"

যুবক চলিয়া গেল। অদ্ভুত তাহার দৃষ্টি।

মেয়েটি আলোর পোকাগুলি এতক্ষণ পর্যবেক্ষণ করিতেছিল। যুবকটি চলিয়া যাইবার পর আমার কাছে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"ও কে?"

যতটুকু জানিতাম, বলিলাম।

মেয়েটি হাসিয়া বলিল—"সবারই পরিচয় শুনেছেন, আমার পরিচয় শুনুন। আচ্ছা, ওই ছেলেটি যাদের নাম করছিল, তারা কে? কি অদ্ভুত নামগুলো! কারা ওরা?"

"ওঁরা সব বড় বড় বৈজ্ঞানিক। সবাই মারা গেছেন। ছেলেটি তাঁদেরই খুঁজে বেড়াচ্ছে।"

"ছেলেটি খুব বিদ্বান বুঝি?"

"হ্যাঁ।"

মেয়েটি কেমন যেন অন্যমনস্ক হইয়া গেল। তারপর বলিল—"শুনবেন আমার কথা?"

"বল।"

"ভাল ব্রাহ্মণবংশের মেয়ে আমি। আমার মা নিষ্ঠাবতী হিন্দু বিধবা ছিলেন। মাসের মধ্যে অধিকাংশ দিনই উপবাস করে থাকতেন। আমরা গরীব হলেও মায়ের নিষ্ঠার জন্য আমাদের খাতির ছিল খুব। মায়ের মুখখানা এখনও আমার মনে পড়ে। ধপধপে ফরসা ছিলেন তিনি, ধপধপে ফরসা থান পড়ে থাকতেন।"

মেয়েটি একটু চুপ করিল।

"অমন মায়ের মেয়ে হয়ে কি করে যে আমি এমন হলাম, তাই ভাবি। আমার যখন ন বছর বয়স, তখনই আমার বিয়ে হয়েছিল। মা গৌরীদান করে পুণ্য অর্জন করেছিলেন। পাড়ার

লোককে বলতে শুনেছি যে, আমি নাকি গৌরীর মত দেখতে ছিলাম। আমার এই রূপের জোরেই একটি বড়লোকের ছেলের সঙ্গে আমার বিয়ে হয়ে গেল। কোন গরিবের হাতে পড়লে বোধ হয় আমার এ দুর্দশা হত না।"

একটু হাসিল।

"সবাই আমার এই রূপের প্রশংসা করেছে—এক আমার স্বামী ছাড়া। তিনি আমার দিকে কোনদিন চেয়েও দেখেন নি বোধ হয়। মদ নিয়ে এত মশগুল থাকতেন যে, আমার প্রতি দৃষ্টি দেবার তাঁর অবসর হত না। তিনি আছেন টের পেতাম, যখন রাত্রে তাঁর দুর্গন্ধ বমিগুলো পরিষ্কার করতে হত। স্বামী দেবতা হলেও ভাগ্যে অমর নয়, তাই নিষ্কৃতি পেয়েছিলাম। দেবতারা শুনেছি স্বর্গে থাকেন। পচা লিভারটা নিয়ে আশা করি তিনিও স্বর্গেই আছেন। থাকুন থাকুন—যেতে চাই না আমি সে স্বর্গে।"

তাহার চোখে মুখে যেন একটা আগুনের হলকা বহিয়া গেল।

"স্বামী স্বর্গে গেলেন যখন, তখন আমার বয়স তেরো বছর। বিয়ের সময় শুনেছিলাম, তাঁরা বড়লোক। আগে বড়লোকই ছিলেন। আমার স্বামীর প্রপিতামহ টাকা রোজগার করেছিলেন —এঁরা দু-তিন পুরুষ ধরে সেটা নানা ভাবে খরচ করেছিলেন। আমার স্বামীর অংশে যেটুকু অবশিষ্ট ছিল, সেটুকু তিনি মদ খেয়ে নিঃশেষে খরচ করে মরবার আগে কিছু ধারও রেখে গেলেন। ভাল লাগছে শুনতে আপনার?"

"না। তবু বল, শুনব।"

"লাগছে না? পচা মড়া চিরতে ভাল লাগে, মিথ্যে প্রেমের উপন্যাস পড়তে ভাল লাগে, আর আমার জীবনের এই সত্যি ঘটনাটা ভাল লাগছে না?"

"সত্য সর্বদাই অপ্রিয়। তুমি বল।"

মেয়েটি বলিতে লাগিল—

"হ্যাঁ, কি বলছিলাম, স্বামী স্বর্গে চলে গেছেন। আমি মর্ত্যে থেকে গেলাম। আর থেকে গেলেন আমার স্বামীর মামাতো ভাই, পুলক ঠাকুরপো। তিনিই আমার প্রথম প্রেমিক।" মেয়েটি সহসা একটু মুচকি হাসিয়া বলিল—"আমাদের দেশে সতীদাহ প্রথাই ঠিক ছিল, স্বামীর সঙ্গে মেয়েটাকে পুড়িয়ে মেরে ফেলত, বাস, নিশ্চিন্ত! এ রকম দগ্ধে দগ্ধে মরতে হত না। এই দেশে কখনও সতীদাহ প্রথা লোপ পেতে পারে? আজও এ দেশের ঘরে ঘরে বিধবা সতীরা পুড়ে মরছে। আগুনের চেহারাটা শুধু বদলেছে। আগে ছিল চিতানল, এখন হয়েছে তুষানল। আমার সারা জীবন ভরে তার প্রমাণ পেয়েছি। এই তুষানল নেবাবার নানা চেষ্টা আমি করেছি, জল পাই নি। মরুভূমিতে কখনও জল পাওয়া যায়? পাই নি। মরুভূমির চেয়েও খারাপ। এই মর্ত্য-লোক আমার কাছে নরক হয়ে উঠেছিল, আর সে নরক আমি গুলজার করেও তুলেছিলাম। কি করে আমার এই সামান্য দেহটা দিয়ে যে এত লোককে আমি কাবু করেছিলাম, তাই ভাবি। সে কি এক-আধটা লোক! প্রতি দিন প্রতি বেলা নূতন লোক। একটা সামান্য বারাঙ্গনার জীবন-কাহিনীর পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা করে আপনার ধৈর্যচ্যুতি ঘটাব না। এইটুকু শুধু জেনে রাখুন, সাধ করে গলায় দড়ি দিই নি। সম্ভব হলে ছ্যাকড়াগাড়ির ঘোড়া-গুলোও আত্মহত্যা করত। পারে না বলেই করে না।

জীবনে আমার সবচেয়ে বেশি দুঃখ কি জানেন? কাউকে ভালবাসি নি। ভালবাসবার মত কেউ আমার কাছে আসে নি। অথচ টাকার লোভে অহরহ ভালবাসার ভান করতে হয়েছে। কি আশ্চর্য এই পুরুষমানুষগুলোর প্রবৃত্তি! তারা ঘরে সতী স্ত্রী ফেলে আমাদের কাছে ছুটে আসে। আমার স্বামীও যেতেন শুনেছি। পুরুষদের ষোল-আনা লোভ এই অসতী মেয়েগুলোর প্রতি। অসতী জেনেই তারা আমাদের কাছে আসে, অথচ এসেই একনিষ্ঠতা দাবি

করে বসে। আর আমরাও টাকার লোভে একনিষ্ঠতার অভিনয় করতে থাকি। মরেছি কি সাধে?"

হাসিতে হাসিতে সে চলিয়া গেল। খোলা জানালাটা দিয়া হু-হু করিয়া একটা হিমশীতল বাতাস ঘরে আসিয়া ঢুকিতে লাগিল।

সেই প্রজাপতি শুনিলাম আলোক-শিখাকে বলিতেছে—

"আমি নীলাকাশচারী জ্যোতির্ময় সবিতার উপাসক, মুক্ত আলোকে, নির্মল বাতাসে সঞ্চরণ করিয়া বেড়াই। এই বদ্ধ ঘরের সঙ্কীর্ণতায় আমার সমস্ত অন্তর অবরুদ্ধ হইয়া আসিতেছে।"

বাতায়ন-পথে আবার খানিকটা ঠাণ্ডা বাতাস ঘরে ঢুকিল। আলোক-শিখা দেখিলাম, একটু কাঁপিয়া আরও যেন উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। পতঙ্গ আবার তাহাকে ঘিরিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে মৃদু গুঞ্জনে কি যেন বলিতে লাগিল, বুঝিতে পারিলাম না।

বিনিদ্র নয়নে বাতায়নের দিকে চাহিয়া বসিয়া আছি।

আশ্চর্য আমার এই বাতায়নটি! এই বিশ্বজগতের তুলনায় ইহা তো কিছুই নয়। আকাশভরা লক্ষ কোটি নক্ষত্রসমাজে কত ক্ষুদ্র আমাদের এই সৌরজগতের সীমাই! সেই সৌরজগতের ক্ষুদ্র একটি গ্রহ আমাদের পৃথিবী! সেই পৃথিবীর এক কোণে কত নগণ্য আমার ছোট ঘরখানি! সেই ঘরের দেওয়ালে ছোট একটি জানালা। কত সামান্য, অথচ কত অসামান্য! এই ক্ষুদ্র বাতায়ন-পথে বাহিরের পৃথিবীর খবর পাই। আকাশপটে বিশ্বরূপ দেখি। আলো আসে, অন্ধকারও আসে।

"ডাক্তারবাবু, ডাক্তারবাবু, দেখ তো—"

সেই সন্তানহত্যাকারিণী জননীটি আসিয়াছে। কোলে তাহার একটি মরা শিশু।

"দেখ তো ডাক্তারবাবু, এখনও বেঁচে আছে কি না! মনে হচ্ছে বুকের কাছে যেন এখনও একটু ধুকধুক করছে। দেখ না

একটু। নদীর ধারে পড়ে ছিল। একটা কুকুরে এর হাতটা চিবিয়ে খাচ্ছিল। দেখ না—বেঁচে আছে কি না।"

মৃত শিশুটা সে বাড়াইয়া ধরিল। নিস্পন্দ প্রাণহীন দেহ। একটা চোখ নাই—হয়তো কাকে ঠুকরাইয়া তুলিয়া ফেলিয়াছে! কচি হাতটিতে সত্যই কয়েকটি আঙুল নাই, কুকুরে চিবাইয়া খাইয়াছে।

"ডাক্তারবাবু, এখানে এই কালো দাগটা কিসের?"

"ওই জায়গাটায় তুমি টিপে ধরেছিলে।"

ছেলেটি কোলে করিয়া যুবতী দেখিলাম থরথর করিয়া কাঁপিতেছে।

"এখনও যে এর একটু একটু নিশ্বাস পড়ছে। বেঁচে আছে কি? দেখনা একটু।"

কি বলিব? মিথ্যা কথা বলিলাম।

"হ্যাঁ, এখনও প্রাণ একটু আছে।"

"আছে?"

চুম্বনে চুম্বনে উন্মাদিনী সেই মৃত শিশুটার সর্বাঙ্গ ভরিয়া দিল। তাহার অঙ্গের বসন বিচ্যুত হইয়া পড়িয়াছে, বেণী বিস্রস্ত—"বাবা আমার, মানিক আমার, সোনা আমার—"

বিস্মিত হইয়া দেখিলাম, মৃত শিশুর অধর দুইটি যেন নড়িয়া উঠিল, অভিমানভরে সে যেন বলিল, মা—মা!

বাহিরে হাওয়ার বেগ বাড়িতেছে। জানালা দিয়া দেখিতেছি, ঘনকৃষ্ণ পুঞ্জীভূত মেঘমালা আকাশের এক প্রান্ত হইতে আর এক প্রান্তে ছুটিয়া চলিয়াছে। নক্ষত্রবিহীন অন্ধ রাত্রি ঘনাইয়া আসিল। চিরকালের সেই উজ্জ্বল শাশ্বত নক্ষত্রগুলি দেখিতে পাইতেছি না। সামান্য মেঘের কি অসামান্য ক্ষমতা, নক্ষত্র বিলুপ্ত করিয়া দেয়!

সমস্ত তিমির ভেদ করিয়া মন সুদূরে ভাসিয়া চলিয়াছে।

সীমাহীন স্মৃতির সমুদ্রে সমস্ত অন্তঃকরণ হাবুডুবু খাইতেছে, যেন একখানি ক্ষুদ্র অসহায় ভেলা। চতুর্দিকে কোটি তরঙ্গ। মানসচক্ষে একটি ছবি ফুটিয়া উঠিতেছে।

গ্রামের একটি পুষ্করিণী। তীরে নারিকেল, সুপারি, আম, জাম, কাঁটালের বাগান। চতুর্দিকে শ্যামল-শ্রী। সূর্য অস্ত যাইতেছে। একটা কোকিল কোথায় যেন ডাকিতেছে। সরসর করিয়া একটি গিরগিটি শুষ্ক পত্রগুলিকে সচকিত করিয়া সরিয়া গেল।

পুষ্করিণীর অপর পাড়ে একটি জীর্ণ দেবালয়—বুড়া শিবের মন্দির। সেখান হইতে ধূপধুনার গন্ধে সন্ধ্যার বাতাস ভারাক্রান্ত হইয়া উঠিয়াছে। শঙ্খঘণ্টা-ধ্বনিতে চতুর্দিক মুখরিত।

ঘাটে স্নানার্থিনীর দল। সমস্ত দিন উপবাসের পর জননীগণ সন্তানের মঙ্গলকামনায় শিবের পূজা করিতে আসিয়াছেন। নীলষষ্ঠী। প্রত্যেক জননীর মুখে, চোখে, আচারে, অবয়বে একই ভাষা ফুটিয়া উঠিতেছে, সন্তানের যেন কোন অনিষ্ট না হয়—"হে দেবতা, হে শঙ্কর, আমার ছেলেদের সুখে রাখিও।"

ভাবিতেছি, এই জননীও প্রয়োজন হইলে সন্তানহত্যা করে। পৃথিবীতে প্রয়োজনের তাগিদে শিবপূজাও করে, শিশুহত্যাও করে। ভাবিয়া দেখিতেছি, এ জগতে প্রয়োজনের দাবিটাই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ দাবি। দয়া, মায়া, বিবেক, নীতি সমস্ত গুঁড়া করিয়া দিয়া প্রয়োজনের এই লৌহ-'রোলার'টা দুনিয়ার রাজপথ দিয়া সগর্জনে চলিয়াছে। ইহার চাপে মা-ও ছেলের গলা টিপিয়া ধরে। স্বামী স্ত্রীকে অপরের—

"আমার দড়িটা ফিরিয়ে দাও।"

চমকিয়া দেখিলাম, আমার দিকে অপলক দৃষ্টিতে একটি বৃদ্ধা চাহিয়া আছে। মুখের চামড়া বলিরেখাঙ্কিত—কুঁচকাইয়া ঝুলিয়া পড়িয়াছে। মাথাটা জরাভারে কাঁপিতেছে। মাথার চুলগুলা শ্বেত

নয়, পীতবর্ণ। নিষ্প্রভ চক্ষুর দৃষ্টিটা আমার মুখের ওপর নিবদ্ধ করিয়া বৃদ্ধা আবার বলিল, "ফিরিয়ে দাও আমার দড়িটা, ফিরিয়ে দাও। আমার গলার দড়ি কেন তুমি খুলে দিয়েছিলে? কোথা রেখেছ সেটা, দাও। আবার আমি গলায় দড়ি দেব। আমার নিশ্চয় এখনও ভাল করে মরা হয় নি। আমার সব মনে পড়ছে, সমস্ত মনে পড়ছে।"

বৃদ্ধা বিহ্বল দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

"একে কি মরা বলে? নিশ্চয় আমি বেঁচে আছি এখনও। আমার হাতটা দেখ ডাক্তারবাবু, বোধ হয় আমি বেঁচে আছি। আমার সব মনে পড়ছে যে! দেখ তো—"

বৃদ্ধা তাহার কম্পিত দুই হস্ত প্রসারিত করিয়া আরও খানিকটা আগাইয়া আসিল। তাহার পর পুনরায় চীৎকার করিয়া উঠিল।

"দাও আমার দড়ি ফিরিয়ে, আমি ঠিক বেঁচে আছি। না, বেঁচে থাকতে আমি পারব না, পারব না, আমি পারব না। আমায় আবার মেরে ফেল তুমি।"

"তুমি তো মরে গেছ। প্রায় এক মাস আগে।"

"মিছে কথা। এক মাস আগে আমি মরবার জন্যে গলায় দড়ি দিয়েছিলাম, কিন্তু মৃত্যু আমার হয় নি। আমার সব মনে পড়ছে যে! আমার গলার দড়ি তুমি খুলে দিয়েছিলে।"

চুপ করিয়া রহিলাম। ভ্রূকুটি করিয়া তীব্রস্বরে বৃদ্ধা প্রশ্ন করিল —"খুলে দাও নি তুমি?"

"দিয়েছিলাম। কিন্তু তোমার মৃত্যুর পর।"

"আমার সব মনে পড়ছে কেন?"

"কি মনে পড়ছে?"

"উঃ, মর্মান্তিক সেই কথাটা! পটাপট সে আমার মুখে জুতো মেরে গেল। চুলের ঝুঁটি ধরে উঠোনে ফেলে পেটে লাথির পর লাথি মারলে, আমার বুকের পাঁজরার হাড় গুঁড়িয়ে গেল তার লাথির চোটে,—এই দেখ।"

যে স্থানটা চিরিয়া ভগ্ন অস্থিটি পরীক্ষা করিয়াছিলাম, বৃদ্ধা সেই ক্ষতস্থানটা দেখাইল।

"আমি আবার মরব। সত্যি বলছি ডাক্তারবাবু, আবার আমাকে মরতে হবে। তোমার দুটি পায়ে পড়ি ডাক্তারবাবু, আমায় মেরে ফেলো তুমি।"

তাহার গণ্ড বাহিয়া চোখের জল গড়াইয়া পড়িল।

"মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু কে জান? নিজের পেটের ছেলে। এত বড় শত্রু আর হয় না। বিশেষত সে যদি আমার মত বিধবার একমাত্র সন্তান হয়। শত্রু—শত্রু—দারুণ শত্রু। গর্ভে যতদিন ছিল, আমার রক্ত শোষণ করেছে। ভূমিষ্ঠ হবার পরও তার শোষণ বন্ধ হয় নি। চোঁ-চোঁ করে শতমুখে সে আমার রক্ত শুষেছে। দেহের রক্ত থেকেই না দুধ হয়? সেই দুধ সে আট বছর ধরে খেয়েছে। শুনেছেন কখনও, আট বছরের ছেলে মাই খায়? কত ঠাকুর-দেবতার দোর ধরে, কত মানত-পূজো করে এই ছেলেকে মানুষ করেছি! একটা ষষ্ঠী কখনও বাদ দিই নি, উপোসে উপোসে শরীর শীর্ণ হয়ে গেছে আমার।"

চকিতের মধ্যে আমার মনে সেই পুষ্করিণী-তীরের নীলষষ্ঠীর ছবিটা আবার ভাসিয়া আসিল। দেখিলাম, সবুজ গাছগুলিতে আগুন লাগিয়াছে—গগনস্পর্শী অনলশিখা দাউদাউ করিয়া জ্বলিতেছে। অস্তগামী সূর্যের সে দীপ্তি আর নাই, যেন একটা অঙ্গারখণ্ড। কোকিলটা দেখিতে দেখিতে শকুনি হইয়া গেল। পুষ্করিণীর জল রক্তে রূপান্তরিত হইয়াছে। তাহাতে শত শত লোলুপ কুম্ভীর একে একে আসিয়া জননীদের গ্রাস করিতেছে। জননীর আর্তনাদে চতুর্দিক মুখরিত। জীর্ণ শিবমন্দিরে বসিয়া আছে—শিব নয়, একটা বিকট রাক্ষস, জননীদের দুর্দশা দেখিয়া হা-হা করিয়া হাসিতেছে।

"একমাত্র ছেলে আমার। কত কষ্ট করে যে মানুষ করেছি

যখন সে যা চেয়েছে, তাই দিয়েছি। তার আকাঙ্ক্ষা মেটাবার জন্যে আমার যা কিছু ছিল, সব গেছে। শুনেছ কখনও তেরো বছরের ছেলে হাতে রূপোর হাত-ঘড়ি বেঁধে ইস্কুলে যায়? শুনেছ কখনও, যে ছেলে একটাও পাস করতে পারে নি, তার রোজ রোজ নতুন পোশাক চাই? কত রঙের কত ধরনের পাঞ্জাবি যে তার কিনে দিয়েছি! কত রকমের জুতো, কত রকমের ছড়ি! গ্রামের ইস্কুলে তার পড়তে মন হল না। শহরে গেল। কত কষ্টে যে তার খরচ যুগিয়েছি! আমার কষ্ট তুমি বুঝবে না ডাক্তারবাবু, মায়ের কষ্ট তুমি বুঝতে পারবে না। নিজের পেটের ছেলে যখন মদ খেয়ে এসে জুতো মারে, তখন মায়ের মনে কি যে হয়, তা বোঝবার তোমার ক্ষমতা নেই। সে তুমি বুঝতে পারবে না, সে তুমি বুঝতে পারবে না—দড়িটা আমার ফিরিয়ে দাও। আমি আবার মরি।”

কাহাকে দড়ি ফিরাইয়া দিব? কোথায় গেল সে?

বাতায়ন-পথে চাহিয়া দেখিলাম, চতুর্দিক মেঘাচ্ছন্ন। কেবল সামান্য একটু আকাশ এখনও নির্মেঘ রহিয়াছে। তাহাতে জ্বলজ্বল করিয়া একটা তারা জ্বলিতেছে। সমুদ্রের মধ্যে যেন একটি ক্ষুদ্র দ্বীপে আলো জ্বলিতেছে। কোন পথহারা পথিককে ও পথ দেখাইতেছে? ওই মেঘের সমুদ্রে কি কোন নাবিক আছে? থাকিলেও কি তাহার পথ হারায়? পথ হারাইলে কি ওই তারার আলোয় সে পথ পাইবে? তারার আলোয় কি পথ হারায় না?

কিন্তু কি সুন্দর—কি উজ্জ্বল ওই তারাটি! আর্দ্রা নক্ষত্র কি? পুঞ্জীভূত এই তমিস্রার মধ্যে ওই একক নক্ষত্রটি দেখিয়া ভরসা হয়। মনে হয়, সমস্ত কালো নয়, আলোও আছে। মনে ধীরে ধীরে আশার সঞ্চার ··। দেখিতে দেখিতে নির্মেঘ আকাশটুকুও মেঘে ঢাকিয়া গেল। নক্ষত্র ঢাকা পড়িল। মেঘের গুরু গুরু গর্জনে অন্ধকার শিহরিয়া উঠিল। ··ভাবিতেছি, আকাশ যাহার সৃষ্টি, মেঘও

কি তাহারই সৃষ্টি ? আলো এবং অন্ধকার কি একই কবির কবিতা ? পাপ এবং পুণ্য ? সত্য এবং মিথ্যা ?

"সত্য-মিথ্যার সৃষ্টিকর্তা আমরাই। মরে সেটা বুঝতে পেরেছি। আমাকে একটু জল দিতে পারেন ? বড় জ্বালা। আগুনটা এখনও যেন নেবে নি।"

একটি উলঙ্গ অর্ধদগ্ধ নারী দাঁড়াইয়া থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। তাহার পেট, বুক এবং পায়ের খানিকটা পোড়া। পেটের ও বুকের স্থানে স্থানে ছাল উঠিয়া গিয়া লাল মাংস বাহির হইয়া পড়িয়াছে। সর্বাঙ্গে বড় বড় ফোস্কা। এত দুঃখেও কিন্তু সে হাসিতেছে। একপিঠ চুল। কালো মুখটিতে বড় বড় চোখ দুইটি বেদনাতুর ; তবু যেন কৌতুকদীপ্ত।

"দিন না একটু জল। জ্বালা কমে নি এখনও—বড্ড জ্বলছে! মরে গেছি, তবু জ্বালা কমে না কেন বলুন তো ?"

কাঁদিতে কাঁদিতে মেয়েটি যেন হাসিতেছে। হাসি-কান্না যেন মেঘ ও রৌদ্রের মত তাহার মুখে আসা-যাওয়া করিতেছে। কালো, কিন্তু কি চমৎকার মুখশ্রী! হঠাৎ মনে হইল, এ কি সেই মেয়েটি, যাহার কথা কবি—

সেই মেয়েটি হাসিয়া বলিল—"কি ভাবছেন বলব ?"

"কি ?"

"সেই কবির কথা। সে এসেছিল বুঝি আপনার কাছে ? বেচারা! তার সব গল্প বিশ্বাস করেছেন আপনি ? কবিতা শুনিয়েছে সে আপনাকে ? বেশ কবিতা, নয় ?"

তাহার বড় বড় কৌতুকভরা সজল চক্ষু দুইটি আমার মুখের উপর স্থাপিত করিয়া ক্ষণকাল নীরব হইয়া রহিল।

"বেচারা আসল কথাটা যদি জানত! ভুলটা তার কোনদিন ভেঙে দিই নি। আমার স্বার্থ ছিল কিনা! এখন দেখা পেলে ভেঙে দিতাম। যদি সে আসে, তার ভুলটা ভেঙে দেবেন আপনি ?"

"কি ভুল ?"

"একদিনের জন্যও তাকে আমি ভালবাসি নি। কবিতা-টবিতা আমার মোটে ভাল লাগে না। আমার মনে হয়, ওসব ন্যাকামি। হয়তো আমি বুঝতে পারি না। তাই বলে ভাববেন না যে, আমি আমার স্বামীকেই ভালবাসতাম। স্বামীকেও আমি দেখতে পারতাম না। সে রক্তমাংসের শক্ত মানুষ ছিল না। যেমন লিকলিকে তার দেহ—তেমনি লিকলিকে তার মন। তার দেহ বা মনে এতটুকু শক্তির সন্ধান কখনও দেখতে পাই নি। সে যদি শক্ত সমর্থ বর্বর একটা দস্যুও হত, তা হলেও আমি ঢের বেশি সুখী হতাম। এম. এ. ডিগ্রী নিয়ে কি আমি ধুয়ে খাব ? না, এম. এ. পাশ প্রফেসার স্বামীকে আমার মোটে পছন্দ হয় নি। আমার একটা গল্প শুনবেন ? গল্প নয়, সত্যি কথা। যখন বেঁচে ছিলাম, তখন নিজের কাছেই কথাটা স্বীকার করতে লজ্জা হত। এখন লজ্জা কি, ভয়ই বা কি ?"

আর একটু কাছে সরিয়া আসিল।

আমাদের বাড়ির পাশে একটা ছোটলোক থাকত, বুঝলেন, ছোটলোক মানে গরীব লোক। আমাদের বাড়ির জানলা থেকে তাদের বাড়ির উঠোন দেখা যেত। কি ষণ্ডা লোকটা—মাথায় বাবরি-চুল, প্রকাণ্ড গোঁফ, গালপাট্টা-দাড়ি। দেখলে মনে হত, যেন যমদূত। সে রোজ এসে তার বউটাকে চুলের ঝুঁটি ধরে ঠেঙাত। বউটার কান্নার জ্বালায় পাড়ার সবাই অস্থির হয়ে উঠতাম। এক-একদিন আবার সেই লোকটা বউটাকে আদরও করত দেখতে পেতাম। অত অজস্র আদর করতেও কাউকে দেখি নি কখনও। অত সোহাগ কোন পুরুষ যে কোন স্ত্রীকে করতে পারে, তা আমার ধারণার অতীত ছিল। সত্যি বলছি, সেই বউটাকে দেখে আমার হিংসে হত। আহা-হা, অমন সুন্দর প্রজাপতিটা পুড়ে গেল, দেখুন !"

দেখিলাম, সেই রঙিন প্রজাপতিটা দীপশিখায় পড়িয়া সত্যই

পুড়িতেছে। একটা ডানা পুড়িয়া গিয়াছে, ছটফট করিতেছে। শুনিতে পাইলাম, সে যেন বলিতেছে—"যত হীন তোমাকে মনে করিয়াছিলাম, তত হীন তুমি নও। বন্দিনী, তবু তুমি সুন্দরী।"

পুড়িয়া নিঃশেষ হইয়া গেল। একটা বিকট গন্ধে চতুর্দিক ভরিয়া উঠিল। দীপশিখা দেখিলাম হাসিতেছে।

বিশ্বের সমস্ত নিস্তব্ধতা যেন ঘরটাতে ঘনাইয়া আসিল। কাহারও মুখে কোন কথা নাই।

হঠাৎ সেই মেয়েটি আবার কথা কহিল—

"ভাল আমিও বেসেছিলাম। কাকে জানেন? ওই কবিরই একটি ভাই ছিল, তাকে। সুন্দর ছেলে। সে কবিতাও লিখত না, লেখাপড়াও বেশি জানত না। কিন্তু চমৎকার ছেলে, কি তার স্বাস্থ্য, কত বলিষ্ঠ তার মন! বেশি কথা বলত না। নিজের পড়াশোনা নিয়েই থাকত। বি. এ. না কি পড়ত, তখনও তার লেখাপড়া শেষ হয় নি। বীরেন তার নাম। কবির কাছে কবিতা শোনবার ছুতোয় যেতাম তাকেই দেখতে। কবি মনে করত, আমি বুঝি তারই প্রেমে পড়ে গেছি। কবিতা শুনে মুগ্ধ হয়েছি, তাই নানা ছুতোয় রোজ যাই। কি ভীষণ অহঙ্কারী এই কবিরা!"

"আমি যেতাম বীরেনকে দেখতে। কত মিথ্যেই যে সত্যের মুখোশ পরে! কবি ছিলেন আমার স্বামীর বন্ধু। একটা বড় বাড়ির দুটি বিভিন্ন অংশে থাকতাম আমরা। কবির বাড়িতে আমার অবাধ যাতায়াত ছিল। তাই বলে ভাববেন না যে, স্বামী আমার উদার-মতাবলম্বী ছিলেন। একেবারেই তা নয়। সাহস করে বারণ করবার মত বলিষ্ঠতা তাঁর ছিল না। তাঁর দুর্বলতার এই সুযোগ নিয়ে আমি যখন খুশি ওদের বাড়ি চলে যেতাম। আর একটা সুযোগও ছিল। কবির একজন বৃদ্ধা জ্যেঠাইমা ছিলেন বাড়ির কর্ত্রী। তিনি আমাকে খুব ভালবাসতেন। বার বার আমায় ডেকে পাঠাতেন, তাঁর কাছে

যাওয়ার নাম করে রোজ যেতাম সেখানে। কবি আমাকে একলা পেলেই কবিতা শোনাতেন। বুঝতাম, কবিতার মারফত প্রেম-নিবেদন করছেন। সব বুঝতাম, কিছু বলতাম না। বরং মুগ্ধ হবার ভান করতাম। ভান করতে আমরা কত পটু, তা জানেন তো?"

ফিক করিয়া একটু হাসিল। তাহার পর আর্তনাদ করিয়া উঠিল—"উঃ, বড় জ্বালা করছে! সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল আমার! আগুনটা কি নেবে নি এখনও? একটু ব্যবস্থা করুন না!"

"গল্পটা আগে শেষ কর।"

"এ অসমাপ্ত গল্প। বীরেনকে আমি পাই নি। লোকে ঘেয়ো কুকুরকে যেমন দূর-দূর করে তাড়িয়ে দেয়, সে তেমনই করে একদিন তাড়িয়ে দিলে আমাকে। একদিন মাত্র তাকে একা পেয়েছিলাম। পাঁচ মিনিটের জন্যে—মাত্র পাঁচ মিনিট, তাও বোধ হয় নয়। লজ্জার মাথা খেয়ে সেদিন তার কাছে সমস্ত মনখানা মেলে ধরেছিলাম। সে কি বললে জানেন? 'দ্বিতীয় বার এ কথা আর আমার কাছে উচ্চারণ করবেন না। আমি জানতাম, আপনি ভাল। এ কি আপনার ব্যবহার, ছি, ছি! বাড়ি যান।' এই বলে সে বেরিয়ে চলে গেল। বজ্রাহতের মতন নির্বাক হয়ে রইলাম। মনে হতে লাগল, যেন পায়ের তলা থেকে মাটি সরে যাচ্ছে। আমার সমস্ত ইহকাল, সমস্ত সত্তা যেন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল, সমস্ত বিশ্বভুবন যেন আমার চোখের সামনে দুলতে লাগল। ঠিক সেই সময় কবিও এলেন। তিনি আমাকে একা পেলেন। তাঁর মানসী যে আমি ছাড়া আর কেউ নয়, এ কথা তিনিও এতকাল বলবার শুভযোগ খুঁজে পান নি। সেই স্নিগ্ধ সন্ধ্যার সুদুর্লভ নির্জনতার নিবিড়তায়, —কি ছাই আমার ভাল মনেও নেই সে-সব ভাষা। মোট কথা তিনিও প্রেম-নিবেদন করলেন সেদিন। বীরেনের কথাগুলো আমার কানে বাজছিল। অবিকল সেই কথাগুলি আবৃত্তি করে দিলাম।"

মেয়েটি আবার চুপ করিয়া গেল।

"কি হল তারপর ?"

"তারপর তো আপনি সব জানেন। কবি সেই দিন রাত্রেই রিভলভার দিয়ে আত্মহত্যা করলেন। পরদিন আমিও পুড়ে মলাম। পুড়ে মরবার আগে অবশ্য স্বামীর সঙ্গে আমার ঝগড়া প্রায় রোজই যেমন হত তেমনই হয়েছিল। পাড়ার লোকে জেনেছে, আমার মৃত্যুর কারণ আমার স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া। আমার স্বামী বুঝলেন, মৃত্যুর কারণ কবির সঙ্গে প্রেম। কবির ধারণা হয়েছিল বোধ হয় যে, আমি তাকে ভালবাসতাম। কবির মৃত্যুর কারণ আপনারা ঠিক করেছিলেন বুঝি পাগলামি—টেম্‌পরারি ইন্‌স্যানিটি। বীরেন কি ভেবেছে সেই জানে। সত্য-মিথ্যার কেমন একটা হেঁয়ালি বলুন তো ?"

মেয়েটি হাসিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে আবার তাহার মুখের হাসি মিলাইয়া গেল। চক্ষু দুইটিতে কাতর মিনতি ফুটিয়া উঠিল আবার। "উঃ, বড় জ্বালা ! একটু কিছু করুন না, ডাক্তারবাবু। বড় জ্বালা !"

জীবিতদের চিকিৎসা হয়তো কিছু জানি। মৃতের কি চিকিৎসা করিব ? শিখি নাই তো। মূঢ়ের মত বসিয়া শুনিতেছি—"বড় জ্বালা—বড় জ্বালা—বড় জ্বালা—বড় জ্বালা—বড় জ্বালা— !" ধীরে ধীরে আর্তস্বর অন্ধকারে মৃদুতর হইয়া মিলাইয়া গেল।

বাতায়ন-পথে চাহিয়া বসিয়া আছি। নীরন্ধ্র অন্ধকারকে চিরিয়া চিরিয়া সর্পাকৃতি বিদ্যুৎশিখা আকাশ ব্যাপিয়া সঞ্চরণ করিতেছে। সামনের মাঠে কুলগাছটা যেন প্রেতিনীর মত দাঁড়াইয়া আছে। তাহার মাথায় অসংখ্য জোনাকি। প্রেতিনীর সহস্র জ্বলন্ত চক্ষু যেন অন্ধকারে কাহাকে খুঁজিতেছে।

কাহাকে ?

একটা দমকা হাওয়া ঘরে ঢুকিল। বইয়ের পাতাগুলা ফরফর

করিয়া উড়িতে লাগিল। বইটা তুলিয়া লইয়া আবার গল্পে মন দিলাম।

…"খুব সঙ্কীর্ণ পথ। দুই ধারে আকাশচুম্বী খাড়া উঁচু পাহাড়। গিরিসঙ্কটের ভিতর বেশ অন্ধকার। মেয়েটির চোখে মুখে একটা ভীত চকিত ভাব। রাত্রি আসবার আগে সে এই সঙ্কীর্ণ পথটুকু অতিক্রম করে যেতে পারলে যেন বাঁচে। হঠাৎ সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। মটাস করে একটা গাছের ডাল ভাঙার শব্দ যেন শুনতে পেলাম। অন্ধকারে—প্রায় পঞ্চাশ গজ দূরে, কি যেন একটা দাঁড়িয়ে আছে মনে হল। কি ওটা?

'ছুটে পালাও তুমি'—মেয়েটি মনে হল বলছে। তার মুখ সাদা ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। ডান হাত দিয়ে সে তার ছোট কুড়ুলের বাঁটটি চেপে ধরেছে।

শক্তি থাকলে হয়তো আমি ছুটে পালিয়ে আসতাম। কিন্তু আমি নড়তে পারলাম না। ভয়ে আমার পায়ের পেশীগুলো যেন অসাড় হয়ে গেল। চলচ্ছক্তিরহিত হয়ে পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইলাম। এইবার সেই বস্তুটাকে বেশ স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম—একটা শ্বেতভল্লুক। ঝোপের ভেতর থেকে মুণ্ড আর সামনের পা দুটো বের করে আমাদের দিকে চেয়ে আছে। মুখে একগোছা 'বেরি'ফল। তার আহারে আমরা বিঘ্ন উৎপাদন করেছি। প্রকাণ্ড বড় ভল্লুক। গায়ের লোম দেখলে মনে হয়, খুব বড়।

'পালাও'—আমিও মেয়েটির কানে কানে বললাম। আমার মনে সহসা কেন জানি একটা পৌরুষভাব জেগে উঠল। মনে হল, মেয়েটি পালিয়ে যাক, আমি বুক দিয়ে ওকে আগলাব। ভালুকের সঙ্গে লড়তে হয় যদি, তাও স্বীকার। মনে মনে এই পুরুষোচিত সঙ্কল্প করলাম বটে, কিন্তু তখন আমার সর্বাঙ্গ অবশ। বৃহৎ পশুটা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। মেয়েটি কিন্তু পালাল না। সে যা

করলে, তাও কেউ যে কোনদিন করতে পারে, তা কখনও কল্পনা করি নি। সে না পালিয়ে ভালুকটার দিকে এগিয়ে গেল। তারপর ধীরে ধীরে সে তার অঙ্গচ্ছদ খুলে ফেললে। খুলে ফেলে সে আঙুল দিয়ে তার 'ব্রিচেস' ভালুকটাকে দেখাতে লাগল, এই রকম চওড়া 'ব্রিচেস' মেয়েরা পরে। অর্থাৎ সে যে নারী এই কথাটি সে ভালুককে বোঝাবার চেষ্টা করলে। ভালুকটা একবার চেয়ে দেখলে, ফলের গোছাটা মুখ থেকে তার পড়ে গেল। নাসারন্ধ্র থেকে বার দুয়েক ফোঁস ফোঁস আওয়াজ করে জঙ্গলের নিবিড়তায় দেখলাম সে অদৃশ্য হয়ে গেল। আর ফিরে এল না।

ল্যাপদের ধারণা, শ্বেতভল্লুক মেয়েদের কিছু বলে না—"

"আমরা কিন্তু শ্বেতভল্লুক নই, আমরা মানুষ। নারীমাংসে আমাদের অরুচি নেই।"

"কে ?"

চমকাইয়া উঠিলাম। একটা মুণ্ড শূন্যে ঝুলিতেছে। পুরু পুরু ঠোঁট দুইটিতে পাশবিক একটা হাসি। মাথার চুলগুলো খোঁচা খোঁচা এবং খাড়া। মুখের গোঁফ-দাড়িও সেইরূপ। একটা সজারু যেন সর্বাঙ্গের কাঁটাগুলাকে উদ্যত করিয়া শূন্যে ঝুলিয়া আছে।

"নারীমাংস আমার ভারি প্রিয় জিনিস ছিল। অভাবও কোনদিন হয় নি। বাবা প্রচুর টাকা রেখে গিয়েছিলেন। বাদ সাধল কিন্তু বিবেক। এই বিবেকের টুঁটি চেপে ধরবার জন্যে কি কম আয়োজন করেছিলাম ? মোসায়েব, মদ, আফিং, গাঁজা, কোকেন, যত রকম হতে পারে। কিন্তু পারলাম না। বিবেককে হত্যা করতে পারলাম না। বিবেকই আমাকে হত্যা করলে। আচ্ছা, ডাক্তার, হত্যা করলে মানুষের ফাঁসি হয়, বিবেকের ফাঁসি হয় জান ? বিবেকের প্ররোচনায় কত হত্যাকাণ্ড রোজ হয় না ? অনেক··· এক-আধটা নয়, অনেক। অথচ এই বিবেককে কেউ শাস্তি দেয় না, কেমন তোমাদের আইন ?"

লোকটা স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে খানিকক্ষণ চাহিয়া রহিল। তাহার পর নিজের প্রশ্নের জবাব নিজেই দিয়া হাসিয়া উঠিল—"আইনের দোষ কি? বিবেককে তো আর ধরা যায় না। তার হাতে হাতকড়ি লাগাবারও উপায় নেই। আশ্চর্য অশরীরী জিনিস এই বিবেক! অথচ কি ভয়ঙ্কর! আমার ঘাড় ধরে নিয়ে গিয়ে রেল-লাইনের ওপর মুখটা গুঁজরে ধরে রেখে দিলে, যতক্ষণ না বম্বে-মেলটা আমার ঘাড়ের ওপর দিয়ে চলে গেল। কিছুতে নড়তে পারলাম না আমি। আচ্ছা ডাক্তার, আমার ধড়টা কোথা গেল বলতে পার? ধড়টা না হলে যে চলছে না!"

কাটা মুণ্ড আবার শূন্যে মিলাইয়া গেল। যেন ওই ক্যালেণ্ডার-খানার পাশে অন্তর্হিত হইল।

সামান্য একটা ক্যালেণ্ডার। তাহারই দিকে চাহিয়া বসিয়া আছি। ক্যালেণ্ডারের ছবিটাকে এত ভাল করিয়া আর কোনদিন দেখি নাই। ছায়ামুণ্ডটা উহার পাশ দিয়া মিলাইয়া গেল, তাই ছবিটার দিকে নজর পড়িল। অগ্রাহ্য করিবার মত ছবি তো নয়। রূপদক্ষ শিল্পীর অন্তরের সৌন্দর্যবোধ তুলির টানে টানে যেন মূর্ত হইয়া উঠিয়াছে। নীলাম্বরী শাড়ির আবেষ্টনীতে সুন্দর মুখখানি অপরূপ। এতকাল ধরিয়া সম্মুখে টাঙানো আছে, লক্ষ্যই করি নাই আশ্চর্য!

মানুষের জীবনে সব সময়ে সব জিনিস লক্ষ্য করিবার সুযোগ আসে না। মানুষ এক সময় একটা জিনিস লইয়াই মাতিয়া থাকে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাকি জিনিসগুলার সহিত সে বাহ্যিক লৌকিকতা রক্ষা করে মাত্র। অন্তর দিয়া একই কালে সমস্ত জিনিসের সত্তাকে সে সমান আগ্রহে অনুভব করে না। করিতে পারে না। ইহা তাহার ক্ষমতা ও অক্ষমতা। ফুলকে যখন দেখি, পাখির কথা বিস্মৃত হই।

চিত্রার্পিতা সুন্দরী একদৃষ্টে আমার দিকে চাহিয়া আছে।

ভাবিতেছি, ছবি কি ভালবাসে? আমাদের মত উহার বুকেও কি সুখ-দুঃখের দোলা লাগে? লাগিলেও কি আমাদের মত বিচলিত হয়? ছবি কি কখনও কাঁদে? হয়তো কাঁদে। আমরা দেখিতে পাই না। ছবির ক্রন্দনের ভাষা হয়তো অশ্রু নয়, আর কিছু। জড় ও চেতনের মধ্যে সত্যই কি কোন তফাত আছে? এই নিখিল বিশ্বের বিরাট বস্তুপ্রবাহের মধ্যে কে জড়, কে চেতন, কে ঠিক করিয়া দিবে? সীমারেখা কোথায়? সীমা বলিয়া কিছু আছে কি? সীমা যদি কিছু থাকে, তবে তাহা আমাদের বুদ্ধির। আমাদের নিজেদের বুদ্ধি সীমাবদ্ধ বলিয়া আমরা প্রত্যেক জিনিসের সীমা নির্দিষ্ট করিতে চাই। সীমা না পাইলে আমরা অসীমের কল্পনা করিতে পারি না। গণ্ডির ভিতর আছি বলিয়াই ভূমার কল্পনা করি। ভূমার কল্পনা করি, কিন্তু গণ্ডি রচনা করিতেও ছাড়ি না। সারা-জীবন নানা ভাবে গণ্ডির পর গণ্ডি রচনা করিয়া চলিয়াছি। তাহাতেই আমাদের তৃপ্তি। অথচ একটু ভাবিয়া দেখিলেই সমস্ত সীমা বিলুপ্ত হইয়া যায়, চেতন জড় হয়—জড়ের চেতন জাগিয়া উঠে। সমস্ত গণ্ডি মুছিয়া যায়। জীবন ও মরণের ব্যবধান আর থাকে না।...

মনে হইল, ছবির চোখের যেন পলক পড়িল। পীবর বক্ষটি যেন দুলিয়া উঠিল, দীর্ঘনিশ্বাস মোচনের শব্দ যেন পাইলাম। মনে হইতেছে, এইবার যেন কথা কহিবে। একা অন্ধকার রজনীর নিঃসঙ্গতার মধ্যে ওই ক্যালেণ্ডারের ছবিখানিকে অত্যন্ত নিকট-আত্মীয় বলিয়া মনে হইতেছে। ইচ্ছা করিতেছে, উহাকে ডাকিয়া বলি—"হে সুন্দরী, রেখার বন্ধনে কে তোমাকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছে? তুমি প্রাণময়ী হও, সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াও। প্রমাণ করিয়া দাও যে, জড় ও চেতনার কোন প্রভেদ নাই।"

সহসা এক ফালি জ্যোৎস্না আসিয়া বাতায়ন-পথে প্রবেশ করিল।

চাহিয়া দেখিলাম মেঘ কাটিয়া গিয়াছে। কৃষ্ণপক্ষের ক্ষীয়মাণ চন্দ্র উঠিতেছে। মুগ্ধ হইয়া চাহিয়া রহিলাম। দেখিলাম, আশেপাশে এখনও কালো কালো মেঘ ভাসিয়া বেড়াইতেছে। মনে হইল, এই কৃষ্ণপক্ষের ম্রিয়মান চন্দ্রকলার মুখে একটা বেদনার হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে। সুদূর আকাশ হইতে মনে হইল তাহার কথা আমি শুনিতে পাইতেছি—

"আমাকে দেখিয়া অত মুগ্ধ হইয়া চাহিয়া আছ কেন? এখন তো আমার মধ্যে মুগ্ধ হইবার মত কিছু নাই। একদিন ছিল বটে, যখন আমার পর্বতের শিখরে শিখরে আগ্নেয়গিরির উত্তপ্ত মহিমা প্রধূমিত হইয়া উঠিত, প্রতি পরমাণুতে প্রাণের স্পন্দন অনুভব করিতাম, প্রদীপ্ত জ্বালায় নিজের কক্ষে ঘুরিতে ঘুরিতে একদা আমিও আকাশের দীপালীতে আমার অন্তর-দীপটিকে সগৌরবে তুলিয়া ধরিয়াছিলাম, আজ কিন্তু আমার কিছু নাই। এখন আমি নিবিয়া গিয়াছি। এখন আমি আমার পূর্ব-গৌরবের কঙ্কাল মাত্র। মহাকাশে প্রেতের মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছি। জীবন্ত সূর্যের করুণা-কিরণে উদ্ভাসিত হইয়া এই যে আমার প্রকাশ, ইহাতে আমার গৌরবের কিছুই নাই। আমি মৃত, আমি প্রেতাত্মা।"

মেঘ আসিয়া কৃষ্ণ যবনিকা টানিয়া দিল। চন্দ্রমা অবলুপ্ত হইল।

একটা ভেকের আর্তস্বর অন্ধকারকে বিদীর্ণ করিতেছে। সাপে ধরিয়াছে। কোঁক-কোঁক-কোঁ—একটানা একঘেয়ে শব্দ একটা—সুর আছে, তালও আছে।

সঙ্গীত?

মনে হইল কে যেন একখানা অতি শীতল হস্ত আমার কাঁধের উপর রাখিয়াছে! ফিরিয়া দেখি, একটি মেয়ে। কিশোরী, যুবতী, কি বৃদ্ধা বুঝিবার উপায় নাই। একদা হয়তো পরমা সুন্দরী ছিল, জানি না, এখন বীভৎস। সমস্ত মুখখানা ফুলিয়া পচিয়া গিয়াছে। স্থানে স্থানে মাংস নাই। বিদীর্ণ স্ফীত উদরটা হইতে পচা অস্ত্রগুলা ঝুলিয়া পড়িয়াছে। বিগলিত দৃষ্টিহীন চক্ষু দুইটি নিষ্পলক।

"কোথা গেল সে? কোথায় হারিয়ে গেল? আমরা যে একসঙ্গে জলে ডুবেছিলাম, আর তো তাকে দেখতে পাচ্ছি না। কোথায় গেল? মরেও কি তাকে পাব না? তাকে যে আমি চাই! ওগো, কে তুমি, খুঁজে দাও না তাকে, আমি খুঁজে পাচ্ছি না যে! চারিদিকে এ কি অন্ধকার—" হাতড়াইতে হাতড়াইতে মেয়েটি অন্ধকারে ধীরে ধীরে বিলীন হইয়া গেল। চক্ষু দুইটিতে অন্ধের অর্থহীন দৃষ্টি।

মুখে হাত চাপা দিয়া কে যেন খিলখিল করিয়া হাসিয়া উঠিল। ফিরিয়া দেখি, একজন প্রৌঢ় ভদ্রলোক হাসিমুখে আমার দিকে তাকাইয়া আছেন। মুখটা রক্তহীন, ফ্যাকাশে।

"ভুল ভাবছেন আপনি। সব আত্মহত্যার কারণ প্রেম নয়। আমি প্রেমে পড়ে মরি নি। আমি মরেছি আপন খুশিতে সজ্ঞানে বহাল তবিয়েত। তাই বলে' ভাববেন না যে, জীবনে কখনও প্রেমে পড়ি নি। অনেকবার পড়েছি। পড়েছি এবং উঠেছি। কিন্তু আত্মহত্যা করবার প্রয়োজন কোনদিন অনুভব করি নি।" ভদ্রলোক পিছন দিকে দুই হাত দিয়া শিস দিতে দিতে ঘরময় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ভাবটা যেন—আত্মহত্যা করিয়াছি বটে, কিন্তু তাহাতে এমন আর কি হইয়াছে, যাহা লইয়া ক্রমাগত কবিত্ব করিতে হইবে।

হঠাৎ আমার কাছে আসিয়া আবার তিনি বলিলেন—

"ব্যথা, অভিমান কিছুই নয়। বিদ্রোহ। জীবনে কখনও কোন ব্যাপারে হার মানি নি। এম.এ. পর্যন্ত সব পরীক্ষায় বরাবর ফার্স্ট হয়েছি। শুধু পড়াশোনাতেই নয়, খেলাতেও ফার্স্ট। এমন কি তাস-খেলাতেও।"

ভদ্রলোক স্মিতমুখে আমার দিকে চোখ বড় বড় করিয়া চাহিলেন।

"প্রেমের ব্যাপারেও চিরকাল জিতেছি। পেটের জন্যেও কারও কাছে হাত পাতবার দরকার হয় নি। 'ব্যাচিলর' মানুষ, আনন্দেই

ছিলাম। হঠাৎ একদিন সকালে উঠে দেখি—কি দেখলাম বলুন তো ?”

সকৌতুকে আমার দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া থাকিয়া বলিয়া উঠিলেন—“না, না, ব্যাঙ্ক ফেল নয়। সকালে হঠাৎ লক্ষ্য করলাম, দু-একগাছা চুল পেকেছে। সমস্ত সকালটা মন খারাপ হয়ে রইল। খবরের কাগজে মন দিতে পারলাম না। বন্ধুরা এলেন। আলাপ জমল না। দিনটা একরকম কাটল। রাত্রে কিন্তু ওই পাকা চুল দুটো বড় জ্বালাতন করতে লাগল। যেই একটু ঘুম আসে, অমনই মনে হয় যেন মাথার পাকা চুল দুটো সাদা সাদা প্রেতমূর্তির মত সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। বলছে, ওহে ভাগ্যবান ধনীর দুলাল, এইবার তো সময় হল। এইবার হার মানতে হবে। আর দেরী নেই। ঘুম হল না। এমনই প্রায় রোজ। আমাদের বাড়ির পাশে একজন থুড়থুড়ে বুড়ো থাকত। একদিন স্বপ্নে দেখলাম, সে যেন বলছে, ‘কি হে ছোকরা, ভারি যে আমাকে অনুকম্পা করতে! এইবার ?’ বলছে আর হাসছে।”

ভদ্রলোক চুপ করিলেন।

“বুড়োটা সত্যিই সকলের কৃপা-পাত্র ছিল। মুখে একটি দাঁত ছিল না। চোখে দেখতে পেত না। উপযুক্ত ছেলে-মেয়ে নাতি-নাতনী সবাই একে একে চোখের সামনে মরে গেল। বুড়োর কিন্তু মৃত্যু নেই। মহাকাল যেন চাবকাচ্ছে তাকে ধরে। আমারও মনে হল, এই তো আমারও ‘নোটিস’ এসে গেছে। এইবার কোন্‌দিন এসে চুলের মুঠিটা ধরবে। তারপর শুরু হবে টানাটানি। এক দিকে ধরবে আত্মীয়-স্বজনরা, আর এক দিকে যমদূতরা। সেই টানাটানির মধ্যে দারুণ যন্ত্রণায় প্রাণটা বেরিয়ে যাবে। অসহ্য! শেষকালে জরার কাছে পরাভব স্বীকার করব ? কেন স্বীকার করব—রিভলভার থাকতে ?...ভাল করি নি ?”

হাসিমুখে ভদ্রলোক প্রশ্ন করিলেন।

"মাথায় গুলি করি নি। তার কারণ, আমার এমন সুন্দর চেহারাটা নষ্ট করতে মায়া হল। আচ্ছা, দেখুন তো ডাক্তারবাবু, আমার মুখের চেহারা ঠিক আছে তো ?"

ভদ্রলোক স্মিত মুখে নিজের মুখটা তুলিয়া ধরিলেন। তাহার পর কোটের বোতামগুলি ধীরে ধীরে খুলিয়া তিনি দুই হাত দিয়া কোটটা ফাঁক করিয়া বলিলেন—"এই দেখুন, মহাকালের ওপর টেক্কা দিয়েছি।"

বুকে ঠিক হার্টের উপর নিদারুণ ক্ষতটা দগদগ করিতেছে। মনে হইল, যেন হাসিতেছে।

ভদ্রলোক কোটের বোতামগুলি লাগাইয়া বলিলেন—"এত সহজে মরেছিলাম, তার কারণ বোধ হয় পৃথিবীতে আমাকে বেঁধে রাখবার মত কেউ ছিল না। বাবা-মা ছেলেবেলায় মারা গিয়েছিলেন। সুখের পারাবতের মত কতকগুলি বান্ধব-বান্ধবী এসে. চারিদিকে বকবকম করতেন বটে; কিন্তু তাঁদের আকর্ষণ এত শক্ত ছিল না, যার খাতিরে জরার অত্যাচার সহ্য করা যায়।"

ভদ্রলোক নির্নিমেষ নয়নে চাহিয়া রহিলেন। দেখিলাম মুখের হাসি মিলাইয়া গিয়াছে।

"ওটা আপনার ভুল ধারণা। সব মৃত্যুর কারণ প্রেম নয়, অপ্রেমও হতে পারে। জীবনে আমার কোন বন্ধন ছিল না, তাই সহজে মরেছি।" আবার একদৃষ্টে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন। হঠাৎ মনে হইল, তাঁহার চোখে কি যেন চকচক করিতেছে! অশ্রু নাকি ? ভাল করিয়া লক্ষ্য করিবার পূর্বে ছায়ামূর্তি অন্তর্হিত হইল। মুখ ফিরাইয়া দেখিলাম, ক্যালেণ্ডারের মেয়েটি হাসিতেছে।

বাতায়ন-পথে চাহিয়া বসিয়া আছি। আকাশের আবার রূপ বদলাইয়াছে। পুঞ্জীভূত মেঘ বিদীর্ণ করিয়া আবার চাঁদ উঠিতেছে। প্রকাণ্ড একখানা নিকষকৃষ্ণ মেঘ চৌচির হইয়া ফাটিয়া গিয়াছে। সেই ফাটল দিয়া অবিরলধারে জ্যোৎস্না ঝরিয়া পড়িতেছে। সৃষ্টি

জুড়িয়া আলো-আঁধারের এই চিরন্তন লীলা। সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে আছে, শেষ পর্যন্ত থাকিবে। রৌদ্রে, জ্যোৎস্নায়, ইন্দ্রধনুতে, বর্ণালঙ্কৃত মেঘমালায় ঋতুতে ঋতুতে আলোআঁধারের যুগলরূপ নানা বেশে রূপায়িত হইয়া আছে। ইহাদের বিরহ-মিলনের অনবদ্য প্রকাশে দশ দিক সুরঞ্জিত।

আঁধার-বিরহিত আলোক সমস্ত দিনের তীব্র রৌদ্রদাহে কামনা করে স্নিগ্ধ অন্ধকারকে। দিবসের এই আঁধার-কামনা মূর্ত হয় ঘনকৃষ্ণ মেঘমালায়, গভীর জলরাশির ঘননীল কান্তিতে, অরণ্যের ছায়ার স্নিগ্ধতায়। আলোক-বিরহিত গাঢ় অন্ধকার রাত্রির নির্জনতায় ধ্যান করে আলোকের শুভ্র মূর্তি। অন্ধকারের আলোক-স্বপ্ন মূর্ত হয় লক্ষ কোটি নক্ষত্রে, জ্যোৎস্নার স্নিগ্ধ আবেশে, অনন্ত-প্রসারিত শুভ্র ছায়াপথে।

হঠাৎ মনে হইল, আকাশের গায়ে যেন কবির মুখখানা ফুটিয়া উঠিল। এই বিদীর্ণ মেঘখানা যেন তাহার বিদীর্ণ মাথাটা, জ্যোৎস্না-ধারা যেন তাহার বিগলিত মস্তিষ্ক গড়াইয়া গড়াইয়া পড়িতেছে। মনে হইল, সমস্ত আকাশ, সমস্ত অন্ধকার পরিপূর্ণ করিয়া কবির গম্ভীর স্বর প্রতিধ্বনিত হইয়া উঠিল—

"গভীর বিরহ মাঝে কত যে মাধুরী আছে,
তৃপ্ত ও অতৃপ্ত কত সাধ!
কত সত্য, কত ভ্রান্তি, কত জ্বালা, কত শান্তি,
কত তীব্র হরষ-বিষাদ!
কে বুঝিবে তার মূল্য? কিবা আছে তার তুল্য?
বুঝিবে না—চাহি না বুঝাতে,
চাহি না আনিতে টানি কাহারও সান্ত্বনা-বাণী,
এই অশ্রু হবে না মুছাতে।
ভরি সর্ব চেতনারে অন্তরে বেদনারে
স্নেহভরে করিব লালন
বেদনাই প্রিয়তম চিত্ত ভরি থাক মম,
চাহি না তা করিতে ক্ষালন।"

অকস্মাৎ বাতাসের বেগ বাড়িয়া উঠিল। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কালো কালো মেঘের দল চতুর্দিক হইতে দানবের মত ছুটিয়া আসিয়া আকাশ ছাইয়া ফেলিল। সোঁ—সোঁ—সোঁ—সোঁ। অন্ধকারের বক্ষ হইতে যেন লক্ষ লক্ষ কালনাগিনী জাগিয়া উঠিয়াছে।...চাঁদ ঢাকা পড়িয়া গেল। কবি ও তাহার কবিতা ঝড়ের বেগে কোথায় উড়িয়া চলিয়া গেল। উন্মত্ত বাতাস ঘরে প্রবেশ করিয়া তাণ্ডব-নৃত্য জুড়িয়া দিয়াছে।...টেবিল হইতে একখানা খাম উড়িয়া ঘরময় ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল।...ক্যালেণ্ডারের হাস্যমুখী তন্বীর অধরে আর হাসি নাই। সে ভয়ে থরথর করিয়া কাঁপিতেছে। সমস্ত অন্ধকার ভরিয়া একটা ক্রন্দন গুমরিয়া উঠিল।

"ডাক্তারবাবু, সেই ছেলেটি কি আর এসেছিল ?"

সেই সুন্দরী বারাঙ্গনাটি আসিয়াছে। জীবনে কাহাকেও ভালবাসিতে পারে নাই বলিয়া একদিন গলায় দড়ি দিয়াছিল যে, সেই। সত্যই অপূর্ব সুন্দরী। মৃত্যু তাহাকে মলিন করে নাই। একটু ইতস্তত করিয়া আবার জিজ্ঞাসা করিল, "সেই বোমার দলের ছেলেটি আবার আসবে কি ?"

"কি করবে তা জেনে ?" দেখিলাম, ঠোঁট দুইটি কাঁপিতেছে।

"ঠাট্টা করবেন না ?"

"না।"

"দেখুন, আমার আকণ্ঠ পিপাসায় ভরে আছে। সারা জীবনটা এক বিন্দু ভাল ঠাণ্ডা জল পেলাম না। পচা নর্দমার জল কখনও খাওয়া যায় ? জীবনে একটাও নদী দেখতে পাই নি, খালি নর্দমা —কেবল দুর্গন্ধ পচা জল। দারুণ পিপাসায় তাও কতবার তো খেয়েছি। তবু মৃত্যু হয় নি। মরবার জন্যে শেষটায় দড়ি খুঁজতে হল। কিন্তু মৃত্যুর পরও দেখছি, পিপাসা তো সমানই আছে। একটুও কমে নি। সমস্ত সত্তা এক বিন্দু ভাল জলের জন্যে এখনও হাহাকার করছে। একটু জল পেলে যেন বাঁচি। সেদিন সেই

কবিকে ঠাট্টা করলাম বটে, কিন্তু সে ঠিকই বলছিল বোধ হয়। জীবনে প্রেমের আবির্ভাব হলে ক্ষুদ্র জলাশয় সমুদ্র হয়ে ওঠে, লোহা সোনা হয়ে যায়। সেদিন সেই যে ছেলেটি দেখলাম আপনার কাছে, কোথায় সে? আহা, ঠিক যেন ঝরনা! ও কি—ও কে—এ কি—মৃত্যুর পরও লোকটা সঙ্গে সঙ্গে এসেছে! এখানেও মুখপোড়ারা সঙ্গ ছাড়বে না।" রমণী অন্তর্হিত হইল।

দেখিলাম, সম্মুখে দাঁড়াইয়া একটি লোক টলিতেছে। লম্বা শীর্ণ তাহার দেহ। গালের হাড় দুইটা অসম্ভব রকম উঁচু। জবাফুলের মত চক্ষু দুইটা বিস্ময়-বিস্ফারিত করিয়া আমার দিকে চাহিয়া আছে। জড়িতস্বরে শুনিলাম বলিতেছে—"ডাক্তার, কতখানি মাল আমার পেট চিরে পেয়েছিলে বল তো বাবা? সেদিন কি সোজা মাল টেনেছিলাম! দু বোতল নির্জলা হুইস্কি। পরের পয়সায়। মাইরি বলছি—"

লোকটা আবার টলিতে লাগিল। "পরের পয়সায় বাজি রেখে খেয়েছিলাম। গলাটা জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে গেস্‌ল, মাইরি বলছি। আমার মতন পাঁড় মাতাল সঙ্গে সঙ্গে কাত—কোন শালা মিছে কথা বলে!—এক্কেবারে বেহুঁশ।"

আবার খানিকক্ষণ টলিয়া সে শুরু করিল—"পরের পয়সায়, মাইরি বলছি। নিজের পয়সা পাব কোথা? ট্যাঁক তো হরদম গড়ের মাঠ। এক জমিদার-পুত্তুর কাপ্তেন পাকড়েছিলাম, সেই শালার সঙ্গে বাজি রেখে তারই পয়সায় এই কাণ্ড। মাইরি বলছি। ভেবেছিলাম, ঘুমিয়ে পড়লে সব ঠিক হয়ে যাবে। এখন তো দেখছি, যা বাবা, সব ফরসা—মরেই গেছি। এমন বেকুব আর জীবনে কখনও হই নি। মাইরি বলছি। হ্যাঁ, আমাদের বিন্দীর গলার আওয়াজটা যেন শুনলাম। আমাদের বিন্দী-বাঈজী। চেনো তাকে? ভাল নাম বোধ হয় বিনোদিনী। বেড়ে নাচে বেটী! ওর কোমর

ঘোরানো যদি দেখ একবার! একখানি 'চিজ'—মাইরি বলছি।"

এই পর্যন্ত বলিয়া লোকটা বিড়বিড় করিয়া কি বলিতে লাগিল। চক্ষু দেখিলাম বুঁজিয়া আসিতেছে। হঠাৎ চক্ষু খুলিয়া বলিল—"আচ্ছা ডাক্তার, এ অঞ্চলে আবগারির দোকান কোনখানটায় আছে জান কি? মদের ভাঁটি? অন্ততপক্ষে তাড়িখানা? একটু না টানলে কেমন যেন বেজুত মনে হচ্ছে, মাইরি বলছি।" টলিতে টলিতে লোকটা অন্ধকারে মিলাইয়া গেল।

বিনিদ্র নয়নে একা বসিয়া আছি। মনে হইতেছে ··

বাঁচিয়া আছি, অথচ বাঁচিয়া থাকার অর্থ বুঝি না। মৃত্যুর সহিত প্রত্যহ মুখামুখি দেখা হয়, তাহাকেই চিনি কি? রোজ তো তাহার কত রূপই দেখিতেছি! কত জননীর কোল খালি করিয়া ফুটন্ত ফুলের মত কত শিশু সে ছিঁড়িয়া লয়! আশা-আকাঙ্ক্ষা-উদ্যম-পূর্ণ কত উন্মুখ জীবন অকালে শেষ করে! কত স্বপ্ন চূর্ণ করে, কত সাধের বাগান বিশুষ্ক করিয়া দেয়! নির্মম সে, নির্দয় হস্তে নির্বিচারে সংহার করিয়া চলিয়াছে।

আবার সেই একই মরণের আর এক রূপ। করুণাময় আবির্ভাব। অনাহারক্লিষ্ট অভিশপ্ত জীবনের সকল আগুন সে মুহূর্তে নিবাইয়া দেয়। বার্ধক্যপীড়িত জরাগ্রস্ত লোলচর্ম বৃদ্ধের সকল অশান্তির অবসান করে। জীবনের সকল অবসান, সকল লজ্জা, সকল কলঙ্ক, সকল শোক, সকল দুঃখের উপর স্নিগ্ধ অন্ধকার যবনিকা টানিয়া দেয়। মহামুক্তিময় বিস্মৃতির দেশে পথ দেখাইয়া লইয়া যায়।

গল্প-পুস্তকে আবার মনোনিবেশ করিয়াছি।

"ওপারে উঁচু তীরের চড়াই ভাঙিয়া তাহারা প্রকাণ্ড এক জলা-ভূমিতে উপস্থিত হইল। বরফ-শীতল তাহার জল। সেই জল ভাঙিয়া যাইতে হইবে। মেয়েটির চোখে কেমন যেন একটা অনিশ্চয়তার ভাব ফুটিয়া উঠিল। মনে হইল, সে যেন পথ ঠিক

করিতে পারিতেছে না। এই জলাভূমিতে পথ হারাইলেই মুশকিল। হঠাৎ সে দূরে অঙ্গুলিনির্দেশ করিয়া বলিয়া উঠিল, 'রগ।' দেখা গেল, দূর দিগন্ত হইতে মেঘের মতন কি যেন একটা তাহাদের দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। একটু পরেই বোঝা গেল, কুয়াশা। নিমেষমধ্যে তাহারা ঘন কুজ্ঝটিকায় আবৃত হইয়া গেল। দুইজনে দুইজনের হাত ধরিয়া দাঁড়াইয়া আছে, পাছে পরস্পরকে হারাইয়া ফেলে। হাঁটু পর্যন্ত বরফ-গলা জল। চতুর্দিকে নিবিড় কুয়াশা। পথ হারাইয়া গিয়াছে।"

"আসল পথ টাকা, বুঝলেন?" যে ভদ্রলোকটি কলকেফুলের বিচি খাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছিলেন, তিনি আসিয়াছেন। খড়্গের মত তাঁহার নাকটা আরও যেন উদ্যত হইয়া উঠিয়াছে, কোটরগত চক্ষুর দৃষ্টি আরও প্রখর।

"টাকা থাকলে পথ হারায় না। মৃত্যুর কুয়াশাতেও পথ পাওয়া যায়। জীবন আর মৃত্যু! আলো আর কুয়াশা, জল আর বরফ! ···কখনও জল জমে বরফ হচ্ছে, কখনও আবার বরফ গলে জল হচ্ছে। ও কিছু নয়, আসল জিনিস টাকা। টাকা থাকলে মৃত্যুও সহনীয় হয়, টাকা না থাকলে জীবনও অসহ্য।"

অদ্ভুত একটা হাসি হাসিয়া ভদ্রলোক অনর্গল বকিয়া যাইতে লাগিলেন—"টাকাই দরকার। যেমন করে হোক, পরজন্মে প্রচুর ধনী হতে হবে। ওই নির্মল ছোকরাকে চরম শিক্ষা দিয়ে দিতে হবে। শিক্ষা দেওয়ার পদ্ধতিটাও ঠিক করে ফেলেছি। কি করব জানেন? পিছমোড়া করে বেঁধে জ্বলন্ত সাঁড়াশি দিয়ে তার ড্যাবডেবে চোখ দুটো প্রথমেই উপড়ে ফেলব। যদি চীৎকার করে, টুঁটি চেপে ধরব তার—জিব কেটে ফেলব।"

ভদ্রলোক হা-হা করিয়া হাসিয়া উটিলেন। বিকট সে হাসি!

"তারপর সর্বাঙ্গ ফালা ফালা করে চিরে নুন, লঙ্কা সেই কাটা ঘায়ে বেশ করে লাগিয়ে দেব—আচারে যেমন করে মসলা দেয়।

দয়া-মায়া করব না। একটুও না। দয়া বলে কোন জিনিস আছে নাকি ?···এতেও যদি না মরে, ফুটন্ত তেলে ফেলে পুড়িয়ে মারব তাকে। বউটাকে ? তাকে মারব না। তাকে মোটরগাড়ি কিনে দেব। ছুনিয়ার যত মোটরগাড়ি আছে সব কিনে দেব তাকে, আর বলব 'চড়ে বেড়াও'। এক মুহূর্ত বিশ্রাম দেব না। ক্রমাগত মোটরে চড়ে বেড়াতে হবে। দেখি, সে কত মোটর চড়তে পারে ! মোটর থামাতে পাবে না—ক্রমাগত ঘুরে বেড়াতে হবে। থামালেই চাবুক। আইন ? প্রচুর টাকা থাকলে আইনের ভয় থাকে নাকি ? নির্মল যে আমার বউটাকে গালে চড় মেরে কেড়ে নিয়ে গেল, কিছু হল তার ? কিছু হল না। টাকা থাকলে কিছু হয় না। টাকা থাকলে পৃথিবীতে কিছুই আটকায় না। মৃত্যুও কিছু করতে পারে না। প্রচুর টাকা ছুই হস্তে বিতরণ করে যদি মরতে পারেন, ইতিহাসে আপনার নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। তৈমুর, চেঙ্গিস, নাদিরশা, এরা কেউ মরেছে ? কত ভাল লোক মরে বিস্মৃতির তলায় তলিয়ে গেল কেবল টাকার অভাবে। টাকা চাই। যেমন করে হোক, অনেক টাকা চাই। পরজন্মে কোটিপতি হয়ে জন্মাতে চাই। এর জন্যে যে কোন তপস্যা, যে কোন কৃচ্ছ্রসাধন করতে আমি প্রস্তুত আছি। নির্মলকে একবার দেখে নেব। এমন শিক্ষা তাকে দিয়ে দেব যে, পাথরও শিউরে উঠবে। দলে, পিষে, পুড়িয়ে মেরে ফেলতে চাই। টাকা চাই—টাকা চাই—টাকা চাই—টাকা—টাকা—টাকা—"

চক্ষু ছুইটি হইতে আগুনের হলকা ছুটিতে লাগিল।

ক্যালেণ্ডারের ছবিখানাও দেখিলাম উৎসুক আগ্রহে শুনিতেছে। তাহার চক্ষুতেও ভাষা ফুটিয়া উঠিয়াছে। সেও যেন বলিতেছে—

"ঠিক বলিয়াছ বন্ধু, টাকাই সব। আমার এই প্রস্ফুটিত যৌবনটিকে শিল্পীর দৃষ্টির সম্মুখে তুলিয়া ধরিয়াছিলাম টাকারই

জন্য। বর্ণের বন্ধনে বন্দী হইয়া টাকারই বন্দনা করিতেছি। আমার দেহের সমস্ত মাধুরী দিয়া প্রলুব্ধ দর্শকের মুগ্ধ দৃষ্টির সম্মুখে নিজেকে প্রসারিত করিয়াছি শুধু টাকার জন্য। আমার অঙ্গের এই প্রদীপ্ত বর্ণবিন্যাস, বিকশিত এই যৌবনশ্রী নীরব ভাষায় সকলকে ডাকিয়া বলিতেছে—টাকা দাও, টাকা দাও, ওগো, কিছু টাকা দিয়ে যাও।"

বাহিরে অকস্মাৎ এক ঝলক তীব্র বিদ্যুতের আলো অন্ধকারকে চিরিয়া ঝলসিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড বজ্রপতনের শব্দ। তাহার পর সব চুপচাপ।

বাতাসের বেগে আলোটা নিবিয়া গিয়াছিল। উঠিয়া আবার জ্বালিয়া দিলাম। জ্বালিয়া দেখি, সেই প্রজাপতিটা আবার উড়িয়া বেড়াইতেছে। একটু আগেই তো পুড়িয়া নিঃশেষ হইয়া গিয়াছিল। মুমূর্ষু ভেকের করুণ আর্তনাদটা স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। বিমূঢ়ের মত বসিয়া আছি।

সহসা নিজের বিগত জীবনটা মনে পড়িল।

কি দুঃখের সে জীবন। বাবা ছিলেন অতি সামান্য একজন কেরানী। মাহিনা পাইতেন পঁয়তাল্লিশ টাকা। খোলার বাড়িতে বাস করিতাম। আমরা ছিলাম তিন ভাই, পাঁচ বোন। আমাদের এই ধর্মপ্রাণ দেশে কেরানীর ঘরে মেয়ে! কি কষ্ট করিয়াই যে ছেলেবেলাটা কাটিয়াছে, এখন মনে হয় যেন দুঃস্বপ্ন!

আমার বাবার কথা মনে পড়িতেছে। জীবনে তিনি এতটুকু শান্তি পান নাই। সকালে কোনক্রমে দুইটি ভাত মুখে দিয়া আপিসে যাইতেন, ফিরিতেন রাত্রি আটটায়। ফিরিয়া আসিয়াও যে শান্তি পাইতেন, তাহা নহে। বাড়িতে মায়ের গঞ্জনা তাঁহার দৈনিক বরাদ্দ ছিল। মায়েরও দোষ ছিল না। তিনিও মানুষ ছিলেন তো, শরীরে রক্ত-মাংস ছিল। সুতরাং একটা ভাঙা খোলার ঘরে অতগুলি ছেলে-মেয়ে লইয়া একা হাতে সংসার চালাইবার পর মানসিক সামঞ্জস্য

রক্ষা করা তাঁহার দ্বারা সম্ভবপর হইত না। মুখে মিষ্টি কথা ফুটিত না। সাধারণ কথাও কটু হইয়া উঠিত। মেয়েরা নীরবে নিজেদের ব্যক্তিগত দুঃখ-কষ্ট হয়তো সহ্য করিতে পারে। কিন্তু সন্তানের দুঃখ বহন করা তাহাদের সাধ্যাতীত। সন্তানদের একটু ভাল খাবার খাওয়াইবার জন্য কিংবা একটু ভাল জামা-কাপড় কিনিয়া দিবার জন্য দরিদ্র জননীরা অশেষ কৃচ্ছ্রসাধন করেন। আমার মা-ও কম কৃচ্ছ্র-সাধন করিতেন না। আমার একই মা পয়সা বাঁচাইবার জন্য ধোপানী, চাকরানী, রাঁধুনী সবই ছিলেন। বাড়িতে হাতে সেলাই করিয়া দরজীর কাজও করিতেন। কিন্তু এত পরিশ্রম করিয়াও তিনি তিন পুত্র এবং পাঁচ কন্যার অধিকাংশ অভাবই মিটাইতে পারিতেন না। নিকটেই আর এক উপদ্রব ছিল। পাশের বাড়িতে একজন ধনী থাকিতেন। তাঁহার বাড়িতে নিত্য উৎসব। তিন-চারখানা মোটর-কার নানা বিচিত্র শব্দ করিয়া বারম্বার যাতায়াত করিত। গ্রামোফোন দিনরাত বাজিতেছে। একদল, ফুটফুটে ছেলেমেয়ে। কাহারও চাঁপা-রঙের সুন্দর সিল্কের ফ্রকের উপর দোদুল্যমান বেণী, কেহ 'সেলার্স স্যুট' পরিয়া বগলে ফুটবল লইয়া চলিয়াছে, কাহারও মুখে সুন্দর বাঁশি, কাহারও হাতে রঙিন বেলুন। নিত্য নূতন খেলনা লইয়া নিত্য নূতন রঙিন পরিচ্ছদ পরিয়া তাহারা আমাদের নয়ন ধাঁধিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত। তালি-দেওয়া কাপড় এবং শতচ্ছিন্ন জামায় অঙ্গ আবৃত করিয়া আমরা প্রলুব্ধ নয়নে চাহিয়া দেখিতাম। কি যে ভাবিতাম, তাহা বর্ণনা করা নিষ্প্রয়োজন।

সুতরাং আমার মায়ের মনে শান্তি ছিল না। প্রতিক্রিয়াটা গিয়া পড়িত বাবার উপর। তাঁহার উপরই তিনি যেন শোধ তুলিতেন।

বাবা কোনদিন কিছুই বলিতেন না। এই গঞ্জনাটাও অন্যান্য বহুবিধ দুঃখের মত তিনি নীরবে সহ্য করিতেন। অসাধারণ তাঁহার সহ্যশক্তি ছিল। মা কিন্তু এই সহ্যশক্তির মর্যাদা দিতেন না। এই

সহ্যশক্তির জন্যই মায়ের কাছে তাঁহার লাঞ্ছনার সীমা ছিল না। তাঁহাকে কতদিন বলিতে শুনিয়াছি—

"মানুষের রক্ত কি তোমার গায়ে নেই, না কি? এই যে ছেলেগুলোর গায়ে একটা জামা নেই, মেয়েটা সর্দিতে ঝামরে রয়েছে, দেখতে পাও না তুমি? তোমার ওগুলো মানুষের চোখ, না পাথরের?"

বাবা কখনও কোন প্রত্যুত্তর করিতেন না। তাঁহার মনে কোনদিন কোন বিকার দেখি নাই। আপিসের জামা-জুতা ছাড়িয়া হাত-মুখ ধুইয়া নির্বিকার চিত্তে তিনি সন্ধ্যাহ্নিক করিতে বসিয়া যাইতেন। হয়তো পরমব্রহ্মের চিন্তাই করিতেন।

"দেখুন তো ডাক্তারবাবু, আমি কি দেখতে খুব খারাপ?"

স্থূলাঙ্গিনী কালো একটি মেয়ে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে।

"সত্যি কি দেখতে আমি খুবই বিশ্রী? কেউ আমাকে পছন্দ করলে না। দলে দলে লোক এল আর চলে গেল। কেউ আমাকে পছন্দ করলে না। কিছুতেই বিয়ে হল না।"

মেয়েটি যে কুৎসিত, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই।

"বলুন না আপনি, আমি কি দেখতে খুব খারাপ?"

অসঙ্কোচে বলিলাম—'না।'

"তবে আমাকে কেউ পছন্দ করলে না কেন? কেন এমন করে আফিং খেয়ে মরতে হল আমাকে? আমার এই দেহটা তো আমি সৃষ্টি করি নি। কে সৃষ্টি করেছিল জানেন আপনি? ঠিকানা জানেন তার?"

তাহার দুই চক্ষু ব্যাঘ্রীর মত দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল।

"এই যে আমার রঙ কালো, ঠোঁট পুরু, সামনের দাঁত উঁচু, নাকের ডগাটা শুকচঞ্চুর মত নয়, এর জন্যে দায়ী কে? আমি তার কাছে জবাবদিহি চাই। আমি তাকে চীৎকার করে জিজ্ঞাসা

করতে চাই, কেন তুমি একজনকে রূপসী, আর একজনকে কদাকার করেছ ? কেন—কেন—কেন ? কি অপরাধ করেছিলাম তোমার কাছে ?”

চীৎকার করিতে করিতে সে অন্ধকারে মিলাইয়া গেল।

আমার বাবাও কি কম ভুগিয়াছিলেন মেয়েদের লইয়া ! এক-আধটা নয়, পাঁচ-পাঁচটি মেয়ে। তিনটির বিবাহ দিতেই তাঁহার সর্বস্ব বিক্রয় হইয়া গেল। দেশে দশ বিঘা জমি ছিল তাহাও গেল, পুর্বপুরুষের ভিটেটা ছিল সেটুকুও গেল। কিছুই আর অবশিষ্ট রহিল না।

‘ডাক্তারবাবু, ডাক্তারবাবু !’

সেই অ্যানার্কিস্ট ছোকরাটি ছুটিয়া আসিয়াছে। ভয়ে তাহার মুখ শুকাইয়া গিয়াছে, সর্বাঙ্গ থরথর করিয়া কাঁপিতেছে।

“ওই লোকটাকে চলে যেতে বলুন না। দেখলেই আমাকে তাড়া করছে। এই দেখুন, কামড়ে দিয়েছে।”

সেই দীর্ঘাকৃতি কালো লোকটা আসিয়া দাঁড়াইল। গলায় ক্ষুরের ক্ষতচিহ্নটা রক্তাক্ত। সমস্ত মুখ হিংস্র। সে চীৎকার করিয়া বলিয়া উঠিল—“কামড়ে আমি তোমার গলার টুঁটি ছিঁড়ে ফেলব। জুয়াচোর, বদমায়েস, পাজি কোথাকার ! বল, কোথায় আমার মেয়ে ?”

যুবকটি কাতর স্বরে বলিল—‘আমায় বিশ্বাস করুন। আমি আপনার মেয়ের কোন খবর জানি না। আমি কখনও দেখি নি তাঁকে।’

ভীমগর্জনে লোকটি উত্তর দিল—‘তুমি না জান, তোমার বন্ধুরা জানে। খুঁজে আন, যেখান থেকে পার খুঁজে আন। তা না হলে তোমার টুঁটি কামড়ে ছিঁড়ে খেয়ে ফেলব আমি।’

লোকটা মুখব্যাদান করিয়া দুই পাটি প্রখর দন্ত মেলিয়া তাহার

দিকে আগাইয়া গেল। যুবক ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটিয়া পলাইয়া আত্মরক্ষা করিল।

'কিচ্ছু শুনতে চাই না আমি। আমার দোকান ফিরিয়ে দাও, আমার মেয়ে ফিরিয়ে দাও।'

তাহার গলার ক্ষতটা রক্তের ফেনায় ভরিয়া গেল। আবার সব চুপচাপ। প্রজাপতির প্রেতাত্মা আলোকশিখাকে প্রদক্ষিণ করিয়া চলিয়াছে।

ইহাদের সহিত নিজের জীবন মিলাইয়া দেখিতেছি। কি আর এমন বেশি তফাত! বিশেষ কিছুই নাই। যে অবস্থায় পড়িয়া ইহারা আত্মহত্যা করিয়া মরিয়াছে, সেই অবস্থায় আমিও তো পড়িয়াছিলাম। কেন যে আত্মহত্যা করি নাই, আশ্চর্য!

আমি যেবার আই. এস-সি. পাস করিলাম, তখন ছোট ভাই দুইটি ম্যাট্রিক ক্লাসে। দুইজনেই তাহারা এক ক্লাসে পড়িত। আমরা তিনজনেই লেখাপড়ায় ভাল ছিলাম, ক্লাসে কেহ কখনও সেকেণ্ড হই নাই। স্কলারশিপের টাকাতেই আমাদের লেখাপড়ার খরচ বরাবর চলিয়াছে। আমাদের নানা দৈন্যের মধ্যে এইটুকুই সুখ ছিল।

যেবার আমি আই. এস-সি. পাস করিলাম, সেইবারই বাবা আর কালবিলম্ব না করিয়া আমাকে তাঁহার আপিসে ঢুকাইয়া দিলেন। ইহার ঠিক পরে যাহা ঘটিল, তাহার মত আশ্চর্য ব্যাপার আমি জীবনে আর দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। হয়তো কাকতালীয়বৎ ঘটনা, কিন্তু খুবই বিস্ময়জনক।

যেদিন আমার চাকরি হইল, সেই দিনই বাবারও মৃত্যু হইল। আশ্চর্য সেই মৃত্যু! রাত্রে রোজ যেমন খাওয়া-দাওয়া করিয়া শুইয়া পড়িতেন, সেদিনও তেমনই শুইয়াছিলেন। কোন অসুখ ছিল না। সকালে উঠিয়া আমরা দেখিলাম, তিনি মারা গিয়াছেন। আমি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র। জ্যেষ্ঠ পুত্রের চাকুরি জুটাইয়া দিয়া আশা করি তিনি

পরম নিশ্চিন্তেই অন্তিম নিশ্বাস ফেলিয়াছিলেন। অবনী ঠাকুরের "শেষ বোঝা" ছবিটা দেখিয়া বাবার কথা মাঝে মাঝে মনে হয়।

আর মা? তিনিও কি কম দুঃখ-কষ্ট পাইয়াছেন জীবনে! দরিদ্র জননীর অন্তর্নিহিত ব্যথা-বেদনার পরিমাপ করা আমার সাধ্যাতীত। কত অপূর্ণ সাধ, কত অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা তাঁহার মাতৃ-হৃদয়কে আলোড়িত করিত তাহা জানি না। এইটুকু জানি যে, বহুদিন তিনি অনাহারে কাটাইতেন। নানারূপ ব্রত-উপবাস তো ছিলই। আহারও সব দিন কুলাইত না। বাবার মৃত্যুর পর আমাদের আয় কমিয়া গিয়াছিল। যাহা জুটিত তাহা অল্পই, এবং তাহার সমস্তটাই মা আমাদের দিয়া নিজে কোন ছুতায় উপবাস করিতেন।

"ডাক্তারবাবু, এ তো বেঁচে নেই, কেন মিছে কথা বলে আমাকে ভোলাচ্ছ তুমি?"

সন্তানহত্যাকারিণী সেই জননী, আর তাহার কোলে সেই মৃত শিশু।

"এ কি কখনও বাঁচতে পারে? বাঁচা কি সম্ভব? মা যখন নিজের ছেলের গলা টিপে ধরে, তখন সে ছেলে কি আর বাঁচে? আমার মত পিশাচী আর কজন দেখেছ তুমি ডাক্তারবাবু? পৃথিবীতে কি রোজ এমনই শিশুহত্যা হয়? অনেক হয়? চন্দ্রসূর্য কি উঠছে এখনও? ভূমিকম্পে পৃথিবী এখনও ফেটে যায় নি?"

মৃত সন্তানটিকে বুকে জড়াইয়া চাপিয়া ধরিল।

"বাছা আমার—বাছা আমার—"

অনেকক্ষণ কাহারও মুখে কোন কথা নাই। তাহার পর ধীরে ধীরে সে আমার আরও কাছে আসিয়া বলিল—"কিন্তু সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার কি জান ডাক্তারবাবু? কি বল তো? তাকে এখনও আমি ভুলি নি। সেই কালসর্প এখনও বসে আমার মনের বাঁশি শুনছে। ফণা বিস্তার করে এখনও আমার বুকের ভেতর

কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে আছে সে। কিছুতেই নড়বে না। কিছুতেই তাকে তাড়াতে পারছি না। একটা উপায় বলে দাও, কি করলে আমি সব ভুলতে পারি। আমায় বলে দাও, কি করে এই স্মৃতির হাত থেকে রক্ষা পাই, আমাকে সমস্ত ভুলিয়ে দাও তুমি।"

তাহার শুষ্ক নয়ন-পল্লবে এক ফোঁটা জল নাই।

হঠাৎ একটা দমকা হাওয়া আসিয়া ঘরের মধ্যে ঢুকিল। সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা জলের ঝাপটা। বাহিরের আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। বৃষ্টি নামিয়াছে। সমস্ত পৃথিবী অঝোরঝরে কাঁদিতেছে। বিদ্যুৎ নাই, বজ্র নাই, কেবল বৃষ্টি। অশ্রান্ত কান্নার মত অবিশ্রান্ত বর্ষণ।

ক্যালেণ্ডারের ছবিটার দিকে চাহিয়া দেখিলাম।

তাহার চোখেও জল।

বর্ষণমুখরিত অন্ধকারকে বিক্ষুব্ধ করিয়া কবির গম্ভীর কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিতে লাগিল—

"পড়ি নাই ঘুমায়ে তো, ছিলাম না জাগিয়াও,
চেপে এসেছিল বুঝি তন্দ্রা!
সেই তন্দ্রার ঘোরে এসেছিলে সখী মোর—
আহা যেন গীতি মধু-ছন্দা!
তন্দ্রায় ভর করি
এসেছিলে মরি মরি
জাগরণে বসে আজি সে কথা স্মরণ করি,
সে কথা গুমরি ওঠে গভীর আঁধার ভরি
বুকে করি রাখে নিশিগন্ধা!
সে স্বপন ক্ষণিকার,
জ্যোতি যেন মণিকার
মনের আঁধার ভরি ঠিকরিছে অনিবার,
আকাশের শশীতারা সে আলোক-কণিকার
প্রসাদ না পেলে হত বন্ধ্যা!"

চতুর্দিকে সূচীভেদ্য অন্ধকার। রিম-ঝিম রিম-ঝিম বর্ষণের সুরের সহিত কবির উদাত্ত গম্ভীর স্বর এক অপরূপ ঐকতান সৃষ্টি করিল। জানালা দিয়া হিমশীতল বাতাস প্রবেশ করিতেছে। কম্পমান দীপ-শিখাকে প্রদক্ষিণ করিয়া প্রেতপতঙ্গটি অবিরাম ঘুরিয়া মরিতেছে। কবি ধীরে ধীরে আসিয়া প্রবেশ করিল। তাহার বিদীর্ণ মস্তক হইতে কপাল বাহিয়া বিধ্বস্ত মস্তিষ্কটা ঝুলিয়া পড়িয়াছে। অনাবৃত মস্তিষ্কের উপর বৃষ্টির ছাট লাগিতেছে। ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিলাম, কালো কালো যাহা লাগিয়া আছে, তাহা রক্ত নয়—কাদা। কবি আসিল ও আবার ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

আমিও প্রেমে পড়িয়াছিলাম।

বাবা কত কষ্ট করিয়া যে চাকরিটি জোগাড় করিয়া দিয়া মারা গেলেন, আমি তাহা রাখিতে পারিলাম না। এক মাস যাইতে না যাইতে ছাড়িয়া দিয়া চলিয়া আসিলাম। কেন আসিলাম? নিজেকে সহস্রবার জিজ্ঞাসা করিয়া যে উত্তর পাইয়াছি, তাহা সদুত্তর নহে।

আত্মসম্মানে আঘাত লাগিয়াছিল সত্য, কিন্তু ঠিক সেইজন্যই যে আমি চাকুরি ছাড়িয়া দিলাম, তাহা সত্য নহে। আরও একটা কারণ ছিল। প্রেমে পড়িয়াছিলাম। মানুষ যখন প্রেমে পড়ে, তখন কোন হীন কাজ করিতে সে সঙ্কোচবোধ করে। তাহার কাছে নিজেকে একটা কুড়ি টাকা মাহিনার কেরানী বলিয়া পরিচয় দিতে লজ্জা করিত।

পঙ্ক হইতেই পঙ্কজের উদ্ভব। আমার দারিদ্র্যের মলিনতাকে ধন্য করিয়া জীবনে প্রেমের ফুল ফুটিয়াছিল। কালো মেঘে কি আলো প্রতিভাত হয় না?

এক সহপাঠির বাড়িতে আমার গতিবিধি ছিল। কলেজে ভাল ছেলে বলিয়া আমার খাতির—সরস্বতীর দরবারে ধনী দরিদ্রের জাতিভেদ নাই, সেখানে আমার ললাটেই বিজয়ীর বরমাল্য। চেহারাও

খুব যে কুৎসিত ছিল, তাহা নয়। সুতরাং আমার বন্ধুর ভগ্নী মুগ্ধ হইলেন, আশ্চর্য হইবার কিছু নাই। আমিও মুগ্ধ হইলাম। জীবনে নূতন পালা শুরু হইল।

"গল্পটা বেশ জমিয়েছেন তো!"

ফিরিয়া দেখি, একটা কুষ্ঠব্যধিগ্রস্ত ভিখারী দাঁড়াইয়া হাসিতেছে। হাতে একটিও আঙুল নাই। নাক মুখ চোখে কুৎসিত ব্যাধিটার প্রকোপ নিদারুণ বীভৎসতায় প্রকট হইয়া উঠিয়াছে।

"গল্পটা বেশ জমিয়েছেন আপনি। কিন্তু তার আগে আমার কবিতাটা শুনে নিন। যদিও জীবনে কবি বলে বাজারে নাম ছিল না, আমার একটা কবিতাও কখনও মাসিক-পত্রে বেরোয় নি; কিন্তু আমার মনে কবিতা ছিল। যদিও খেতে পেতাম না, ভিক্ষে করে খেতে হত, তবু আমি কবি ছিলাম।"

বলিয়া সে কবিতা আবৃত্তি করিতে লাগিল—

"চিরটা কাল কষ্ট পেলাম
জীবনভরা দুঃখ-জরা
মধ্যে মাঝে ভুলে যেতাম
সুন্দরী এ বসুন্ধরা।

সবুজ কচি দূর্বাদলে
স্বর্ণরবি পূর্বাচলে
কজ্জলিত স্নিগ্ধ মেঘে
মুগ্ধ হত মনটা ঠিকই—
কিন্তু তবু সর্বখনে
সর্বদেহে সর্বমনে
ব্যাধি এবং ক্ষুধার জ্বালা
কি যন্ত্রণা বলুন দিকি!
কি যন্ত্রণা ভোগ করেছি
হায় রে, অহোরাত্রি ভরা,

মধ্যে মাঝে ভুলে যেতাম
সুন্দরী এ বসুন্ধরা।
কোন লগনে, কার তাগিদে,
কিসের মোহে, কাহার স্নেহে,
কোন জননী জন্ম দিল
জানি না তো সে কোন্ গেহে!
অভাগাটার জন্য হা রে
কোন রমণী স্তন্যধারে
সুধার ধারা ঝরিয়েছিল
ঠিকানা তার দিল না কেউ!
সত্যি সে কি আমার লাগি
দীর্ঘ নিশি থাকত জাগি?
মিথ্যা কথা! মিথ্যা কথা!
আমার কভু ছিল না কেউ।
স্নেহের কভু দেয়নি আভাস
ব্যাধিই দিল সর্বদেহে—
কোন জননী জন্ম দিল
জানি না তো সে কোন গেহে!
কাহার পাপে জন্ম হল?
কাহার শাপে হেথায় এলাম?
কোথা সে মোর পিতামাতা,
যাদের লাগি শাস্তি পেলাম।
নাকটা বসা—চোখটা কানা।
দুষ্ট ব্যাধি অঙ্গে নানা
কুষ্ঠ বলে করত ঘৃণা
সুস্থ যারা মর্ত্যবাসী।
লজ্জানত মস্তকেতে
তাদের দ্বারে হস্ত পেতে
পেটের দায়ে তাড়িয়ে কুকুর
কুড়িয়ে খেয়ে শুকনো বাসি

দিন কেটেছে মর্ত্যলোকে ;
এর বেশি আর কিবা পেলাম।
মোটর চাপা পড়ে সেদিন
সত্যি আমি বেঁচে গেলাম।
একটি শুধু দুঃখ আমার
ত্রাণ করেছে যে আমারে
সে নাকি আজ পাচ্ছে সাজা
মর্ত্যলোকে কারাগারে।

আমার কথা ভুলে গেলেন ডাক্তারবাবু ? আমার সেই মোটর-চাপা শবদেহটা আপনি কেটে-ছিঁড়ে পরীক্ষা করে দেখেছিলেন। এত করেও কিন্তু সুবিচার করতে পারলেন না আপনারা। বিচারে 'ড্রাইভার' বেচারা দোষী বলে সাব্যস্ত হল। কিন্তু সে বেচারার কোন দোষ ছিল না। আমি ঝাঁপিয়ে গিয়ে তার মোটরের তলায় পড়ে আত্মহত্যা করেছিতাম। সে আমাকে চাপা দেয় নি। সাধ্যমত বাঁচাবার চেষ্টাই করেছিল। আপনারা সবাই দয়ালু, সবাই আমাদের বাঁচাবার চেষ্টাই করেন।"

লোকটার চোখ-মুখে একটা অদ্ভুত বিদ্রূপের হাসি ফুটিয়া উঠিল —"আপনারা সবাই মহাদয়ালু, আপনারা সকলে—কেউ কখনও একটা পয়সা ছুঁড়ে দিয়ে, কেউ এক মুঠো চাল দিয়ে, কেউ—"

হঠাৎ তাহার কথা থামিয়া গেল। সে সামনের দেওয়ালটার দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া নিস্তব্ধ হইয়া গেল। দেখিলাম, সে ক্যালেণ্ডারের ছবিটার দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিয়াছে। মুখে একটি কথা নাই। ক্যালেণ্ডারের ছবিখানাও দেখিলাম তাহার দিকে তাকাইয়া আছে।

সেই কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত লোকটা ধীরে ধীরে সেই ছবিখানার দিকে আগাইয়া গেল। ছবিটার সহিত মুখামুখি দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিল —"তোমাকে যেন চিনি বলে মনে হচ্ছে! তুমিই কি আমার মা ?

এত আপনার বলে মনে হচ্ছে কেন তোমাকে? কে তুমি—বল, বল, কথা কও, কে তুমি? ঠিক তুমি আমার মা। আমার মা! এত সুন্দরী ছিলে তুমি, অথচ আমি এত কুৎসিত!"

একটা দমকা হাওয়া ঘরে ঢুকিয়া ক্যালেণ্ডারখানাকে মেঝেতে ফেলিয়া দিল। কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত লোকটা সহসা কোথায় অন্তর্হিত হইল। আমি উঠিয়া ক্যালেণ্ডারখানা কুড়াইয়া আবার টাঙাইয়া রাখিলাম।

ছবিখানা কাঁদিতেছে?

মেয়েমানুষ কত সহজে কাঁদে—আবার কত সহজে হাসে। সেও কাঁদিয়াছিল। যে মুহূর্তে নিঃসংশয়ে ঠিক হইয়া গেল আমাদের মিলন অসম্ভব, সে মুহূর্তে আমার বুকে মুখ লুকাইয়া সে কি কান্না! বিবাহের পর আবার তাহাকে হাসিতেও দেখিয়াছি। সর্বাঙ্গে স্বর্ণা-লঙ্কার, সীমন্তে সিঁদুর, দেহের প্রতি পরমাণুতে যৌবনের মাদকতা। ধনীর দুহিতা, ধনীর বনিতা, ধনীর পুত্রবধূ। হাসিবে না কেন? তাহার কান্নাও যেমন সত্য, হাসিও তেমনই সত্য।

জীবনে আমার সেই প্রথম প্রেম এবং প্রথম ব্যর্থতা। যাহাকে ভালবাসি সে যখন চলিয়া যায়, তখন মনে হয়, বিশ্বের হাটে একেবারে দেউলিয়া হইয়া গেলাম যেন। মূলধন যে তখনই হাতে আসিল, সে কথা বুঝিতে দেরি লাগে।

তাহাকে পাই নাই ইহাই তো পরম দুঃখ। কিন্তু যখন বুঝিলাম যে, আমি গরিব বলিয়াই তাহাকে পাই নাই, তখন সে মর্মান্তিক বেদনা হীনতার ছোঁয়াচ লাগিয়া অত্যন্ত শ্রীহীন হইয়া উঠিল। নিজেই নিজেকে বিদ্রূপ করিয়া বারম্বার হাসিলাম—"বামন হইয়া চাঁদে হাত দিবার শখ মিটিয়াছে তো? যাহাকে অতবড় একটা নেটিভ স্টেটের দেওয়ান সাধিয়া পুত্রবধূ পদে বরণ করিয়া লইয়া গেল, তাহাকে তুমি অধিকার করিতে চাও! স্পর্ধা তোমার কম নয়!"

সত্যই আমার স্পর্ধা কম ছিল না। গগনস্পর্শী স্পর্ধা অচিরেই

ধূলিসাৎ হইল। আরও কঠিন অগ্নি-পরীক্ষা আমার অদৃষ্টে বাকি ছিল। দারিদ্র্যের অনল চতুর্দিক হইতে শত শিখা বিস্তার করিয়া আমাকে বেড়িয়া ধরিল।

নিঃসম্বল অবস্থায় বাড়িভাড়া দিয়া থাকা সম্ভব ছিল না। যতদিন আমি একটা কিছু জুটাইতে না পারি, ততদিন যদি মামারা আশ্রয় দেন—এই আশা লইয়া মা আমার চতুর্থ বোনটিকে হইয়া পিত্রালয়ে গেলেন। আমি একটা খোলার ঘরে বাকি কয়জনকে লইয়া সংবাদের প্রতীক্ষায় রহিলাম।

সমস্যার সমাধান হইয়া গেল কিন্তু অন্য প্রকারে। মা চলিয়া যাইবার দুই দিন পরে আমার দুই ভাই এবং ছোট বোনের একদিনে কলেরা হইল। আমি যে কেন রক্ষা পাইলাম জানি না। গরিবের ঘরে কলেরা হইলে যে কি ব্যাপার হয়, তাহা চোখে না দেখিলে বুঝিতে পারা শক্ত। সে দৃশ্য আমি জীবনে কখনও ভুলিব না।

তখন দীন-দরিদ্র আমরা। ডাক্তার ডাকিয়া চিকিৎসা করাইবার কথা ভাবিতেও পারি না। ওলাবিবির শরণাপন্ন হইলাম। ওলা-বিবিও দয়া করিলেন না। তখন একদিন এক দাতব্য-চিকিৎসালয়ে ভিখারীর দলে গিয়া ভিড় করিয়া দাঁড়াইলাম ডাক্তারবাবুর দাক্ষিণ্যের আশায়। শুনিয়াছিলাম, দরিদ্রদের জন্য দাতব্য-চিকিৎসালয়। সেখানে গিয়া দেখিলাম দরিদ্রের দল এক জায়গায় ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়া আছে বটে, ডাক্তারবাবু তাঁহার বড়লোক রোগীদের লইয়াই ব্যস্ত। প্রায় দেড় দুই ঘণ্টা কাল দাঁড়াইয়া থাকিতে হইল। হাস-পাতালের ডাক্তারবাবুরা চাকুরি করেন, চিকিৎসা করিবার অবসর তাঁহাদের নাই। এই ভিখারীর দলকে এগারোটার মধ্যে বিদায় করিতে হইবে—এই তাঁহাদের লক্ষ্য, সমাগত দেড় শত লোকের নানাবিধ ব্যাধির বিস্তৃত ইতিহাস শুনিবার ধৈর্য তাঁহার থাকিবার কথা নয়।

সুতরাং আমার কথা শুনিতে শুনিতেই ডাক্তারবাবু প্রেসক্রিপশন

লিখিতে শুরু করিলেন এবং কথা শেষ হইবার পূর্বেই প্রেসক্রিপশন-খানা আমার হাতে দিয়া বলিলেন—"যাও, দিনে রাতে তিনবার করে খাওয়াবে। বার্লি ছাড়া আর কিছু খেতে দিও না।"

বলিলাম, "তাদের পেটে জল পর্যন্ত থাকছে না—।" এ কথা ডাক্তারবাবু বোধ হয় শুনিতে পাইলেন না। কারণ তখন সামনে একজন মোটা লোক জিব বাহির করিয়া দাঁড়াইয়াছে। ডাক্তারবাবু জিবের দিকে লক্ষ্য না করিয়া এক হাতে তাহার নাড়ীটা ধরিয়া অন্য হাতে লেখনী চালনা করিতেছেন। হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিতে হইল।

ফিরিয়া আসিয়া যাহা দেখিলাম, জীবনে তাহা কোনদিন ভুলিব না। গিয়া দেখিলাম, একজনও বাঁচিয়া নাই। মরিয়া যাওয়া কিছু বিচিত্র নয়। কিন্তু কি ভয়াবহ সে মৃত্যু! মল-মূত্র-বমির মধ্যে জড়াজড়ি করিয়া তিনজন শুইয়া আছে। মানুষ নয়, যেন কৃমি! তাহাদের সেই জ্যোতিহীন নিশ্চল চক্ষুগুলি আজও আমি ভুলি নাই। তিনটি সুন্দর ফুলকে ছিঁড়িয়া, মলিন করিয়া, চিতার আগুনে ফেলিয়া দিয়া মহাকাল যেন হা-হা করিয়া হাসিতেছে।

আজ আমি ডাক্তার হইয়াছি। অনেক কলেরা-রোগীর চিকিৎসা করিয়াছি। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, আজ দরিদ্রের ক্রন্দনে আমার হৃদয় বিন্দুমাত্র বিচলিত হয় না। মনে হয়—

"শোন, শোন।"

সেই বিন্দি! অ্যানার্কিস্ট যুবকটিকে ডাকিতেছে। বিন্দির সে চেহারা নাই। সুন্দর খোঁপা বাঁধিয়াছে, খোঁপায় বেলফুল গোঁজা। এত সব পাইল কোথা! গালে রঙ, ঠোঁটে রঙ, সুন্দর টানা-টানা চোখ দুইটিতে কাজল পরিয়াছে। পরনে মখমল-পাড় সুন্দর ফিন-ফিনে শাড়ি। রীতিমত মোহিনী বেশ!

অ্যানার্কিস্ট যুবকটি বলিল—"কি বলছ?"

ফিক করিয়া হাসিয়া বিন্দি বলিল—"বেশি কিছু নয়, আমার পেছনে এই সেফটিপিনটা লাগিয়ে দাও না, এই পিঠের দিকে।"

বলিয়া রঙ্গভরে পিছু ফিরিয়া দাঁড়াইল। অ্যানার্কিস্ট ছোকরাটি একটু ইতস্তত করিয়া শেষে সেফটিপিন লাগাইয়া দিতে লাগিল।

লাগানো তাহার আর শেষই হয় না।

যে হতভাগিনী বাঁচিয়া থাকিতে পুরুষের মনোযোগের জ্বালায় অস্থির হইয়া গলায় দড়ি দিয়াছিল, মৃত্যুর পর সেও অভিসারিকা সাজিয়াছে এবং ভুলাইতেছে সেই ব্যর্থ প্রণয়ীকে, যে নারীর উপর অভিমান করিয়া সায়ানাইড গিলিয়াছিল শান্তির আশায়।

বাহিরে চাহিয়া দেখিলাম, ঝড়ের বেগ প্রশমিত হইতেছে। পাতলা মেঘের স্তর ভেদ করিয়া জ্যোৎস্নার আভাস ফুটি ফুটি করিতেছে। বৃষ্টি এখনও সম্পূর্ণ থামে নাই। সামনের মাঠের কুলগাছটা দাঁড়াইয়া ভিজিতেছে। প্রেতিনীর সমস্ত চক্ষু অন্ধ হইয়া গিয়াছে। জোনাকি একটিও নাই। একটা অস্ফুট মর্মরধ্বনি সমস্ত অন্ধকারকে আকুল করিয়া তুলিয়াছে। কাছে দূরে অবিরাম ঝিল্লীরব। সহসা খানিকটা মেঘ সরিয়া গেল। দুইটি উজ্জ্বল নক্ষত্র ফুটিয়া উঠিল। মনে হইল, যেন কাহারও দুইটি আঁখি কৌতুকভরে আমার দিকে চাহিয়া আছে। দেখিতে দেখিতে আবার তাহা মেঘে ঢাকিয়া গেল। বৃষ্টির শব্দ কমিয়া আসিতেছে। ভেকের আর্তরবটা এখনও শোনা যাইতেছে। এখনও তাহার মৃত্যু হয় নাই।

আমরাও কি ওই সর্প-কবলিত ভেকের মত পলে পলে মরিতেছি না?

মহাকাল কৌতুকও করিয়াছেন মাঝে মাঝে। জীবন যখন দুঃসহ হইয়া উঠিয়াছিল, যখন নিজের অভিশপ্ত জীবনটাকে কোথায় লুকাইব ভাবিয়া পাইতেছিলাম না, যখন অকূল পাথারে ঝঞ্ঝা আর ঢেউ ছাড়া

আর কিছুই চোখে পড়িতেছিল না, তখন সহসা কূল দেখা দিল। আমার সহপাঠি বন্ধুর পিতা আমার দুঃখের ইতিহাস শুনিয়া আমার প্রতি দয়াপরবশ হইলেন। তাঁহারই কৃপায় এবং অর্থসাহায্যে আমি মেডিকেল কলেজে ভর্তি হইলাম। আমার মা অনূঢ়া ভগ্নিটিকে লইয়া পিত্রালয়ে রহিয়া গেলেন। আশা করিতে লাগিলেন, আমি ডাক্তার হইয়া বাহির হইলে সমস্ত দুঃখের অবসান হইবে।

মায়ের গহনাগুলি বিক্রয় করিয়া সানন্দে কলেজের বই কিনিয়া ফেলিলাম। ওই গহনাগুলিই ছিল আমাদের শেষ সম্বল। রহিল শুধু মায়ের আশীর্বাদ এবং আমার অদৃষ্ট।

পড়াশোনার ব্যাপারে অদৃষ্ট বরাবরই ভাল ছিল। ভারতী কোনদিন বরদান করিতে সঙ্কোচ করেন নাই। মেডিকেল কলেজের গমস্ত পরীক্ষাগুলিতেই ফার্স্ট হইলাম। সমস্ত স্কলারশিপ এবং মেডেল আমার করায়ত্ত হইল।

হইল তো, কিন্তু আবার দুঃখের পালা আসিল। নির্মল আকাশ মেঘ ছাইয়া গেল—বজ্র-বিদ্যুতের ঘটায় আবার চতুর্দিক শিহরিয়া উঠিল।

আমার বন্ধুর পিতা, যাঁহার করুণায় মেডিকেল কলেজে ঢুকিয়াছিলাম, অকস্মাৎ একদিন মারা গেলেন। দ্বিতীয়বার পিতৃহীন হইলাম। শুধু পিতৃহীন হইলাম যে তাহা নয়, বন্ধুহীন হইলাম। আমার বন্ধু বি. এস-সি. পড়িতেছিলেন তিনি একদিন আসিয়া আমাকে বলিলেন—"তুমি ভাই ওই মড়ার হাড়-টাড় নিয়ে বাইরের ঘরটাতে থাক—মা এসব পছন্দ করতেন না। আমিও আজ কদিন থেকে এমন সব বিশ্রী স্বপ্ন দেখছি রাত্তিরে—"

মড়ার হাড় লইয়া আমি তো দুই বৎসর আছি। এতদিন তো মায়ের কোন আপত্তি উঠে নাই—বন্ধুও স্বপ্ন দেখেন নাই! হঠাৎ এই সব হইতে শুরু করিল কেন? কেন যে এমন হইল, প্রথমে তাহা বুঝিতে পারি নাই। আমার ব্যবহারে নালিশ করিবার মত কিছুই ছিল না। তবে কেন এমন হইল?

অনেক দিন পরে বুঝিয়াছি, ইহার কারণ কি। কারণ আর কিছুই নয়, কারণ আমার কৃতিত্ব। আমি ভাল ছেলে, প্রতি পরীক্ষায় সসম্মানে উত্তীর্ণ হইতেছিলাম। অথচ আমার বন্ধু বি. এস-সি. পরীক্ষায় বারম্বার ফেল করিতেছিলেন। ইহাই তো যথেষ্ট গ্লানির কারণ। ঈর্ষা মানুষের একটা সহজাত প্রবৃত্তি। খুব কম লোকই ইহা হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত। এই ঈর্ষা না করিতে পারে এমন জিনিস নাই। অধিকাংশ কলহের মূলে এই ঈর্ষা হয় প্রত্যক্ষভাবে, না হয় পরোক্ষভাবে বিরাজমান।

যাই হোক, ইহার ফল দাঁড়াইল এই যে, আমার বন্ধুর বাড়ি হইতে আমার বাস উঠিল। তাঁহাদের বাড়িতে দুই বেলা খাইতে ও শুইতে পাইতাম, তাহা বন্ধ হইয়া গেল।

বোঝার উপর শাকের আঁটিটার মত প্রাইভেট ট্যুইশনির ভারও স্কন্ধে তুলিয়া লইলাম। সমস্ত দিন কলেজের হাড়ভাঙা খাটুনির পর একটি ধনীর দুলালকে লইয়া বসিতাম। কি যে তাহাকে পড়াইতাম, তাহা জানি না। বস্তুত কিছুই পড়াইতাম না। সে আপন মনে যাহা খুশি করিয়া যাইত, আমি বসিয়া বসিয়া তাহা দেখিতাম। তাহাকে জোর করিয়া কিছু করিতে বলিলে সে ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া ফেলিত। শীর্ণকায় বিষণ্ণ একটি দশ বৎসরের শিশু—নাকটা বসা, দাঁতগুলা খাওয়া-খাওয়া। পিতা-মাতার নয়নমণি। তাহাকে কিছু বলিবার জো নাই। তাহার পড়াশোনা কিছুমাত্র অগ্রসর হইতেছে না দেখিয়া তাহার বাবাকে একদিন বলিলাম—"ছেলেটিকে একটু শাসন করা দরকার।" ভদ্রলোক নির্বিকারচিত্তে উত্তর দিলেন—"শাসন করবার দরকার নেই। সেজন্য আপনাকে রাখা হয় নি। আপনি সন্ধ্যেবেলাটা ওকে ভুলিয়ে-ভালিয়ে আটকে রাখুন। পড়াশোনা একটু আধটু করে ভাল, না করে বেশি জোরজবরদস্তি করবার দরকার নেই। দেখবেন খালি, সন্ধ্যেবেলা কিছুতে যেন ওপরে না যায়।" ভদ্রলোক বেশ মোটা রকম বেতন দিতেন। তাঁহার কথার প্রতিবাদ

করিলাম না। কিছুদিন পরেই বুঝিলাম, ছেলেটির সন্ধ্যার সময় উপরে যাওয়ার বাধা কি। ছেলেটির মা পাগল। তাঁহাকে একটি ঘরে তালাবন্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে। সন্ধ্যার সময় তাঁহাকে জোর করিয়া কিছু খাওয়ানো হয়। জোর করিয়া মুখ ফাঁক করিয়া নল দিয়া খানিকটা খাবার প্রত্যহ তাঁহার মুখে ঢালিয়া না দিলে তিনি অনাহারে মারা যাইবেন—ডাক্তারেরা এইরূপ আশঙ্কা করিয়াছেন জোর করিয়া খাওয়ানো ব্যাপারটা অত্যন্ত দৃষ্টিকটু জিনিস। ভদ্রলোক তাই নিজের পুত্রকে নীচে আটকাইয়া রাখিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। লেখাপড়া উপলক্ষ্য মাত্র।

"আমি তোমাকেই বিয়ে করব। তোমার তো চোখ নেই—তুমি তো দেখতে পাও না। তোমাকেই বিয়ে করব আমি।"

সেই কালো মোটা মেয়েটি কথা কহিতেছে। সম্মুখে একটা কবন্ধ দুই লোলুপ বাহু প্রসারিত করিয়া অগ্রসর হইতেছে।

মেয়েটি বলিতেছে—"ওগো, তুমিই আমাকে নাও। যাদের চোখ আছে, তারা আমার কষ্ট দেখতে পেলে না। তোমার ভাষা নেই, তোমার চোখ নেই, তুমি হয়তো আমার ব্যথা বুঝবে।

একটা দমকা বাতাস ঘরে ঢুকিয়া আলোটা নিবিয়া গেল।

উঠিয়া আবার আলোটা জ্বালিলাম। দেখিলাম, কেহ নাই। কেবল ঘরের মধ্যে খামখানা পাগলের মত ছোটাছুটি করিয়া বেড়াইতেছে। তুলিয়া টেবিলের উপর রাখিয়া দিলাম। দরকারী চিঠি।

পাগল মায়ের একমাত্র ছেলেকে আটকাইয়া আমার প্রতি সন্ধ্যা কাটিত। ইহাদের সহিত আমার সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠতর হইলে বুঝিতে পারিয়াছিলাম, ভদ্রমহিলা কেন পাগল হইয়াছিলেন। কারণ আর কিছুই নয়, উপর্যুপরি সাত-সাতটি সন্তান মারা গিয়াছে। এই ক্ষীণ-

জীবী পুত্রটি মাত্র অবশিষ্ট আছে। সাতটি সন্তানের মৃত্যুরও কারণ পরে জানিতে পারি। ভদ্রলোকের দারুণ চরিত্রহীনতা। এত শোক পাইবার পরও তাঁহার স্বভাব বদলায় নাই। পাগলিনী স্ত্রীকে তেতলার ঘরে তালাবন্ধ করিয়া রাখিয়া, ছেলেটিকে আমার তত্ত্বাবধানে দিয়া ভদ্রলোক প্রতিদিন দেখিতাম অভিসারে বাহির হইতেন। গায়ে গিলে-করা আদ্দির পাঞ্জাবি, পায়ে পেটেন্ট-লেদারের পাম্‌শু, হাতে যুঁইফুলের মালা জড়ানো। মদিরা-পানে চক্ষু দুইটি আরক্ত, ডান হাতে একটি দামী সিগার—চকচকে দামী মোটরে চড়িয়া বাহির হইয়া যাইতেন। রাত্রে ফিরিতেন না। মানুষের মধ্যে এই কাম-প্রবৃত্তিটা ভগবান দিয়াছিলেন হয়তো সৃষ্টিরক্ষার জন্য। কিন্তু মানুষ সভ্য হইবার পর—কিংবা হয়তো তাহার আগেও—এই প্রবৃত্তিটাকে সৃষ্টি ধ্বংস করিবার উপায় করিয়া ফেলিয়াছে।

কবি ধীরে ধীরে প্রবেশ করিল।

অদ্ভুত তাহার চেহারা। মস্তিষ্কটা সবটা যেন বাহির হইয়া আসিয়াছে। চোখের কোণ দিয়া রক্ত গড়াইতেছে।

"আমার ঘুমেতে স্বপন আঁকিয়া আঁকিয়া
মনের মাঝারে পরশ-মাধুরী রাখিয়া
শোভন শরমে মোহন মোহের আড়ালে
সহসা আসিয়া দাঁড়ালে।
তোমার উজল কাজল নয়ন-কিনারে
কোন্ সে দেবতা বাজাল মনের বীণা রে
আঁধারে আলোকে চন্দ্রে তারায় তপনে
আধ-জাগরণ স্বপনে।
কার সে মাধুরী তোমার তনুটি ভরিয়া
আমার আখির নিমেষ নিলে গো হরিয়া।
কহিল মরমে কোন্ সে কাহিনী কি ভাষে
বেহাগ—ললিত—বিভাসে।

তোমার মাঝারে কাহারে দেখি গো গোপনে
স্বপনে তুমি কি ভেবেছ কখনো শোভনে!
ছন্দে ও গানে হয়েছি কাহার পূজারী
মরমখানিরে উজাড়ি?
হয়তো, হে মোর গোপন-মানস-হারিণী,
পাব না তোমারে,—তবু তো বলিতে পারি নি
শুধু মায়া তুমি আর কিছু নও মায়া গো
মিছে ছলনার ছায়া গো!
বলিতে পারি নি তাই তো জীবনে মরণে
কত অঞ্জলি সাজাই তোমার চরণে
গন্ধে বরণে কত না ছন্দ-বাহিনী
কত ক্রন্দন-কাহিনী।"

আসিল এবং চলিয়া গেল।

কামের আর এক মনোহর রূপ। ছন্দে মিলে অনুপ্রাসে নিজের অন্তরের সত্য ও মিথ্যাকে প্রকাশ করিয়া চলিয়াছে।

অনিবার্য।

সত্যই অনিবার্য।

হঠাৎ একদিন মায়ের চিঠি পাইলাম। চিঠি পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম, কারণটা নিতান্ত তুচ্ছ নয়। আমার ভগ্নীটির বিবাহ প্রায় ঠিক হইয়া গিয়াছে। আমি গিয়া প্রয়োজনীয় কথাবার্তাদি শেষ করিয়া দিলেই শুভকর্ম সমাধা হইয়া যাইবে। প্রয়োজনীয় কথাবার্তার মধ্যে যেটুকু ভীতপ্রদ, সেইটুকু এ ক্ষেত্রে নাই। আটাকাইবে না। পাত্র চপুকে দেখিয়া পছন্দ করিয়াছে। পণ লাগিবে না। প্রফুল্লিত অন্তঃকরণে মাতুলালয়ে উদ্দেশে যাত্রা করিলাম।

সেখানে গিয়া চক্ষুস্থির হইয়া গেল। স্তম্ভিত হইয়া ভাবিতে লাগিলাম—পাত্রের বয়স পঁয়ষট্টি, না পঁচাত্তর, না আরও বেশী? প্রত্নতাত্ত্বিক না হইলে শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার চক্রবর্তীর ঠিক বয়স নির্ণয় করা শক্ত। গ্রামে তাঁহার সমবয়সী আর কেহ বাঁচিয়া নাই।

চপুর মুখের হাসি শুকাইয়া গিয়াছে। মায়ের চোখের জল মুখের হাসিতে রূপান্তরিত হইয়া আরও করুণ হইয়া উঠিয়াছে। বাঙালী ব্রাহ্মণের ঘরে কন্যাদায় যে বিষম দায়! মা ওই বৃদ্ধের সহিতও চপুর বিবাহ দিবার উন্মুখ।

মাকে বলিলাম—"এর চেয়ে চপুকে হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দাও না।"

মা উত্তর দিলেন—"কেষ্ট চক্কবত্তি যে সুপাত্র নয় তা আমি জানি, তা আর তোমাকে বলে বোঝাতে হবে না। কিন্তু যাদের হাতে একটি কানা-কড়িও নেই, তারা এর চেয়ে ভাল পাত্র কি করে জোটাবে বলতে পারিস? চপার বয়স যে সতরো পেরিয়ে আঠারোয় পড়ল, তার হিসেব রাখিস? কেষ্ট চক্কবত্তির একটু বয়স হয়েছে এই যা, তা না হলে লোক ভাল। এ অঞ্চলে একটা মানী লোক। ঘরে দু-পয়সা আছে—জমি, বাগান, পুকুর, খাওয়া-দাওয়ার কোন কষ্ট কোনদিন পাবে না। কেষ্ট চক্কবত্তি যখন নিজে থেকে কথাটা পেড়েছেন, তখন এ সুযোগ ত্যাগ করা উচিত নয়। আমরা গরীব মানুষ, এর চেয়ে ভাল আর পাব কোথায়?"

যুক্তি সারবান সন্দেহ নাই। কিন্তু ওই কামকণ্টকিত লোলুপ লোলচর্ম বৃদ্ধটার হস্তে আমার অমন সুন্দরী বোনটাকে সঁপিয়া দিতে ইচ্ছা হইল না। বৃদ্ধের দন্তহীন মুখের সেই লালায়িত কথাগুলো এখনও আমার কানে বাজিতেছে। তাহার কোটরগত চক্ষুর লুব্ধ দৃষ্টিটা যেন এখনও আমার বুকে বিঁধিয়া বসিয়া আছে।

মাকে বলিয়া আসিলাম—"আরও দিনকতক তুমি সবুর কর, আমি ভাল পাত্রের চেষ্টা দেখছি। আমার বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে দেখি না একবার খোঁজ করে।"

কলিকাতায় আসিয়া বন্ধুবান্ধবদের মধ্যে খোঁজ করিতে লাগিলাম। মা দেশে বসিয়া সবুর করিতে লাগিলেন। আমি খোঁজ করিবার ক্রটি করিলাম না।

দেশে যে পাত্রের অভাব ছিল, তাহাও নয়। কিন্তু কিছুতেই জুটিল না। বিনা পণে বিবাহ করিতে পারে, এমন একজন অপরিণামদর্শী সচ্চরিত্র যুবক মিলিল না। সকলেই পরিণামদর্শী। ভবিষ্যৎচিন্তা না করিয়া কেহই এক পা অগ্রসর হইতে চাহে না। সকলেই আমার ভগ্নীর গুরুভার স্কন্ধে তুলিয়া লইতে রাজি, যদি ভার-বহনের মজুরিটা আমরা দিয়া দিতে পারি। কিন্তু সে সামর্থ্য আমাদের তখন ছিল না। দুইজন যুবক বিনাপণে বিবাহ করিতে রাজি হইয়াছিলেন। তবু হইল না। একজন লেখাপড়া-জানা মেয়ে চান, এবং আর একজন চান নিখুঁত সুন্দরী। আমার বোনকে লেখাপড়া শেখানো হয় নাই এবং নিখুঁত সুন্দরীও সে ছিল না। সৌন্দর্যে তাহার খুঁত ছিল। চুল খুলিয়া দিলে হাঁটু পর্যন্ত গিয়া পৌঁছিত না।

সুতরাং আমি ক্রমাগত খুঁজিতেই লাগিলাম এবং মা-ও ক্রমাগত সবুরই করিতে লাগিলেন। এই রকমই চলিতেছিল এবং কত দিন চলিত তাহা বলা কঠিন, এমন সময় মামার বাড়ির গ্রামের একটি সদাশয় ছোকরা আসিয়া খবর দিল—

"বাঁচান, বাঁচান আমাকে ডাক্তারবাবু।" তারস্বরে চীৎকার করিতে করিতে সেই অ্যানার্কিস্ট ছোকরাটি ছুটিয়া আসিল, তাহার পশ্চাতে সেই দীর্ঘাকৃতি কালো লোকটা। তাহার প্রকাণ্ড কালো মুখে সাদা চোখ দুইটা ধকধক করিয়া জ্বলিতেছে—তাহাতে উন্মাদের হিংস্র দৃষ্টি। তাহার গলার ক্ষতটা লাল হইয়া উঠিয়াছে। মনে হইতেছে, যেন একটা প্রকাণ্ড অঙ্গার অগ্নিযোগে নীরবে পুড়িতেছে।

"কারও বাপের সাধ্যি নেই তোমাকে বাঁচায়। আমার মেয়ে নিয়েছ, আমার দোকান নিয়েছ, ছেড়ে দেব তোমাদের? কড়মড় করে চিবিয়ে খেয়ে ফেলব। পাজি, হারামজাদা, শুয়ার—"

বলিয়া ছুটিয়া গিয়া সত্যই সে তাহার গলায় কামড়াইয়া ধরিল।

"বাঁচান, বাঁচান, বাঁচান আমাকে।"

আর্তনাদে সমস্ত অন্ধকার শিহরিয়া উঠিতেছে। লোকটার সমস্ত মুখ রক্তে ভরিয়া গেল। সহসা বিন্দি ছুটিয়া আসিল। কালো লোকটার চুলের মুঠি ধরিয়া জোরে একটা ঝাঁকানি দিয়া সে চীৎকার করিয়া উঠিল—"ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও বলছি।"

ঝাঁকানি খাইয়া কালো লোকটা যুবকটিকে ছাড়িয়া দিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল—"কে তুই?"

"যেই হই, তুমি ওকে ছেড়ে দাও, ওগো, তোমার ছুটি পায়ে পড়ি।" বিন্দি হঠাৎ নতজানু হইয়া বসিয়া পড়িল।

বাতায়ন-পথে চাহিয়া দেখিলাম, কৃষ্ণপক্ষের শীর্ণ চন্দ্র মেঘের গাঢ় তমিস্রা ভেদ করিয়া ধীরে ধীরে উঠিতেছে। তাহার মুখে প্রেতের হাসি। এই জীবন্ত কর্দমাক্ত পৃথিবীর দিকে চাহিয়া মৃত জ্যোতিষ্কটা যেন নীরবে অট্টহাস্য করিতেছে। নিকটেই কালপুরুষের উজ্জ্বল নক্ষত্রগুলি ক্ষণিকের জন্য দেখা দিয়া আবার মেঘলোকের নিবিড় রহস্যে আত্মগোপন করিল। প্রকাণ্ড বড় একখানা কালো মেঘ ধীরে ধীরে আসিয়া সব ঢাকিয়া দিল। চাঁদও ঢাকা পড়িল, ক্ষীণ জ্যোৎস্নাটুকু মরিয়া গেল।

বৃষ্টি থামিয়া গিয়াছে। ক্ষান্তবর্ষণ গভীর রাত্রির অন্ধকারকে বিঘ্নিত করিয়া ভেকের মৃত্যুকাতর যন্ত্রণাধ্বনি রহিয়া রহিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে। বাহিরে গাঢ় অন্ধকার। ঘরে কম্পিত দীপশিখাকে প্রদক্ষিণ করিয়া পতঙ্গটা এখনও ঘুরিতেছে। যেন একটা এরোপ্লেন।

শিখা আর পতঙ্গ!

আমার বোন...তাহাকে গুণ্ডায় হরণ করিয়া লইয়া গিয়াছিল। আমার বুড়ি মা-ও তাহাদের পাশবিক অত্যাচারের হাত হইতে রক্ষা পান নাই।

আমার মা-বোনকে যখন গুণ্ডারা ধর্ষণ করিতেছিল, তখন আমি

মেডিকেল কলেজে একটি রূপসী নার্সের সহিত নানা ছুতায় আলাপ করিতেছিলাম; তাহার সহিত আলাপ করিতে সকলেই উৎসুক হইত। আমিও সুযোগ পাইলে আলাপ করিতাম। আলাপ না বলিয়া প্রেমালাপ বলিলে খুব বেশি অত্যুক্তি হইবে না।

কত কথাই মনে হইতেছে। মনে হইতেছে, সেই সপ্ত মৃতপুত্রের সিফিলিস-গ্রস্ত পিতা, কবিতামুখর প্রেমিক ওই কবি, বিবাহোন্মুখ লোলচর্ম সেই বৃদ্ধ, নারীধর্ষণকারী গুণ্ডা এবং নার্সের অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী আমি—একই জিনিস। বিশেষ তফাত তো দেখি না।

কিন্তু না, আমি সব ভুলিতে চাই। নিঃশেষে নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলিতে চাই সব। কিছুতেই পারি না। অদ্ভুত আমার স্মরণশক্তি। কিছু ভুলি না।...ছেলেবেলায় একটা পাগলা কুকুরকে ঠেঙাইয়া মারিতে দেখিয়াছিলাম।...তাহার ফাটা মাথা, থেঁতলানো চোখ দুইটা আমি যেন এখনও দেখিতে পাইতেছি। কুকুরটার চেহারা আমার স্পষ্ট মনে আছে। কালো রঙ, একটা কান একটু বেশি ঝোলা, লেজের কাছে একটা প্রকাণ্ড ঘায়ে পোকা কিলবিল করিতেছে। সব মনে আছে। কিছুই আমি ভুলি না। কোথায় কবে আরশোলা-পোকাটি মারিয়াছি, তাহার চেহারাটা পর্যন্ত স্পষ্ট মনে আছে।

নিস্তব্ধ রাত্রে আমার সঙ্গে জাগিয়া আছে আমার স্মরণশক্তি।

প্রেতিনী।

বাবার মুখখানা মনে পড়িতেছে। শান্ত ধীর শীর্ণ মুখটা। দারিদ্র্যের জন্য কোন অসন্তোষ প্রকাশ করেন নাই। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত নীরবে নিজের কর্তব্য করিয়া গিয়াছেন। মৃত্যুও তাঁহাকে কোন কষ্ট দেয় নাই। ক্লান্ত হইয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন যেন।

একটা ভাবাহীন চীৎকার অন্ধকারকে চিরিয়া চলিয়া গেল।... পেচকের শব্দ? একটা আকুল ক্রন্দন যেন। ল্যাপল্যাণ্ডের হিম-শীতল জলাভূমিতে দুইটি অপরিচিত যুবক যুবতী দাঁড়াইয়া আছে না? চারিদিক কুয়াশায় ঢাকা, কেহ কাহারও ভাষা বোঝে না। কুয়াশা

নিবিড় হইয়া আসিতেছে। তাহাদেরই অন্তরের আকুলতা গভীর নিশীথে নৈশ-বিহঙ্গমের করুণ স্বরে মূর্ত হইয়া উঠিল নাকি ?

"ডাক্তারবাবু।"

চমকাইয়া উঠিলাম। সেই ভদ্রলোক আসিয়া হাজির হইয়াছেন, যিনি জরার প্রকোপ হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য মহাকালের উপর টেক্কা দিয়া বুকে গুলি করিয়াছেন।

"দেখুন তো ডাক্তারবাবু, আমার চেহারাটা ঠিক আছে কি না।"

ভদ্রলোক শিষ দিতেছেন।

"ঠিক আছে।"

"চুল আর পাকে নি ?"

"না।"

ভদ্রলোক চলিয়া গেলেন। কালো মেয়েটি আসিয়া হাজির হইল।

"বড় জ্বালা ডাক্তারবাবু, বড় জ্বালা, বড় জ্বালা।"

তাহার পা, পেট, বুক দুর্গন্ধ বড় বড় ক্ষতে ভরিয়া উঠিয়াছে। বাম স্তনটা পচিয়া পুঁজ গড়াইয়া পড়িতেছে।

"বড় যন্ত্রণা, জ্বলে গেল, সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল আমার।"

নির্বাক হইয়া বসিয়া শুনিতেছি।

"আমার জ্বালা কমিয়ে দিন, আপনার পায়ে পড়ি।"

"এর ওষুধ আমি জানি না।"

"হ্যাঁ, তুমি জান। তুমি এত বড় ডাক্তার, তুমি জান না ?"

কি বলিব ? একবার ইচ্ছা হইল, গীতার একটা শ্লোক আবৃত্তি করি। হয়তো যদি কোন উপকার—

"ওয়াক, ওয়াক—"

মাতালটা আসিয়া মেয়েটার গায়ে হুড়হুড় করিয়া বমি করিয়া দিল।

"দাদা, একটু জল দাও, একটু জল দাও, উঃ, পায়ে বড় খিল ধরছে।"

ভাই-বোনগুলার হাহাকার এখনও ভাসিয়া আসিতেছে কোথা হইতে? কলেরা-রোগীর আকণ্ঠ-পিপাসা কি এখনও মিটে নাই?

কবন্ধটা মোটা কালো মেয়েটার গলা জড়াইয়া আগাইয়া আসিল। কাটা মুণ্ডটাও শূন্যে দেখা দিল। মুখে বিকট হাসি।

"ঠকিয়েছে! ভারি ঠকিয়েছে! ছেড়ে দে, ওরে ওটাকে ছেড়ে দে। কালো মোটা কুৎসিত মেয়েটা। নারীমাংস আমার প্রিয় বটে, কিন্তু ওই পেত্নীটাকে নিয়ে থাকতে পারব না। ছেড়ে দে, ছেড়ে—"

কবন্ধটা তৎক্ষণাৎ মেয়েটাকে ছাড়িয়া পিছাইয়া গেল।

মুণ্ডটা হাসিতে লাগিল, হা—হা—হা—হা—!

"ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও আমাকে।"

কবি সেই পোড়া মেয়েটাকে জড়াইয়া ধরিয়াছে। তাহার বিদীর্ণ খুলি হইতে মস্তিষ্কটা বাহির হইয়া মেয়েটার চোখে মুখে লাগিয়া যাইতেছে। কবি তাহাকে কিছুতেই ছাড়িবে না।

ঘরের কোণে দাঁড়াইয়া সেই কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত লোকটা হি-হি করিয়া হাসিতেছে। তাহার সিংহের মত মুখটা হইতে বিষাক্ত লালা ঝরিয়া ঝরিয়া আমার ঘরের মেঝে ভাসিয়া গেল।

"যেমন করে হোক নির্মলকে দেখে নিতে হবে। টাকা চাই—"

"ঠিক বলেছ ভাই, টাকা চাই, টাকা চাই, টাকা—টাকা—টাকা—টাকা—কই—কোথায়—?"

কালো লোকটা লম্বা হাত বাহির করিয়া শূন্যে হাতড়াইতে লাগিল।

সর্পকবলিত ভেকটা তারস্বরে শেষ চীৎকার করিয়া থামিয়া গেল হঠাৎ।

ক্যালেণ্ডারের ছবিখানার সর্বাঙ্গে কুষ্ঠ।